বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান

(Wooden Crafts Of Bangladesh: Inquest Of Tradition)

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মো ঃ আব্দুল মোমেন
রোল - ০২
নিবন্ধন নং - ১৫৮
শিক্ষাবর্ষ - ২০১০-২০১১
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. নাজমা বেগম
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান

(Wooden Crafts Of Bangladesh: Inquest Of Tradition)

"বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল ডিগ্রির পরিপূরক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভূক্ত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

মো ঃ আব্দুল মোমেন
রোল - ০২
নিবন্ধন নং - ১৫৮
শিক্ষাবর্ষ ২০১০-২০১১
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব এবং মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে উক্ত শিরোনামে কোন গবেষণা ইতোপূর্বে সম্পাদিত হয়নি। আমি গবেষণাকর্মটি কোন ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপন করিনি।

মো ঃ আব্দুল মোমেন
(MD. ABDUL MOMEN)
মার্চ, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি তাদের যারা আমাকে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন। কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের ভূমিকা জানার আগ্রহ থেকেই এ গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের কারুশিল্প বিভাগে শিক্ষকতা করার এবং নিজেই এই বিষয়ে নিয়মিত কাজ করার সুবাদে এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের সরাসরি কর্মকান্ড দেখা এবং তা সম্পর্কে কিছু ধারণা হয় এবং তখনই এ বিষয়টিকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেই। গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরে প্রথমেই মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি। গবেষণার মত দুরুহ একটি কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম এর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি প্রতিটি কাজ একাধিকবার সংশোধন করতে গিয়েও কখনো ধৈর্য্যচ্যুত হননি। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন। তার আন্তরিক সহযোগীতা ছাড়া যথাসময়ে কাজটি সম্পন্ন করা ছিল দুরুহ ব্যাপার। তাছাড়া গবেষণা কাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুপরামর্শ দিয়ে সহায়তা করায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত সকল শিক্ষকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ডাকসু সংগ্রহশালা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলা একাডেমী, বেঙ্গল গ্যালারি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আমার প্রয়োজনমতো তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছেন এবং সংরক্ষিত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ছবি তুলতে দিয়েছেন। এছাড়া বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদ লাইব্রেরী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরী, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছেন। তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত কাঠের তৈরি কারুশিল্প কারুশিল্পীগণ তাদের শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ, ছবি তোলার সুযোগ এবং শিল্পকর্মের তথ্য দিয়ে গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কাঠের তৈরি কারুশিল্পী ও সূত্রধর ধৈর্য সহকারে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সাক্ষাৎকার এবং করণকৌশল সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য দিয়ে আমাকে ঋনী করেছেন। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন পর্যায়ে আরো যাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ও সহযোগীতায় এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি তারা হলেন জনাব আব্দুস শাকুর শাহ, অনারারী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক নিসার হোসেন, ডিন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফারুক আহাম্মদ মোল্লা, সহযোগী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসর আব্দুস সালাম, চন্দনা রাণী বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. শেখ মনির উদ্দিন সহযোগী অধ্যাপক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, চারুকলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. মফিদুল আলম খান, ড. পিন্টু দেব এবং আমার বন্ধু সমতুল্য ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি. গবেষকদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার ছাত্র ফয়সাল ফরাজী, গবেষণায় সংযুক্ত ছবিগুলো সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছে তার প্রতিও কৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণা কাজের ব্যস্ততার জন্য সন্তান মনোরম এর প্রতি দায়িত্ব পালন কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয়েছে বৈকি। সেজন্য তার প্রতি অশেষ ভালবাসা। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার মা-বাবা এবং ভাই-বোনদের, যাদের ভালোবাসা এবং উৎসাহ আমাকে সব সময়ই সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।

সর্বোপরি গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার সহধর্মিণী ফরিদা ইয়াসমিন, বি.সি.এস শিক্ষা, সহকারী অধ্যাপক, আমাকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছেন। অন্যথায় এই গবেষণাকর্মটি সূচারুভাবে সম্পন্ন করা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হত না।

নানাবিধ সমস্যা, বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতা মাঝে গবেষণা সমাপ্ত করতে আমাকে যারা উৎসাহিত করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষক

মোঃ আব্দুল মোমেন
কোর্স ঃ এম.ফিল
রোল ঃ ০২
নিবন্ধন নং ঃ ১৫৮
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১০-২০১১
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ও
সহকারী অধ্যাপক
কারুশিল্প বিভাগ
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

কাঠের তৈরি কারুশিল্প প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই একটি প্রাচীন শিল্প। বাঙ্গালির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্য নির্মাণে ক্রমবিকাশমান কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে এ শিল্পটি এক বিরাট মাইল ফলক। এদেশ শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত, বিশেষ করে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্যে, যা প্রাচীনকালের প্রাপ্ত প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন থেকেই প্রমাণিত। প্রকৃতির প্রতিকূলতার সাথে মোকাবেলায় দেহাবরণ থেকে শুরু করে নিত্য ব্যবহার্য কাঠের কারুশিল্প তৈরিতে মানুষ প্রাচীন কালেই বিশেষ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে। মানুষ শুধুমাত্র সাধারণ কাঠ দিয়েই কারুকার্যময় অতিসূক্ষ্ম কাঠের তৈরি কারুশিল্প করতে সক্ষম হয়েছিলো। এই শিল্পের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্যের পথ ধরেই বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প সম্মুখে এগিয়ে চলেছে। এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজন নিরলসভাবে সূষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গবেষণা। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে গবেষণা সীমাবদ্ধতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয়ে গেছে চিরকাল। ফলে এই শিল্পের ব্যাপক গবেষণা সম্ভব হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি ব্যাপক এবং বিস্তৃতময় যা কৃষির সাথেও ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। এ শিল্পের প্রধান উপাদান প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ কাঠ যা কৃষির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। মূলত বীজ থেকে গাছ উৎপাদন, কাঠ প্রস্তুত করা এবং এর পর কাঠ শুকিয়ে বা সিজনের পরে কাঠের তৈরি কারুশিল্প করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাছাড়া এতে কারুকাজ, নকশা বা অলংকার তো রয়েছেই। প্রকৃতি থেকে আহরিত কাঠ একটুমাত্র যান্ত্রিক সুবিধা নিয়ে উদ্ভাবনীশক্তি ও অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞান ও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিল্পক্রমে সমসাময়িক বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের চাহিদা নিবারণ থেকে ক্রমাগ্রসরমান হয়েছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্প প্রকৃতি থেকেই আহরিত করেছে এর কাঁচামাল-উপকরণ বা কলা-কৌশলের মতো উদ্ভাবনী প্রযুক্তি। প্রকৃতির সকল উপাদান ও উপকরণকে পদ্ধতিগত ভাবে, কৌশলে প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ায় কাঠের কারুশিল্পীরা করে চলেছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাঠের কারুশিল্প তৈরি। ফলে যুগে যুগে নানা রূপ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

অভিসন্দর্ভটি মূলত আবহমান কাল ধরে গড়ে উঠা বৈচিত্র্যময় কাঠের তৈরি কারুশিল্প এবং এর ঐতিহ্য অনুসন্ধান, কারুশিল্পী ও এর ক্রমবিকাশমান সমকালীন বিষয়াবলীকে কেন্দ্র করে রচিত। বাংলাদেশের অতি প্রাচীনকালের এই শিল্পের নিদর্শন অতি দূর্লভ স্বত্বেও খ্রিস্টের জন্মের বহুপূর্বে এদেশের কাঠের তৈরি

কারুশিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়, ধর্মশাস্ত্র, প্রাচীন সাহিত্য, বিভিন্ন ইতিহাস, বিদেশী পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বর্ণনায়। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির (টেরাকোটা) ফলক, ভাস্কর্য এবং বিভিন্ন লেখকের সাহিত্য বর্ণনায় কাঠের তৈরি কারুশিল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক উপাদান, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভূমিকা রয়েছে।

এ শিল্প রাজা, জামিদার, ভূস্বামীদের স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের ত্যাগ ও অনুশীলনে সৃজনশীল নৈপূণ্য ও নান্দনিক শৈলীতে ফুটে উঠেছে। অন্যদিক রাজনৈতিক ও সুষ্ঠু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ শিল্প চরম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের ধারাবাহিকতায় ও সমকালীন কাঠের তৈরি কারুশিল্পের শৈলী প্রক্রিয়া ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত এবং উপস্থাপিত হয়েছে এ অভিসন্দর্ভে। এছাড়াও এই শিল্পের বৈচিত্র্য অন্বেষণে কাঠের পুতুল, আসবাবপত্র, নৌকা, কাঠের-বেড়ার মতো শিল্পকে বিশ্লেষণ পূর্বক এর সৃজনশীল বিবর্তনের ধারাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের শুরুতেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ সহ সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে কালাতীত এই শিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধানপূর্বক চীনা, মিশরীয়, মেসোপটেমিয়া এবং বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরসহ বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত, প্রাচীন নিদর্শনে প্রাপ্ত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের তথ্য সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে শুরু করে এ শিল্পের পর্যায়ক্রমিক বিকাশকে তার ঐতিহ্যগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, গহনা বাক্স, রেহেল, দরজা, কাহাইল, ঢেঁকি, পালকি, চামচ, মস্কা, দেয়াল তাক ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ভাবে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্তিক উপাদানের উৎসের ভিত্তিতে গভীর আলোচনা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের আদিবাসী বা ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠির কাঠের তৈরি কারুশিল্পসহ এর উপর বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কাঠের তৈরি কারুশিল্প সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বিখ্যাত হাট-বাজার এবং মেলাগুলোর উপর সমীক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশি ও আন্তর্জাতিক বিপণন ও বাজার সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া অন্বেষণ থেকে শুরু করে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের জীবন সংগ্রামের নানান বিষয়াবলি তুলে ধরা

হয়েছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতায় সমকালীন আধুনিক পর্যায় এর বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শিল্পের প্রাথমিক বা প্রধান কাঁচামাল-উপকরণ হিসেবে উপযোগীকাঠ ও করণকৌশলসহ এর রঙ, নকশা, মোটিফ সমস্ত প্রক্রিয়াটি বিষদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সমকালীন ঐতিহ্যবাহী কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আলোচনার আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটেছে। উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃজনশীল কারু সামগ্রীর। বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ক্রমবিকাশের ধারাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের কতিপয় বিখ্যাত কারুশিল্পীর পরিচিতি বিস্তৃত আলোচনা ও শিল্পকৃতির নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমিক ভাবে। উপসংহারে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতার মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় কিছু সুপারিশমালা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i-ii
	সারসংক্ষেপ	iii-v
	ভূমিকা	১-২১
১	গবেষণা সমস্যার বর্ণনা	২
২	গবেষণার উদ্দেশ্য	৫
৩	গবেষণার অনুকল্প	৬
৪	গবেষণার যোক্তিকতা	৬
৫	গবেষণায় ব্যবহৃত পদ ও শব্দের সংজ্ঞাপ্রদান	৭
৬	সাহিত্য পর্যালোচনা	৮
৭	গবেষণা পদ্ধতি	১২
৭.১	গবেষণা এলাকা	১২
৭.২	চলক নির্ধারণ	১৩
৭.৩	তথ্যের উৎস	১৬
৭.৪	নমুনা কাঠামো	১৬
৭.৫	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	১৭
৮	তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	১৮
৯	তথ্য সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা	১৮
১০	অধ্যায় বিন্যাস ঃ একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র	১৯
	তথ্যসূত্র	২১
প্রথম অধ্যায়		২২-৩১
১	কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশ ও পরিচিতি	২২-৩০
	তথ্যসূত্র	৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়		৩৭-৫৪
২	কাঠের তৈরি কারুশিল্প সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস	৩৭
২.১	প্রাচীন সাহিত্য	৩৮
২.১.১	চর্যাপদ	৩৮
২.১.২	মৈমনসিংহ গীতিকা	৩৮
২.১.৩	ঢাকা পুরাণ	৪০
২.১.৪	ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি	৪২
২.১.৫	মধ্যযুগে সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ	৪৪
২.১.৬	খনার বচন	৪৬
২.২	ধর্মশাস্ত্র	৪৬
২.৩	ইতিহাস	৪৮
	তথ্যসূত্র	৫৩-৫৪
তৃতীয় অধ্যায়		৫৫-৬৫
৩	বাংলাদেশের জাদুঘরসমূহে সংরক্ষিত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নিদর্শন	৫৫
৩.১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	৫৫
৩.২	বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৫৯
৩.৩	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর	৬০
৩.৪	আহসান মঞ্জিল	৬৫
চতুর্থ অধ্যায়		৭৬-১২১
৪	উপকরণ ও করণকৌশল	৭৬
৪.১	কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উপযোগী কাঠ, কাঠ সংগ্রহ ও কাঠ সীজন প্রক্রিয়া	৭৭
৪.১.১	কাঠের প্রকারভেদ নির্ণয়	৭৮
৪.১.২	বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর কাঠের সংখ্যা প্রায় ১৮টি	৮০
৪.১.৩	কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উপযোগী কাঠ	৮৫
৪.১.৪	কাঠ সংগ্রহ	৮৭
৪.১.৫	কাঠ সংরক্ষণ	৯০

৪.১.৬	সময়োচিত করা (সিজিনিং)	৯১
৪.২	বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের করণকৌশল	৯২
৪.২.১	খোদাই প্রক্রিয়া	৯৩
৪.২.২	কাজের প্রক্রিয়া	৯৫
৪.২.৩	বাটালী	৯৬
৪.২.৪	নিরাপত্তা ও সাবধানতা	৯৭
৪.৩	রঙের ব্যবহার ও নকশাচয়ন	১০১
৪.৩.১	রঙ	১০১
৪.৩.২	রঙ প্রস্তুত	১০১
৪.৩.৩	রঙ করার পদ্ধতি	১০৩
৪.৪	পুটি	১০৯
৪.৫	নকশা	১১১
	তথ্যসূত্র	১২১
পঞ্চম অধ্যায়		১২৭-১৭৯
৫	বাংলাদেশের কতিপয় বিখ্যাত কারুশিল্পীর পরিচিতি ও শিল্পকৃতির নমুনা	১২৭-১৭৮
	তথ্যসূত্র	১৭৯
ষষ্ঠ অধ্যায়		১৮৯-২১০
৬	বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিপণন	১৮৯
৬.১	বিশেষ কারুশিল্প ও কাঁচামাল	১৯৭
৬.২	বাংলাদেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উৎপাদন	২০০
৬.৩	গ্রাম অঞ্চলে কাঠের তৈরি সামগ্রীর ব্যবহার	২০১
৬.৪	বাংলাদেশে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলাওয়ারী মেলার বিবরণ	২০৫
৬.৫	বাংলা, ইংরেজী ও আরবী তারিক অনুযায়ী মেলার সংজ্ঞা	২০৮

Dhaka University Institutional Repository

	উপসংহার	২১৬-২২৫
১	বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য	২২০
২	বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উন্নয়নে সুপারিশমালা	২২১
৩	প্রস্তাবসমূহ	২২৩
	তথ্যসূত্র	২২৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

৬.১	বিশেষ বিশেষ কারুশিল্প ও কাঁচামাল	১৯৭
৬.২	বাংলাদেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উৎপাদন	২০০
৬.৩	গ্রাম অঞ্চলে কাঠের তৈরি সামগ্রীর ব্যবহার	২০১
৬.৪	বাংলাদেশে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলাওয়ারী মেলার বিবরণ	২০৫
৬.৫	বাংলা, ইংরেজি ও আরবি তারিখ অনুযায়ী মেলার সংখ্যা	২০৮

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র তালিকা

১	কাঠের তৈরি ল্যাম্পসেড	৩২
২	নকশাদার খাট	৩২
৩	নকশাদার আলমারি	৩৩
৪	কাঠের তৈরি মিম্বর	৩৩
৫	নকশদার সিংহাসন	৩৪
৬	কাঠের তৈরি ধুপদানীর হাতল	৩৪
৭	জলচৌকি	৩৫
৮	পিড়ি	৩৫
৯	চরকা	৩৬
১০	কাঠের তৈরি তাঁত উপকরণ	৩৬
১১	পালকি (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)	৬৬
১২	সিন্দুক (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)	৬৬
১৩	নারকেল কুরানি (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)	৬৭
১৪	প্রসাধনী বাক্স (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)	৬৭
১৫	সারিন্দা (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)	৬৮
১৬	মিষ্টির ছাঁচ (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)	৬৮
১৭	ঢেঁকি (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)	৬৯
১৮	পালঙ্ক (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)	৬৯
১৯	ষন্ডারোহিত শিব ও পার্বতী (বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর)	৭০
২০	রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা (বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর)	৭০
২১	কাহাইল সিয়া (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর)	৭১
২২	নারকেল কুরানি (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর)	৭১
২৩	মস্কা (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর)	৭২
২৪	কুলা (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর)	৭২

২৫	টেবিল (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর)	৭৩
২৬	দরজা (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর)	৭৩
২৭	দুধ মাপার কেড়ে, প্রদীপদানী (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর)	৭৪
২৮	খড়ম, বিয়ের পিড়ি (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর)	৭৪
২৯	দরজার অলংকৃত পাল্লা (আহসান মঞ্জিল জাদুঘর)	৭৫
৩০	টেবিল (আহসান মঞ্জিল জাদুঘর)	৭৫
৩১	রেহেল তৈরির দৃশ্য	১২২
৩২	বিয়ের পিড়ি তৈরির দৃশ্য	১২২
৩৩	মস্কা তৈরির দৃশ্য	১২৩
৩৪	বাদ্যযন্ত্র তৈরির দৃশ্য	১২৩
৩৫	আসবাবপত্র তৈরির দৃশ্য	১২৪
৩৬	আসবাবপত্র তৈরির দৃশ্য	১২৪
৩৭	রং করার দৃশ্য	১২৫
৩৮	পুটিং করার দৃশ্য	১২৫
৩৯	খাটের নকশা করার দৃশ্য	১২৬
৪০	হারমোনিয়াম তৈরির দৃশ্য	১২৬
৪১	বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কারুশিল্পী আমিনুল ইসলাম	১৮০
৪২	কারুশিল্পী আমিনুল ইসলমের তৈরি কারুশিল্প	১৮০
৪৩	সেলিম মিস্ত্রি	১৮১
৪৪	সেলিম মিস্ত্রির তৈরিকৃত নকশাদার পায়া	১৮১
৪৫	কারুশিল্পী হুমায়ুন ভূইয়া	১৮২
৪৬	কারুশিল্পী হুমায়ুন ভূইয়ার তৈরিকৃত সিয়া	১৮২
৪৭	কারুশিল্পী আসমা বেগম	১৮৩
৪৮	কারুশিল্পী আসমা বেগমের তৈরিকৃত কাহাইল	১৮৩
৪৯	ইব্রাহিম বেপারী	১৮৪
৫০	ইব্রাহিম বেপারীর তৈরিকৃত ল্যাম্পস্ট্যান্ড	১৮৪

৫১	কারুশিল্পী আবুল কাশেম শেখ	১৮৫
৫২	কারুশিল্পী আবুল কাশেম শেখের তৈরিকৃত কাঠের কারুশিল্প	১৮৫
৫৩	গোপাল সূত্রধর	১৮৬
৫৪	গোপাল সূত্রধরের তৈরিকৃত কাঠের রেহেল	১৮৬
৫৫	কারুশিল্পী চাঁন মিয়া	১৮৭
৫৬	কারুশিল্পী চাঁন মিয়ার তৈরিকৃত কাঠের মস্কা	১৮৭
৫৭	কারুশিল্পী আব্দুল আউয়াল	১৮৮
৫৮	কারুশিল্পী আব্দুল আউয়াল-এর তৈরিকৃত কাঠের কারুশিল্প	১৮৮
৫৯	গাছের গুড়ি	২১১
৬০	মেলায় কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিপণন	২১১
৬১	কাঠের তৈরি চামচ	২১২
৬২	সোনারগাঁয়ের কাঠের পুতুল	২১২
৬৩	কাঠের তৈরি খাট	২১৩
৬৪	কাঠের তৈরি কাহাইল	২১৩
৬৫	কাঠের তৈরি বিভিন্ন কারুশিল্প	২১৪
৬৬	কাঠের তৈরি বাদ্যযন্ত্র	২১৪
৬৭	কাঠের তৈরি বাদ্যযন্ত্র	২১৫
৬৮	রুটির বেলনা	২১৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

প্রাচীন গুহাবাসী মানুষ প্রকৃতির বিপর্যয় থেকে নিজ দেহকে রক্ষা করার জন্য হাতে তুলে নিয়েছিল কাঠ খন্ড এবং তা দিয়ে তৈরি নানান ধরনের হাতিয়ার। জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন খাদ্য, প্রধান এই মৌলিক চাহিদার কারণেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শিকারের তাগিদে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ক্রমবিকাশ। মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যা সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত গর্বের সাথে এগিয়ে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন উপযোগিতার, আমাদের জীবনযাপনের ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতার অনুষঙ্গ কাঠের তৈরি কারুশিল্প। আমাদের স্বনির্ভর গ্রাম কেন্দ্রিক কৃষি ও কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উৎপাদন ক্রমবিকাশের ধারায় বিকশিত যা সব সময় সক্রিয় এবং রূপান্তরের ধারা ও ঐতিহ্যের অনুভব অব্যাহত। স্থান ও কাল ভেদে যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। বাংলাদেশের কারুশিল্পীদের কাজ, গুণ, মান ও বৈচিত্রের কারণে স্মরণাতীত কাল থেকেই সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের কারুশিল্পীরা গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ। এরা বেঁচে থাকার তাগিদে কাজ করতে গিয়ে এবং কাজের অবসরে কারুশিল্প সৃষ্টি করে থাকে। এই কারুশিল্প ঐতিহ্যের উপাদান হিসাবে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে যা প্রযোজ্য তা আজ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হতে চলেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে জাতীয় ঐতিহ্য, গৌরব ও মর্যাদার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষাকল্পে লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্ব পায়। জাতীয় পর্যায়ে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের সচেতন প্রয়াস চলে। সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরের মত বিশেষ যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অন্যান্য যাদুঘরে কারুশিল্পের ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও কারুশিল্পের ঐতিহ্য পণ্যকে বিশ্ববাজারের উপযোগী করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজিয়ে পুনর্বিন্যস্ত করার প্রয়াস ও উদ্যোগ চলে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থা, কারুশিল্পের উৎপাদক-বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহ অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রমাণ, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়। বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ কারুশিল্পীদের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্যের গড়নের বৈশিষ্ট্যের ও নকশাকে আধুনিক জনরুচি, চাহিদার আলোকে কারুশিল্পে বৈচিত্র আরোপ করা হলে আজকের আধুনিক, পরিবর্তিত রুচি, আবেদন, জীবন যাপন কেন্দ্রিক বাজারে এর চাহিদা রয়েছে। এসব সংস্থাসমূহ উপকরণের গুণগতমান, কারুশিল্প তৈরির ঐতিহ্যগত দক্ষতা ও নকশার ব্যবহারকে নিশ্চিত করেছে তাদের পরিচালনে, পরিকল্পনায়,

ফরমায়েসে তৈরি নতুন কারুশিল্প উৎপাদনে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। স্বদেশীয় কারুশিল্পের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে তার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১. গবেষণা সমস্যার বর্ণনা

কাঠের তৈরি কারুশিল্পের দেশীয় বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্যকে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করে কারুশিল্পের সম্ভাবনা এবং রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবনের পথকে সুগম করেছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের লোকজ ঐতিহ্য লোকসমাজের লোকমনের চাহিদার সীমাবদ্ধতা আছে। তা থেকে আধুনিক জীবনের চাহিদার নিরীখে পুনরুজ্জীবীত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে বিশ্বের সকল দেশেই কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারা এবং রূপান্তরিত আধুনিক জীবনের প্রয়োজনের পণ্যকেন্দ্রিক কারুশিল্প তৈরি হচ্ছে। ঐতিহ্যগত ও আধুনিক প্রয়োজন, উপযোগিতা কারুশিল্পের বহুমাত্রিক ভূমিকা এর গুণের সম্ভাবনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে কারুশিল্প সময়ের, কালের ব্যবধানে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত প্রায় কাঠের তৈরি কারুশিল্প প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবীত হচ্ছে।

"বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান" অভিসন্দর্ভ অন্যান্য কারুশিল্প থেকে আলাদাভাবে তুলে ধরার চেষ্টার অন্যতম কারণ হিসাবে বলা যায় কাঠের তৈরি কারুশিল্প মাধ্যমটির কাজ আদি কালের। যা উপকরণগত কারণেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে লড়াই করে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। যে কারণে এটি সহজেই আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে কারুশিল্পী, সূতার বা কারিগর, অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিল্প বোদ্ধাদের অজানার বোঝা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশের চারুশিল্প ও কারুশিল্প সংক্রান্ত যতগুলি প্রকাশনা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তার ভিতর কাঠের তৈরি কারুশিল্প নিয়ে গভীর ও বিস্তারিত আলোকপাত প্রকাশনায় উপেক্ষিত।

শিল্পের অন্যান্য শাখার অনেক ধরণের বই রচিত হচ্ছে। এ নিয়ে গবেষণাও হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত বা জড়িত কাঠের তৈরি কারুশিল্প সম্পর্কে উল্লেখিত তথ্যবহুল বই পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সপ্তদশ শতক থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তা দাপটের সাথে চলছিল। বাংলাদেশে এর গ্রহণ যোগ্যতা ও সমাদর ছিল। এখন সর্ব মহলে সমাদৃত আছে। আশ্চর্যের বিষয় এত সমাদৃত হওয়া সত্ত্বে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের তথ্য পেতে বেশ কষ্ট হয়। কারণ কাঠের তৈরি কারুশিল্পের শিল্পীরা অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের নগণ্য কিংবা হতদরিদ্র

বলেই তাদের সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু নিত্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে মানুষ বড় মাত্রায় এর উপর নির্ভরশীল। তবু চারুশিল্পের অন্য শাখার মত কাঠের তৈরি কারুশিল্প সাংঘাতিকভাবে অবহেলিত। বিস্ময়কর বিষয় অনেক লোক এই শিল্পের সাথে জড়িত তা সমাজের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই বয়ে গেছে। অবহেলার কারণেই কাঠের তৈরি কারুশিল্প মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারছে না। এ নিয়ে ইতিহাস রচনা হচ্ছে না। কিন্তু এজন্য গবেষণালব্ধ ইতিহাস দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র মনের দুঃখে বহুদিন আগে বলে ছিল, "বাংলার ইতিহাস চাই। নইলে বাঙ্গালীর কখনও মানুষ হইবে না।"[১]

এই ইতিহাসের পরিক্রমায় আবার এই শিল্পের স্থায়িত্ব করার পদ্ধতির অভাব আমাদের কারুশিল্পীদের হতাশায় ভুগতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে কাঠ তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য। কারুশিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় কাঠের তৈরি কারুশিল্পই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বস্তরেই গুরুত্ব বহন করে। সত্যিকার অর্থে কাঠ কেটে, খোদাই এবং কার্ভিং করে কারুশিল্প তৈরি করা হয়, যা কাঠেই সম্ভব অন্য কিছুতে নয়। এ দেশে দারু বা কাঠ সহজলভ্য, একারণেই বাংলাদেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের একটা ঐতিহ্য আছে। বর্তমানে এই চাহিদার ব্যাপকতা রয়েছে। কারুশিল্পের বৈচিত্রময় গড়নের আড়ালে সমাজে যে ঐতিহ্য সত্ত্বাটুকু লুকিয়ে আছে তা উৎঘাটন করা।

গ্রামের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতির ফসল কাঠের তৈরি কারুশিল্প। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যের মতই কারুশিল্প সচল, প্রবহমান, ধারাবাহিক। প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়র ধারার সৃষ্টির নতুন নতুন পথ পায়। রূপান্তরিত হয়। প্রতিনিয়ত রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কারুশিল্প সচল, আগামী দিনের জন্য টিকে থাকার সম্ভাবনার গুণকে ধারণ করে আছে। মূল বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা, কাঠামোসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ধারায় কারুশিল্প আবহমানকালের ঐতিহ্যকে যেমন ধারণ করে আছে, তেমনি আজকের প্রয়োজনে টিকে থাকার জন্য সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। আর আগামী দিনেও টিকে থাকতে আজকের প্রেক্ষাপটে রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত করছে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ ও প্রয়োজনে এই রূপান্তর। এই শক্তি, সম্ভাবনা কাঠের তৈরি কারুশিল্প এবং কারুশিল্পীর মধ্যে যুগপৎ ক্রিয়াশীল। কারুশিল্পের প্রবহমানতা, চিরায়তগুণ সকল কালের মানুষকে মোহিত অনুপ্রাণিত এবং একাত্ম করে। কারুশিল্প মূলত সাংস্কৃতিক, জাতিতাত্ত্বিক বলেই এর প্রক্রিয়া সাংস্কৃতিক রূপান্তরের মত। কারুশিল্প এই প্রেক্ষিতে রূপে, গড়ণে, বৈশিষ্ট্যে প্রতিনিয়ত বৈচিত্রকে আহবান জানায়। নতুন আঙ্গিকে কালের ব্যবধানে আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহ্যের পথ বেয়েই বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এই শিল্পের ধারাবাহিকতায় বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিচক্ষণতায় গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। যদিও এ শিল্পে সামগ্রিক ভাবে ক্রান্তিকাল যাচ্ছে, তবু কাঠের তৈরি কারুশিল্প টিকে আছে। অনেক কাঠের কারু সামগ্রী আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অবক্ষয় চলেছে। কাঠের লাগামহীন দাম বৃদ্ধিতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে কাঠের তৈরি কারুশিল্প। একদিকে প্লাস্টিক পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা, দেশীয় বাজারে বিদেশী পণ্য সামগ্রী আমদানী, ক্রেতার রুচির পরিবর্তন, কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের আর্থিক সমস্যা এবং যথোপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় কারুশিল্পীরা উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হচ্ছে ঐতিহ্যগত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষায়। অন্যদিকে কাঠের দাম, ট্রান্সপোর্ট সুবিধার অভাব, মেলাতে অংশগ্রহণে অতিরিক্ত চার্জ ও ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা দেওয়া আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে প্রবলভাবে বাঁধাগ্রস্থ করে চলেছে। এই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মানুষের আশা আকাঙ্খা ও জীবন যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমসাময়িক অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে নানাবিধ পরিকল্পনায় দেশের মানব সম্পদ ও শিল্প উন্নয়নের প্রচেষ্টা তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্রতা দূর করার একমাত্র উপায়। কাঠের তৈরি কারুশিল্পকে জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিকতায় চর্চিত ও অনুসরণের মাধ্যমে কোনো রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে চলতে থাকে। এমন কি আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও কাঠের সামগ্রিক যন্ত্রের উন্নয়ন সাধারণ কামারদের তৈরি হাতে চালানো যন্ত্রেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ফলে নকশায় বা টেক্সচারে ভিন্নতা দেখা গেলেও মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এবং তৈরির প্রক্রিয়াগত করণকৌশলের দিকগুলো তাদের পূর্বসূরিদের মতোই রয়ে যায়। এতে জীবন যাত্রার মান ব্যাহত হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা, মূল্য সময়োপযোগিতা, ইত্যাদি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাই এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, এর উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন নিরলস গবেষণা। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাই এই শিল্পের উন্নয়নে সমসাময়িক প্রযুক্তির সংযোজন বিশ্লেষণ, আলোচনা, গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন বংশানুক্রমিক দক্ষতাকে জিইয়ে রাখা, দরকার দূরদৃষ্টি শক্তির মাধ্যমে সতর্কভাবে এই শিল্পের বাঁধাগুলো চিহ্নিত করা। কাঠের কারুশিল্পীদের বাঁচার অধিকারকে সুনিশ্চিত করা, সর্বোপরি এ শিল্প সরকারের গভীর মনযোগ দাবী করে। কিন্তু ইতোপূর্বে এ বিষয়ে নিয়মানুগ ব্যাপক গবেষণা হয়নি।

পৃথিবীর সকল দেশেই আধুনিক জীবন যাপনের সঙ্গে কারুশিল্পের নানা জিনিস, পণ্যের সম্মিলন ঘটেছে। কারুশিল্প কেবল গ্রামের লোক সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। কারুশিল্পের পণ্যে যে উপকরণ, কাঁচামালের বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে আধুনিক জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় নানা পণ্যে তা আরোপ করার

প্রয়াস লক্ষ্যনীয়। এখন কারুশিল্পের নানা জিনিস, পণ্য আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। যেমন মাটি, বাঁশ, বেত, কাঠের কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্যকে বহুদেশে ঐতিহ্যের পাশাপাশি আধুনিক জীবনের নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন ফুলদানি, ছাইদানি, ট্রে ইত্যাদি। এসব জিনিস আধুনিক জীবনের অথচ তৈরি হয়েছে, বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে কারুশিল্পের উপকরণ, কাঁচামালের গড়ন ইত্যাদি। এ ব্যাপারে, সুইডেন, জার্মানী, জাপান, চীন, থাইল্যান্ড, ভারত, মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা বিবেচনার দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গে জার্মান পন্ডিত ভিক্টর জেলজারের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "Folk art has never been a static, unchanging medium. It has certainly been marked by development, individual peaks of achievement, spontaneity of invention and above all, by many a change. For instance, the colorful technique of slip decoration was never a part of Bavarian folk art but today at Oberammergan for example, attractive painted eare decorated with entirely local motifs is executed in this fashion." [২]

ফলে "কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান" গবেষণার উদ্দেশ্য কাঠের কারুশিল্পের বৈচিত্র্যময় গড়নের আড়ালে আমাদের সমাজে যে আদি সত্ত্বাটুকু লুকিয়ে আছে তা উৎঘাটন করা। সাথে এর উত্থান-বিলুপ্তি, সুখ্যাতি এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য পরিক্রমা, কালের গন্ডি পেরিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সামগ্রিক পরিধি ও তার উন্নয়নে পরিচালিত করা হয়েছে এই শিল্পের ডিজাইন বা নকশা সংরক্ষণ, আধুনিকীকরণ, বাণিজ্য, উপকরণ ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং এর ক্রমবিকাশ বজায় রেখে বাঙ্গালির ঐতিহ্যগত গৌরব ধরে রাখার মানসে "বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান" প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের "কাঠের তৈরি কারুশিল্প" এর ঐতিহ্য অনুসন্ধান। অন্যান্য উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১.১ কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ধারা, গতি, দর্শন ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ।

১.২ কাঠের কারুশিল্পীদের কারুশিল্প শিক্ষা বা চর্চার উপকরণ ও করণকৌশল, ভাবগত ও ধারণাগত দিক তুলে ধরা।

১.৩ বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সূপ্ত ও সৃজনী শক্তির বিকাশ তুলে ধরা।

৩. গবেষণার অনুকল্প

আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অনুকল্প দেখানো হয়েছে।

৩.১ বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প-এর ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

৩.২ কাঠের তৈরি কারুশিল্প-এর ধারা ও গতি সমৃদ্ধশালী এবং দর্শন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয়।

৩.৩ কাঠের কারুশিল্পীদের কারুশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা চর্চার উপকরণ ও করণকৌশল, ভাবগত ও ধারণাগত দিকটি সুস্পষ্ট, সূদক্ষ ও সুনিয়ন্ত্রিত।

৩.৪ বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশ সূপ্ত ও সৃজনী শক্তি সম্পন্ন।

৪. গবেষণার যৌক্তিকতা

আমরা জানি প্রত্যেক সংস্কৃতি জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে কতকগুলো অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেক জাতি তার সংস্কৃতির মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উপস্থিতিকে সুচিহ্নিত করে। মানুষের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি রয়েছে। কাঠকে সেই সংস্কৃতির অলংকার বলা হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ নির্ধারিত হলে একদিকে জনগণের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে ও দেশাত্ববোধ গড়ে উঠবে। অপরদিকে বাইরের পৃথিবীতে আমাদের সংস্কৃতির পরিচিতি প্রদান সহজ হবে। তাছাড়া এ ধরনের গবেষণা পেশাদার কারুশিল্পীদের উপকারে আসবে শিল্পরীতি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে। কোন জাতি যদি বিরোধী সংস্কৃতির আগ্রাসনকে রুখতে না পারে তবে তার জাতিসত্তার অপমৃত্যু ঘটাবে। আর এইজন্য প্রয়োজন সুস্থ নিজস্ব ঐতিহ্যের অনুসরণে গঠিত সমসাময়িক কালের চিন্তাধারায় জাতিসত্তাকে পূনরুদ্ধার ও সাফল্যজনক আত্মপ্রকাশের। এতে যেমন একদিকে দেশের জনগণের সুস্থ সাংস্কৃতিক রুচি গড়ে উঠবে অন্যদিকে তেমনি সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বা অপসংস্কৃতির পথ রুদ্ধ হবে।

এই গবেষণায় নৃত্য ব্যবহার্য কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিভিন্ন আকার আকৃতি ভেদে ব্যবহার উপযোগীতা রয়েছে। কারুশিল্পীদের কাঠের কাজে নান্দনিক বহিপ্রকাশে বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য, গ্রামবাংলার কর্মজীবি মানুষ এবং লৌকিক ঐতিহ্য অর্থাৎ গ্রামীণ ধ্যান ধারণা, সংস্কার, রূপক, প্রতীক প্রভৃতির সমন্বয় ঘটেছে। তাই এই গবেষণার ফলে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও মূল্যবোধ প্রকাশ

পাবে। সাধারণত খেটে খাওয়া মানুষের বেশ একটা অংশ গভীর মমত্ববোধ নিয়ে এসব কারুশিল্প দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন নতুন সমাজ গড়বার লক্ষ্যে।

কাঠের তৈরি কারুশিল্প হলো একটা ঐতিহ্যগত শিল্প। এটা গ্রাম বাংলার আদি শিল্প মাধ্যমগুলির মধ্যে অন্যতম। এই মাধ্যমটির তাত্ত্বিক গবেষণার যৌক্তিকতা দেশ ও সমাজ ব্যবস্থা গড়তে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৫. গবেষণায় ব্যবহৃত পদ ও শব্দের সংজ্ঞা প্রদান

৫.১ কাঠ ঃ কারুশিল্পীরা দক্ষতার সাথে যেসকল গাছের কাষ্ঠল অংশ থেকে কাঠের কঠিন জমিনে খোদাই করে গড়ণে রিলিফে রঙ এর মধ্য দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য কাঠের সামগ্রী শিল্পীত রূপ ও রূপায়নে দর্শনীয় শিল্প বস্তুতে পরিণত হয় আলোচ্য গবেষণায় তাকে কাঠ বলা হয়েছে। সম্পাদিত গবেষণায় এরকম শিল্পকর্ম হচ্ছে রেহেল, মস্কা, খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, কলমদানি, ফুলদানি, ঢোল, কৃষি সামগ্রী বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

৫.২ কারুশিল্প ঃ সম্পাদিত গবেষণায় কারুশিল্প বলতে মূলত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে যে শিল্পকর্ম প্রস্তুত করা হয়ে থাকে তাকেই বুঝায়। মোটা দাগে সম্পাদিত গবেষণায় কাঠের তৈরি সামগ্রী, কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত। কাঠের তৈরি কারুশিল্প হলো নিত্য ব্যবহারিক জিনিসের শিল্পিত রূপ ও রূপায়ণ। মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে তার ভিতরের সৌন্দর্য্য চেতনার ছাপ পড়ে। কাঠে তার প্রকাশ পায় গড়ণে, রিলিফে, রঙ এর মধ্য দিয়ে। আবার ৪০০ বা ৬০০ বছরের পুরোনো হলে তখন তা আর ব্যবহারের বস্তু থাকে না, তা দর্শনীয় শিল্প-বস্তুতে পরিণত হয়। হয়ে ওঠে শিল্প। এটিই আলোচ্য গবেষণায় কাঠের তৈরি কারুশিল্প।

৫.৩ ঐতিহ্য সন্ধান ঃ আলোচ্য গবেষণায় ‘ঐতিহ্য সন্ধান’ বলতে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় কারুশিল্পের তৈরি, বিকাশ ও পরিচিতির সামগ্রীক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

৬. সাহিত্য পর্যালোচনা

১. গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ রচিত ÒcvPxb wkí cwiPqÓ[3] গ্রন্থটিতে প্রাচীনকালের বিভিন্ন শিল্প নিয়ে আলোচান করা হয়েছে। যেমন- অঙ্কুরীয়, অবগুণ্ঠন, অলংকার, অষ্টদোল ইন্দ্রনীল, কটিসূত্র, কন্থা, খাদ্যশিল্প, নৌকা, নৌকা-বিমান, নূপুর, দর্শন, হীরক,বস্ত্র ইত্যাদি শতশত শিল্প যা প্রাচীনকালে তৈরি হত। এসব শিল্পের গঠনশৈলী, ব্যবহার, উপাদান কারিগরি, প্রাপ্তিস্থান এবং প্রয়োজনীয়তাসহ ইত্যাদি বইটিতে আলোচিত হয়েছে। প্রাচীনকালে কাঠ দিয়ে কিভাবে নৌকা ও নৌকা-বিমান তৈরি ও তা ব্যবহার করা হত তাই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়নি।

২. জিনাত মাহরুখ বানু এর Òevsjv‡‘‡ki ‘viæwkíÓ[4] নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত দারুশিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে দারুশিল্পের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস ও প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনার বিবরণ এবং দেশী-বিদেশী দারুশিল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। বইটিতে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বইটির শেষ অধ্যায়ে দারু ও দারুশিল্পের গঠনগত এবং অলংকরণ সমীক্ষা আলোকচিত্র ও লাইন ড্রইং স্থান পেয়েছে। তবে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি।

৩. তারাপদ সাঁতরা রচিত Òevsjvi Kv‡Vi KvRÓ[5] গ্রন্থটিতে মন্ডপ ও বাসগৃহ, রথ, মূর্তি-বিগ্রহ বা দারু ভাস্কর্য ও বিবিধ শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে বইটিতে "বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প: ঐতিহ্য অনুসন্ধান" নিয়ে নির্দিষ্ট কোন আলোচনা হয়নি।

৪. খগেশকিরণ তালুকদার রচিত Òevsjv‡‘‡ki †jvKvqvZ wkíKjvÓ[6] গ্রন্থে দুই ধরণের শিল্পকলা নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যোষিৎ প্রচলিত শিল্পকলা ও বৃত্তিনির্ভর শিল্পকলা। যোষিৎ প্রচলিত শিল্পকলার মধ্যে রয়েছে চিত্রকলা, নকশীকলা, নকশীকাঁথা, নকশী পাখা, নকশী শিকা, শীতল পাটি, রঞ্জনকলা, অন্ন-ব্যাঞ্জন ও পিষ্টক পরমান্ন। আর বৃত্তিনির্ভর শিল্পকলার মধ্যে রয়েছে মৃৎশিল্প, কালধর্মী মৃৎশিল্প, কালজয়ী মৃৎশিল্প, বস্ত্রবয়ন শিল্প, স্বর্ণ-লৌহ -কাংস্য শিল্প, কাষ্ঠশিল্প, শঙ্খশিল্প, গজদন্ত শিল্প, পাথর শিল্প, মাছধরা সরঞ্জাম, পটচিত্রণ, বাস্তুশিল্প, নির্মাণকলা, চৌকারী দোচালা, শিল্পায়ন দেয়াল আলপনা, কারুকৃতি, জলটঙ্গি ও বার বাংলার ঘর। এই বিষয় গুলো অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বইটিতে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের কথা আলোচনা করা হয়নি।

৫. দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত Òe½xq wkí cwiPqÓ[7] গ্রন্থটিতে বাংলা ভাষায় অতীতের লোকায়ত শিল্পকলা চর্চার বিস্তার বিন্যাস অনুসন্ধান এই সংকলনের মূখ্য

বৈশিষ্ট্য। সংকলনে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ নেয়া হয়েছে। বইটিতে প্রাচীন বাংলাদেশের শিল্পকলা, প্রাচীন শিল্প পরিচয় (চিত্রবিদ্যা), মধ্যযুগের শিল্পকলা, পল্লিশিল্প, অন্তঃপুরশিল্প, কাব্যশিল্প, কুটির শিল্প, মৃৎশিল্প, দারুশিল্প খোদাই চিত্র গজদন্তশিল্প পটচিত্র, লোকচিত্র, পুঁথি শিল্প, লেপ চিত্রাঙ্কন, খেলনা শিল্প, বাংলার স্থাপত্য, নারীদের চারু ও কারুশিল্প ইত্যাদি প্রবন্ধ গুরুত্বসহকারে সংকলন করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কোন সংকলন নেই বললেই চলে।

৬. শিল্পী আব্দুস সাত্তার রচিত Òevsjv‡‘‡ki b‡ZvbZ ‘viæwkíÓ[৮] গ্রন্থটি একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। গ্রন্থে শুধুমাত্র নতোন্নত দারুশিল্প বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং প্রাচীন ও সমকালের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্মাণেরও চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি মোট তিনটি অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দারুশিল্পের প্রাচীন ইতিহাস এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে দারুশিল্পের উপযোগী কাঠ ও কাঠের সৃজন প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজা-মহারাজাএবং জমিদার আমলে সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু বিলুপ্ত হওয়া এবং বিদেশে চলে যাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বইটিতে। তাবে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থে স্থান পায়নি।

৭. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম রচিত Òevsjvi wgDwRqvg t evsjvi †jvKwkíÓ[৯] গ্রন্থে জাদুঘর বিষয়ে বিভিন্ন ভাবনা এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জাদুঘরের উদ্ভব, বিকাশ ও সমকালীন বহুমাত্রিক বিস্তারকে তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিস্তৃত ইতিহাস থেকে শুরু করে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য জাদুঘরের পরিচিতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেমন- আহসান মঞ্জিল, দিনাজপুর, ওসমানী, বরেন্দ্র গবেষণা, ও ডাক জাদুঘর ইত্যাদি। লেখক এসব জাদুঘরের ইতিহাস ঐতিহ্য ও মানব সংস্কৃতি বহুমাত্রিক অর্জনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে জাদুঘর দ্বিতীয়ভাগে লোকশিল্পের বিষয় সুতরাং বইটি একই সঙ্গে জাদুঘর ও তার বিষয়ের বিবেচনা, কিন্তু বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান নিয়ে কোন আলোচনা নেই।

৮. তহমিনা চৌধুরী ও অসীম চট্রোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ÒwkíwPšÍvÓ[১০] বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকলা বিষয়ক প্রবন্ধমালার সংকলন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলী থেকে অনুসন্ধান করে শিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী ও বাংলা লেখা প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালার সংকলিত রূপ হচ্ছে ‘শিল্পচিন্তা’। সংকলনটির প্রথমভাগে রাখা হয়েছে ইংরেজীতে রচিত প্রবন্ধমালা থেকে অনূদিত লেখাগুলোকে। দ্বিতীয়ভাগে স্থান পেয়েছে শিল্পকলা সম্পর্কে বাংলায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা সাক্ষাৎকার ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে শিল্প ভাবনা সম্পর্কে তার মন্তব্য ও উক্তি সমন্বিত চিত্রভাবনা, নামে একটি রচনা। তৃতীয় ভাগটি গঠিত সংযোজিত রচনায়।

এতে আছে রবীন্দ্রশিল্পকলা বিষয়ে দুটি আলোচনা প্রবন্ধ। একটি আলোচনায় 'চিত্রশিল্পী' হিসেবে প্রকাশ এবং অন্য আলোচনায় আধুনিক 'চিত্রশিল্প' হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। চতুর্থ ভাগে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলা বিষয়ে বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্প সমালোচকদের রচনা। কিন্তু বইটিতে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ও এর ঐতিহ্য সন্ধান বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি।

৯. Professor H.E. Ten Holt এবং Stan Smith সম্পাদিত ÒThe Artist's Manual : Equipment, Materials, TechniquesÓ[১১] বইটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে Painting and Drawing. এই অংশে শিল্পীর ব্যবহৃত উপকরণ, Painting and Drawing এর নীতিমালা, তেল, এক্রেলিক, জলরঙ, পেন্সিল, কলম ও কালি, ছাপচিত্র, বাহ্যিকচিত্র, দেয়ালচিত্র, চারকোল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে Graphic Design এই অংশে Graphic Design এর ইতিহাস, উপাদান, কপিইং ও ফটোপ্রিন্টিং, প্রিন্ট ডিজাইন, ডিজাইন কৌশল, আলোকচিত্র প্রিন্ট পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে Sculpture এই অংশে ভাস্কর্যের নকশার নীতিমালা খোদাই পাথর, খোদাই কাঠ, খোদাই ফোম প্লাস্টিক এবং ভাস্কর্যের বিভিন্ন প্রকার-প্রকরণ ও করণ-কৌশল বিষয়ে আলোচনা। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

১০. শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত Ò*Wood Carvings of Bengal in Gurusaday Museum*Ó[১২] গ্রন্থে বাংলার কাঠ খোদাই ও কাষ্ঠ ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা হয়নি।

১১. অরুণ কুমার লাহিড়ী রচিত ÒKvV msiÿY weÁvbÓ[১৩] গ্রন্থে কাঠের সংরক্ষণ মান নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষনী কাঠের ধরণ নির্ণয়ে, পরিদর্শন নির্দেশিকা বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনে কাঠের খুটি, আম কাঠ বনাম সেগুন কাঠ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে কাঠের খুঁটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা- এসব বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প এর ঐতিহ্য অনুসন্ধান বিষয়ে আলোচনা হয়নি।

১২. মোহম্মদ সিরাজুদ্দিন রচিত ÒKwUi wkíÓ[১৪] গ্রন্থে কুটির শিল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, কুটির শিল্পে বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা কর্মসংস্থান দেখানো হয়েছে। বইটিতে বাংলাদেশে কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বর্ণনা হয়েছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও কুটির শিল্পের মধ্যকার সম্পর্কে। বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন ধরণের কুটির শিল্প সম্পর্কে। যেমন-

পাটজাত শিল্প, মৃৎ শিল্প, কাঁসা শিল্প, শীতলপাটি, সূচীকার্য এবং পুতুল ও মুখোশ ইত্যাদি। বইটিতে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি।

১৩. ড. অতুল সুর রচিত ÒevOjv I evOvjxi weeZbÓ[১৫] নামক গ্রন্থে সুদূর অতীতের বাংলা থেকে বর্তমান বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কিছুই বইটিতে স্থান পেয়েছে। বাংলা নামের উৎপত্তি, বাংলার ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদী, বাঙালী সংস্কৃতি, জাতিবিন্যাস প্রাচীন বাংলার ধর্মসাধনা, বৈষয়িক জীবন, সাহিত্যসাধনা, শিল্প প্রতিভা, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, শাসন-প্রণালী, বাংলা ভাষা ও লিপির উৎপত্তি, বাংলার মুসলিম রাজত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। মধ্যযুগের আধুনিক ও স্বাধীনতাউত্তর যুগের যাবতীয় বিষয় এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে মানুষের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে।

১৪. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান রচিত ÒKv‡Vi KvRÓ[১৬] গ্রন্থে কাঠের নানাবিধ ব্যবহারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গাছ, গাছের উপকারিতা, গাছের অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড মানবজাতির সাথে কিভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা বর্ণনা করা হয়েছে। কাঠ সংগ্রহ ও প্রস্তুত প্রণালী, কাঠের মাপ ও চিহ্নতকরণ যন্ত্র, কাঠ কাটার মূল যন্ত্রপাতি, সহায়ক যন্ত্র, যন্ত্রে ধার দেয়া মেশিন টুলস, কাঠেল জোড়, ভিনিয়ার ও প্লাইউড বর্ণনা করা হয়েছে। কাঠের বন্ধনী, হার্ডওয়ার ও গ্লু, পেইন্ট ও বার্নিশ, কাঠের কাজ ও প্রাককলন এবং কাঠ কারখানাসহ অন্যান্য কারখানায় কারিগরদের জন্য নিরাপত্তা বিধানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান বিষয়ে কোন আলোচনা নেই।

১৫. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত ÒPhvMxwZKvÓ[১৭] একটি প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ। এটি হরপ্রশাদশাস্ত্রী কর্তৃক সংগৃহীত ‘চর্যাপদ’ এর ভাষারূপ। বইটিতে ঐ সময়ের সমাজের বিভিন্ন রূপ যেমন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক আচার-আচরণ প্রথা-রীতিনীতি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ে সেই সমাজে নৌকার ব্যবস্থার উক্ত গ্রন্থে পরিস্ফুটিত হয়েছে। কিন্তু কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিষয়ে বিস্তারিত কোন লেখা নেই।

১৬. আহমদ শরীফ রচিত Òga¨h‡Mi mvwnZ¨ mgvR I ms¯‹wZi i/cÓ[১৮] গ্রন্থে বৈষ্ণবচরিতাখ্যান, মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যচরিত প্রভৃতি থেকে সমকালীন জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তথ্য এ গ্রন্থে সযত্নে সংগৃহীত কিংবা গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে। এতে মধ্যযুগের মানুষের জীবন প্রতিবেশ, জীবন-জীবিকা, জীবন-জীজ্ঞাসা, চিন্তা-চেতনা, জগৎ-ভাবনা সম্পর্কে তথ্য ও আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটা শতকে ভাগ করে এ সকল সাহিত্যকে উপস্থাপন করা

হয়েছে। এতে কাঠের তৈরি নানা ধরনের উপাদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য অনুসন্ধান নিয়ে কোন বিস্তারিত আলোচনা হয়নি।

১৭. আবুল ফজল আল্লামী ÒAvBb-B-AvKeixÓ[১৯] গ্রন্থটি আকবর নামার তৃতীয় খন্ড। মুসলিম ইতিহাস গ্রন্থমালার মধ্যে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ এটি। এই গ্রন্থে সম্রাট আকবরের রাজত্বসংক্রান্ত নানা তথ্য রয়েছে। যেমন ১ম খন্ডে সম্রাটের গৃহস্থালী, সাম্রাজ্যের কোষাগার, মূল্যবান পাথরের কোষাগার সম্রাটের টাকশাল ও তার কারিগরগণ, বনওয়ারী, সোনা-রূপা পরিশোধন করার পদ্ধতি, ধাতুর উৎপত্তি ইত্যাদি অপরিসীম গুরুত্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রের নানা পথ ও কৌশল নিয়ে খুটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কাঠ অত্যান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হওয়ায় এই বইতেও কাঠের ছাচ তৈরি, নানা ধরনের কাঠ, কাঠের তৈরি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এতে কাঠের তৈরি কারুশিল্প নিয়ে কোন বিষয় আলোচনা করা হয়নি।

১৮. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ রচিত "ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি"[২০] গ্রন্থে লোকছড়া ও আধুনিক ছড়া উভয়ের মিলনে ছড়ার আঙিনা সাজানো হয়েছে। বাংলা লোকছড়ার সংগ্রহ শতাব্দী প্রাচীন, আবহমান কাল থেকে প্রবহমান বাংলা ছড়ায় রয়েছে বাঙালীর জীবনধারায় প্রতিচ্ছবি, পূর্বপূরুষের স্মৃতি, মিশে আছে অতীতের ঐতিহ্য, বর্তমানের বাস্তবতা ও ভবিষত্যের স্বপ্নও রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রথম পর্ব ঃ তত্ত্ব ও ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় পর্ব ঃ লোকছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি আর তৃতীয় পর্বে ঃ আধুনিক ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কাঠের তৈরি নানা ধরনের কারুশিল্প এইসব ছড়াকে নানান মাত্রায় অলংকৃত করেছে। কিন্তু এই গ্রন্থে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্য নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ নেই।

৭. গবেষণা পদ্ধতি

৭.১ গবেষণা এলাকা

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিষয়ে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের জেলা থেকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ৩৮জন কারুশিল্পীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব জায়গাগুলো হচ্ছে-

- নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ, চৌদানা দত্তপাড়া, গ্রাম ও লঘুভাঙ্গা গ্রাম
- বগুড়া শেরপুর উপজেলার মির্জাপুর গ্রাম

- কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দাদাপুর রোড, কুষ্টিয়া
- মুন্সিগঞ্জ সদর এর বজ্রযোগিনী এলাকার ভট্টাচার্য পাড়া
- কুমিল্লা জেলার বালুধুম চকবাজার, কাটাবিল
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্চারামপুর উপজেলার খোসকান্দি গ্রাম
- কুমিল্লা জেলার দেবিদার উপজেলার জাফরগঞ্জ, কোতায়ালী থানার আদর্শগ্রাম
- মুন্সিগঞ্জ জেলার পানহাটা
- রাজশাহী জেলার মতিহার থানার বিনোদপুর
- মুন্সিগঞ্জ জেলার মিরকাদিম, রেকাবি বাজার
- নরসিংদী জেলার বেলাবো থানার আমলাবো গ্রাম, মাধবদী থানার কাশিপুর গ্রাম, বেলাবো থানার কান্দুয়া গ্রাম, হাড়িসাংগান গ্রাম, রাজারবাগ গ্রাম, শিবপুর থানার নৌকামাটা গ্রাম, সুজাতপুর গ্রাম, বেতাগিয়া গ্রাম, রায়পুরা থানার হাটুভাঙ্গা গ্রাম, বেলাবো থানার নারায়ণপুর
- সিরাজগঞ্জ জেলার কালিবাড়ী এলাকার ঘোষপাড়া
- মানিকগঞ্জ জেলার গড় পাড়া
- টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার ফতেহপুর গ্রাম
- ঢাকা জেলার শাখারী বাজার

৭.২ চলক নির্ধারণ

গবেষণায় চলক নির্ধারণ একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চলক দুই ধরনের হয়ে থাকে নির্ভরশীল চলক (Dependent Variables) ও অনির্ভরশীল চলক (Independent Variables) নিম্নে এ পর্যায়ে গবেষণায় ব্যবহৃত চলকগুলো চিহ্নিতকরণ ও নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে। "বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প শীর্ষক বর্তমান গবেষণার নির্ভরশীল চলক হচ্ছে কারুশিল্প।" 'কারুশিল্প' চলকটির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান ধারণা গুলো হচ্ছে-

- কারুশিল্পের বিকাশ ও পরিচিতি।
- কারুশিল্প বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র ইতিহাস।
- কারুশিল্পের নিদর্শন।

- রঙ-এর ব্যবহার ও নকশা চয়ন।
- কারুশিল্পীদের পরিচিতি ও শিল্পকৃতির নমুনা।
- বিপণন।

স্বাধীন চলক হচ্ছে 'কাঠ'। এখানে স্বাধীন চলক তার বিভিন্নমূখী কার্যক্রম দ্বারা কারুশিল্প উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। গবেষণায় কারুশিল্প-এর লক্ষ্যে 'কাঠ' কার্যক্রম বলতে নিম্নোক্ত কর্মসূচীগুলোকে বোঝাবে।

- কাঠের পরিচিতি।
- উপযোগী কাঠ সংগ্রহ।
- কাঠ সিজনিং।

কাঠ সেই আদিম যুগ থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজন মিটিয়ে মানুষের ঘরে কারুশিল্প হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এই কাঠ পাওয়া যায় পরিবেশের অংশ এবং মূল্যবান সম্পদ গাছ থেকে। আর এ কাঠ দিয়ে কারুশিল্প নির্মাণের জন্য প্রথমে যে জিনিসটি তৈরি করতে চান তার উপযোগী সুন্দর, নরম একখন্ড কাঠ বা কাঠের তক্তা সংগ্রহ করে। প্রথম দিকে কাঠ কাঁচা বা ভেজা থাকে। ভেজা কাঠে কাজ করলে তা ফেটে যায়। এগুলোতে রঙ করলে রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাই সংগৃহীত কাঠ রৌদ্রে শুকিয়ে অর্থাৎ সিজনিং এর কাজ সম্পন্ন করা হয়। কাঠের জমিন রান্দা দিয়ে সমান বা মসৃণ করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন কাঠ দিয়ে কারুশিল্প তৈরির প্রধান উপাদান কাঠ। যেহেতু কাঠের তৈরি কারুশিল্প সেহেতু কাঠ ছাড়া এটা করা সম্ভব নয়। গুরুত্ববহ কাঠ খন্ডটিকে কারুশিল্পে রূপান্তরিত করতে ধাপে ধাপে কাজটি শেষ করা হয়।

এক একটি কারুশিল্প তৈরির জন্য কাঠের মাপের উপর এক একটি চিন্তা করেন এবং তাতে ভিন্নতার প্রভাব পরে। তারপর বাটালি দ্বারা কাঠের কঠিন জমিনে খোদাই করে বা কঠিন কাঠ খন্ডকেই বিভিন্ন গড়ণে রূপান্তরিত করে সৃষ্টি করা হয় বিচিত্র স্বভাবের কারুশিল্প সামগ্রীর, প্রাথমিক রূপ। কাঠ দিয়ে এই কারুশিল্প সামগ্রী তৈরি করতে প্রথমে কারুশিল্পী তার পরিকল্পিত নকশাটি সরাসরি বা ট্রেসিং পেপার থেকে কাঠে স্থানান্তর করেন। কাঠে অংকিত নকশাটি আরো পেন্সিল বা কলম দিয়ে গাঢ় করে নেন।

তারপর কাঠের অংকিত নকশার উপর ধারালো বাটালীর সাহায্যে ক্রমান্বয়ে কেটে কেটে বিষয়ের আদল পরিস্ফুট করতে হয় অতঃপর সামনে ও পিছনের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য সামনের বিষয়কে

সবার উপরে স্থান দিয়ে বাকী অংশগুলোকে রেখার সাহায্যে স্পষ্ট করার সাথে সাথে রেখা সংলগ্ন অংশগুলিকে কেটে কেটে ঢালু করে সেগুলিকে স্পষ্ট করে তুলতে হয়।

এমন রিলিফের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কাঠের ফাইবারের প্রতি উল্টা পাল্টা বাটালি চালালে রিলিফ সুন্দর হবে না। লে-আউট দেখে দেখে কাছে দূরের ব্যাপারটা খেয়াল রেখে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে ড্রইং বের করে নিতে হয় এবং ধীরে ধীরে ডিটেলস-এ যেতে হয়। কাছের বিষয়ে রিলিফ বেশি ও দূরের বিষয়ে রিলিফ কম হয়। অর্থাৎ কাছে আলোছায়া বেশি দূরে কম বুঝতে হয়। কাঠটিকে খোদইয়ের সময় স্থিতিশীল রাখতে একে আটকে নিতে হয়। অঙ্কিত নকশা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। ধারালো বাটালি দ্বারা কেটে কেটে কাঠকে ত্রিমাত্রিক কারুশিল্পে পরিণত করার পর কাঠের অমসৃণ অংশে, কাঠের দানা বা আঁশের দিকে ও বিপরীত দিক থেকে রেতি চালনা করা হয়। গ্রান্ডিং মেশিনের সাহায্যেও মসৃণ করা হয়। এই সদ্য কাঠের তৈরি কারুশিল্পকে আরও সূক্ষ্ম মসৃণ করতে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষতে হয়। ঘষার পরেই কাঠের তৈরি কারুশিল্পটিকে চাহিদা অনুযায়ী রঙ এবং বার্নিশ দিলে, অথবা পোড়াতে চাইলে বার্নার দিয়ে পুড়িয়ে নিলে দৃষ্টি নন্দন কারুশিল্প তৈরি হয়। একমাত্র কাঠ দিয়েই ভিন্ন ভিন্ন ধাপ পেরিয়ে এমন কারুশিল্প তৈরি করা সম্ভব।

কাঠ খোদাইয়ের কাজ করার মাধ্যমে দ্বিমাত্রিকতা ও ত্রিমাত্রিকতা দেওয়া হয়। কাঠের তৈরি কারুশিল্প বেশির ভাগই ত্রিমাত্রিক। এই ত্রিমাত্রিক কাঠ খন্ডের উপর নকশা করা হয়। তারপর কারুশিল্পী আপন মনে বাটালি দিয়ে কুঁদে সুন্দর রূপ ফুটিয়ে তোলে। কেউ কেউ শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে মসৃণ করার চেয়ে অনেক সময় মসৃণের চেয়ে বাটাল দিয়ে কাটার ফলে টেক্সচার তৈরি হয়। এতে আলাদা মাত্রা যোগ করে। একমাত্র কাঠেই এমন টেক্সচার দেওয়া সম্ভব। সবশেষে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হয়। বড় কাজ করার সময় একটি কাঠকে আরেকটি কাঠের সাথে জোড়া দেওয়া হয়। কাঠের তৈরি কারুশিল্প একটা সার্বজনীন কারুশিল্প। এটা গ্রাম বাংলার আদি শিল্প মাধ্যমগুলির মধ্যে অন্যতম।

৭.৩ তথ্যের উৎস

বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য দুটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১. প্রাথমিক বা মুখ্য উৎস

২. মাধ্যমিক বা দ্বৈতয়িক বা গৌণ উৎস

নিম্নে উৎস সমূহ বর্ণনা করা হল ঃ

১. প্রাথমিক বা মুখ্য উৎস

নির্বাচিত এলাকার অর্থাৎ যেসব জায়গায় কাঠের কাজ বেশি হয় সেসব এলাকার সদস্যদের কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রাপ্ত তথ্যের সমষ্টিকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তাছাড়া পর্যবেক্ষনের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. মাধ্যমিক বা দ্বৈতয়িক বা গৌণ উৎস

তথ্যের মাধ্যমিক উৎস দেশী-বিদেশী বই, জার্নাল, পত্রিকা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চারুকলা অনুষদ গ্রন্থাগার, গণ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে মাধ্যমিক বা দ্বৈতয়িক উৎসের তথ্য পাওয়া গেছে। এই গবেষণার ৪র্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের জাদুঘরসমূহে সংরক্ষিত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নিদর্শনের জন্য এবং ঐতিহ্য অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন জাদুঘরের মাধ্যমে দ্বৈতয়িক উৎস থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্য নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর, লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, ঢাকা জাদুঘর, ময়মনসিংহ প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর, সিরাজগঞ্জ শাহজাদপুরের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এর কাছারি বাড়ি জাদুঘর, রাজধানী ঢাকার গুলশান ডিএমসি সুপার মার্কেট থেকে কারুশিল্প বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

৭.৪: নমুনা কাঠামো

আলোচ্য গবেষণায় ‘উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন’ প্রয়োগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিশেষ বিশেষ সমগ্র একককে নমুনা হিসাবে বাছাই করা হয়েছে। এখানে গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অন্যতম অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এ ক্ষেত্রে গবেষকের বিচারবুদ্ধি,

জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা নমুনা নির্বাচনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। আলোচ্য গবেষণার শিরোনাম "বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প: ঐতিহ্য অনুসন্ধান" এ ----জন কারুশিল্পীর সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে নির্দিষ্ট কোন নমুনায়ণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি, বরং গবেষকের বিচারবুদ্ধি মতো উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ----------জন কারুশিল্পীকে অধ্যায়ন করার জন্য বাছাই করা হয়েছে।

৭.৫ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

৭.৫.১ কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায় "কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতি" এর মাধ্যমে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি হচ্ছে মুক্ত, অনিয়ন্ত্রিত এবং কাঠামোহীন, এই পদ্ধতীতে পূর্বনির্ধারিত কোন প্রশ্নমালা বা নির্দেশিকা নেই। প্রশ্নের কোন ধারাবহিকতা রাখা হয়নি। যেকোন সময় যেকোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। সকল উত্তরদাতাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সাক্ষাৎদাতাদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সংখ্যার বিষয়ে ও কোন বাধাধরা নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। আলোচ্য গবেষণায় উত্তরদাতাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তিনিই মূখ্য ব্যক্তি। গবেষক শুধু উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করেছেন। উত্তরদাতা বাঁধাহীনভাবে তার ইচ্ছা মত উত্তর বর্ণনা করেছেন। উত্তরদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা ও নির্ধারণ করা হয়নি।

৭.৫.২ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেগুলোর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছি। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক রচনা ও শিল্প যেমন- বই, কবিতা, সংবাদপত্র, গান, চিত্র বক্তৃতা, চিঠি, আইন সংবিধান ইত্যাদি অধ্যায়ন করে সিদ্ধান্তে পৌছানো হয়েছে।

৭.৫.৩ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায় অবকাঠামোতে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বাস্তবে প্রসঙ্গক্রমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে গবেষকের পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। সরাসরি অংশগহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ঘটনা বা বিষয়াদির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। স্বাভবিক প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৮. তথ্য বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন

আলোচ্য গবেষনায় মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের জন্য গবেষণার প্রয়োজনে তথ্যের গুনাত্মক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যকে কারুশিল্প সামগ্রীর ছবি উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কারুশিল্প সামগ্রীর পরিপূর্ণ রূপ ও আয়ের, কারুশিল্পীরা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষনীয় কারুপণ্য তৈরি করছে, তা বর্ণনা ও ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৯. তথ্য সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা

সামাজিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। আলোচ্য গবেষণাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান গবেষণায় "বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য অনুসন্ধান" একটি ব্যাপক বিষয় হওয়ায় যে অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট কাজ অধিক পরিমাণে হয় সেই অঞ্চলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখানে দেশে কার্যরত কয়েক হাজার কাঠের কারুশিল্পী বা সূত্রধরদের মধ্যে কতিপয় কারুশিল্পী বা সূত্রধর এবং জাদুঘরে সংরক্ষিত কয়েকটি কাঠের কারুশিল্পের বিশ্লেষণের ব্যাপারটি কতটুকু প্রতিনিধিত্ব করবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। তদুপরি বিষয়গুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে সতর্কতার সাথে এগোতে হয়েছে। এমন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কাঠের কারুশিল্পের হাজারো সামগ্রীর মধ্যে ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক কারুশিল্পের সাথে পরিচয় ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর বিস্তৃতি আরও ঘটলে গবেষণাটি তথ্যবহুল হত। কারুশিল্পী বা সূত্রধরদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কাজটি সম্পাদন, অর্থ এবং শ্রম প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি এক্ষেত্রে বিবেচ্য। তাই আলোচ্য গবেষণাটিকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা যাবে না, কাজ করার আরও সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণারও সুযোগ রয়েছে। তবে বাংলাদেশের বেশির ভাগ কাঠের কারুশিল্প প্রস্তুতকারী কারুশিল্পীরা যেখানে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে, অবহেলিত এবং তাদের আর্থ-

সামাজিক, ব্যক্তিগত কোন ক্ষেত্রেই যেহেতু তেমন কোনো উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি, সেক্ষেত্রে সরকারসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নেয়া কর্মকৌশল কাঠের কারুশিল্পীদের সুযোগ-সুবিধা, অগ্রগতির মাত্রা কতটুকু বৃদ্ধি করেছে এবং তার আলোকে উপস্থাপিত সুপারিশমালা কাঠের কারুশিল্পীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে নিঃসন্দেহে।

১০. অধ্যায় বিন্যাস ঃ একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

বিশ্লেষণের সুবিধার্থে বর্তমান গবেষণাকে মোট আটটি অধ্যায়ে ভাগ করে প্রতিটি অধ্যায়ে গবেষণা কর্মের সাথে সংগতি রেখে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে অধ্যায় বিন্যাস তুলে ধরা হলঃ

ভূমিকায় গবেষণা সমস্যার বর্ণনা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি অনুমান, যৌক্তিকতা, সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা পদ্ধতি আলোচনায় প্রথমেই এলাকা নির্বাচন, গবেষণার চলক, তথ্যের উৎস, নমুনা কাঠামো, প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ এবং পূর্ব পরীক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, তথ্য সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা বিষয় হিসেবে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশ ও পরিচিতি নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। এখানে কারুশিল্পের বিকাশ ও পরিচিতির বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশ তার উন্নয়ন ধারণা থেকে আধুনিকীকরণ তত্ত্ব এবং কারুশিল্পীদের উন্নয়ন তাদের কাজের উন্নয়নের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কারুশিল্পের বিকাশ ও পরিচিতি বিসিক কর্তৃক ১৯৮৫ সালের প্রকাশিত ডাইরেক্টরীতে প্রকাশিত ডাটা অনুযায়ী সারণী তুলে ধরা হয়েছে। সরেজমীনে প্রাপ্ত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশের তথ্য পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাঠের তৈরি কারুশিল্প সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে বাংলাদেশের প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ, কবিতা, কাব্য, ছড়া, গান ইত্যাদি থেকে লাইন তুলে ধরা হয়েছে। ধর্ম শাস্ত্র, কোরআন, ইঞ্জিল, মহাভারত, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ থেকে কাঠের তৈরি কারুশিল্প সম্পর্কিত বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উপর ইতিহাস দেশে ও বিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সময়কালসহ আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের জাদুঘরসমূহে সংরক্ষিত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নিদর্শণসমূহ ঐতিহ্য সন্ধানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আহসান মঞ্জিল, ময়মনসিংহের প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর, শাহজাদপুরের রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি এ কয়েকটি জাদুঘরে সংরক্ষিত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নিদর্শন সম্পর্কে ছবিসহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উপকরণ ও করণ-কৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজের সুবাদে অধ্যায়টি সমৃদ্ধ হয়েছে।

ক. কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উপযোগী কাঠ, কাঠ সংগ্রহ ও কাঠ সিজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের করণ-কৌশল মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গ. রঙ এর ব্যবহার ও নকশা চয়ন লক্ষ্য করলে দেখা যায় রঙ এর ব্যবহার ও নকশা ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার আলোকপাত করা হয়েছে এই আলোচনার মাধ্যমে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশ বিক্ষিপ্ত ভাবে কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আছে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের হাজারো সামগ্রী। যে অঞ্চলে যে সামগ্রী বেশি হয় সেই এলাকা বা অঞ্চলের কারুশিল্পীদের সাক্ষাৎকার, তাদের তৈরি শিল্প সামগ্রীর ছবি, বানানোর কৌশল সহ নানা ধরণের কৌশল ও ইতিহাস ইত্যাদি সরাসরি মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে অধ্যায়টিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিপণন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সাথে বিপণনের সম্পর্ক নিবিড়। এই শিল্পটি নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশের বাজার বিদেশের বাজারের যে বিপণন ব্যবস্থাতা নিয়ে ব্যাখা করা হয়েছে। মেলাকে কেন্দ্র করে দেশের বাজারে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিপণন হয়। সেজন্য বাংলাদেশের জেলাওয়ারী মেলার সংখ্যাও সারণীর মাধ্যমে এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষে আছে উপসংহার এবং সুপারিশ সমূহ। এতে ফলাফল ভিত্তিক সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে তার আলোকে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. নীহার রঞ্জন রায়, ev½vjxi BwZnvm, আদিপর্ব, কলকাতা ঃ দে’জ পাবলিশিং, ১৪২০, পৃ. ৪

২. Victor Zelger, The Fine Crafts in the federal Republic of Germany, P.41

৩. গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, cvPxb wkí-cwiPq, কলকাতা ঃ সুবর্ণরেখা, ১৩২৯

৪. জিনাত মাহরুখ বানু, evsjv‡‘‡ki ‘viæwkí, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩

৫. তারাপদ সাঁতরা, evsjvi Kv‡Vi KvR, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ঃ সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ২০০৩

৬. খগেশকিরণ তালুকদার, evsjv‡‘‡ki †jvKvqZ wkíKjv, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

৭. মিহির ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত, e½xq wkí cwiPq, কলকাতা ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৪

৮. ড. আব্দুস সাত্তার, evsjv‡‘‡ki b‡ZvbZ ‘viæwkí, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬

৯. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, evsjvi wgDwRqvg t evsjvi †jvKwkí, ঢাকা ঃ বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০০১

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, wkíwPšÍv, তহমিনা চৌধুরী ও অসীম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা ঃ দীপায়ন, ২০১২

১১. Stan Smith, Professor H.E. Ten Holt (Consultant Editors), The Artist’s Manual: Equipment, Materials, Techniques, Newyork: An Imprint of W.H. Smith Publishers Inc. 1988.

১২. Shyamalkanti Chakravarti(Edited), Wood Carvings of Bengal in Gurusaday Museum, Kolkata : Gurusaday Museum, 2001.

১৩. অরুণ কুমার লাহিড়ী, KvV msiÿY weÁvb, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

১৪. মোহম্মদ সিরাজুদ্দিন, KvUi wkí, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬

১৫. ড. অতুল সুর, ev0jv I ev0vjxi weeZb, কলকাতা ঃ সাহিত্যলোক, ২০০৮

১৬. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, Kv‡Vi KvR, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

১৭. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), PhvMxwZKv, ঢাকা ঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ

১৮. আহমদ শরীফ, ga¨h‡Mi mwwn‡Z¨ mgvR I ms¯wZi i|c, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ২০০৬

১৯. আবুল ফজল আল্লামী, AvBb-B-AvKeix, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮

২০. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, Qovq ev0vjx mgvR I ms¯wZ, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১. কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশ ও পরিচিতি

সমাজে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের প্রয়োজন ছিল বলেই এর বিকাশ ও উন্নতি ঘটেছিল। বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষ আবহমান কাল ধরে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের এক সোনালী ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। ঐতিহ্যময় কাঠের কারুশিল্প সৃষ্টি করে সারা বিশ্বে এদেশের সংস্কৃতির পরিচয়কে অব্যাহত ভাবে তুলে ধরার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিনিয়ত গ্রামের কারুশিল্পী ঐতিহ্যের সংস্কৃতির পরিসীমায়, আলোকে সৃষ্টিশীল শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে কারুশিল্পের সৃষ্টির পরিচয়, মর্যাদাকে উজ্জীবীত করছে। গ্রামের কারুশিল্পী পুরানো ধারায়, গড়ণে, রঙ-এ, বৈশিষ্ট্যে, বৈচিত্রময় করার জন্য রূপান্তরের মাধ্যমে কাঠের কারুশিল্পের ভান্ডারকে কালের পরিসীমার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে কারুশিল্পকে সকল কালের করে তুলেছে। তার সাথে সাথে সার্বজনীন করার চেষ্টা করছে। সেজন্যই বাংলাদেশের কারুশিল্প এদেশের লোক সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে চিরচেনা, জনপ্রিয়। যাপিত জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েছে। দেশের পরিচয়, জীবনের পরিচয়, সংস্কৃতির পরিচয়, পরিবেশ ও প্রতিবেশের পরিচয়ের ধারক বাহক কারুশিল্প। এই কারুশিল্পের শিল্পী ও কারিগর তার চার পাশের প্রকৃতি ও পরিবেশের উপাদান ও উপকরণ দিয়ে কারুশিল্প সৃষ্টি করে থাকে। ঐতিহ্যের সংস্কৃতির নানা উপাদান যেমন কালের ব্যবধানে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে নতুন নতুন রূপ লাভ করে। মানুষের প্রয়োজনে তেমনি কাঠের তৈরি কারুশিল্প অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষের জন্য গড়ণে, রঙ-এ, বৈশিষ্ট্যে কাংখিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের শিল্পী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত করণকৌশল ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কারুশিল্পের সৃষ্টির ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করছে। কারুশিল্পের সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত ও সচল রাখতে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা ক্লান্তিহীন, আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের কারুশিল্পীর এই কর্ম উদ্দীপনাময় উদ্যোগ ও উদ্ভাবনীময় প্রচেষ্টা সবার দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন ঘটছে এবং ঘটে যাচ্ছে। কেবল সৃষ্টির ফসল কারুশিল্পের বাহ্যিক অবয়ব, রূপকেই শুধুমাত্র দেখা হয়, কিন্তু সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এ সব পর্যায় চোখের আড়ালেই ঢাকা পরে থাকে। কারুশিল্পীর সৃষ্টির বিচিত্র পর্যায়ে যে গতি, বেগ, অন্তদৃষ্টি রয়েছে এবং অফুরন্ত সম্ভাবনাকে ধারণ করে আছে তা গবেষণা ও মূল্যায়ণের দাবী রাখে।

বাংলাদেশের কাঠের কাজ সর্বত্র পরিচিত। কম বেশি এ সামগ্রী প্রত্যেকের নিজস্ব হিসাবে থাকে এবং তা অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত রুচিভেদে পছন্দের তারতম্য হয় কিন্তু সুন্দর নিত্য ব্যবহার্য বিশেষ প্রয়োজনীয়

কাঠের সামগ্রী কিভাবে উত্তরোত্তর রুচিপূর্ণ করে গড়তে হবে তা সম্ভবতঃ এ দেশে হাজারে একজনেরও জানা নাই বলা যেতে পারে। অন্য পক্ষে বাজারে সুনিপুণ কাঠের কাজ জানা লোকের কাজের চাহিদা ও মূল্য বেশ সম্মানজনক। অথচ নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে রুচিপূর্ণ আকারে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিদ্যা পরিচালনা ও অনুশীলনের অভাবে এই দেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্প কারখানা বন্ধ ও কারুশিল্পীরা হারিয়ে যাচ্ছে।

মানব সভ্যতার প্রাচীনতম পর্যায় থেকে সমাজে শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি হবার কারণেই লোক ও কারু এবং পরিশীলিত এই দুই শিল্পচর্চার ধারা বিকাশ লাভ করেছে সমান্তরালভাবে। বিশ্বে বিভিন্ন দেশের জাতীয় শিল্পে পরম্পরা কারুশিল্পের অস্তিত্বের ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। একেবারে প্রাচীন যুগ থেকে বিভিন্ন দেশে অসমানভাবে হলেও, যে পরিশীলিত শিল্পধারার বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে, সেখানে কাঠের তৈরি কারুশিল্প খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান যুগিয়েছে, এখনও যুগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক ও সমকালীন শিল্প চেতনার বিকাশে এই শিল্পধারা নান্দনিক বা সৌন্দর্যের প্রশ্নে নানা মৌলিক উপাদান যুগিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। জীবন সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে শিল্পীদের চিন্তা-চেতনাকে অনুশীলন করতে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এই কারুশিল্পের উল্লেখযোগ্য গুন হল প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিলিপি অপেক্ষা প্রকৃতির মূল ভাব ও ভাষাটুকু শিল্পে ব্যক্ত করা। শিল্পীদের কাছে realism অপেক্ষা বস্তুর লক্ষণ ও আভাস হলো বড় কথা।[১]

কারুশিল্পীরা প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা ছাড়াই পারিবারিক প্রতিদিনের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক বিশেষ ধরনের নান্দনিক বোধ ও শৈল্পিক দক্ষতা অর্জন করে থাকে। শিল্পীদের চিন্তা চেতনায় প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদিরও কম বেশি প্রভাব থাকে। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয় ও সামাজিক বিষয়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কারুশিল্প অর্থে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি এবং জীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সহজ সরল আবেদনসমৃদ্ধ প্রকাশ ভঙ্গি। কারুশিল্পের উল্লেখযোগ্য গুণ হল প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিলিপি অপেক্ষা প্রকৃতির মূলভাব ও ভাষাটুকু শিল্পে ব্যক্ত করা। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের চিন্তা-চেতনাকে জীবন সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অনুশীলনের বিকাশ নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এ শিল্পের চিন্তা চেতনায় প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদিরও কম বেশি প্রভাব থাকে।

কারুশিল্পের বিকাশের ইতিহাস রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস। পৃথিবীর সব দেশে কারুশিল্পকে মর্যাদার, জাতীয় পরিচয়ের, স্বপ্নের, ঐতিহ্যের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐতিহ্যগত গ্রামীণ কৃষিজীবি সমাজের কারুশিল্পের দ্রুত মর্যাদাহানী, অধোপতনের কারণ বলে বিবেচিত হয় । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই ইউরোপের

ফোকলোরিষ্ট, জাতিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ গ্রামীণ লোক ও কারুশিল্প সম্পূর্ণ অবলুপ্ত,নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাঁচাতে যতদূর সম্ভব নিদর্শন সংগ্রহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। লোকশিল্প যাদুঘর, কারুশিল্প যাদুঘর, শিল্পগ্রাম, খোলা যাদুঘর, কৃষি যাদুঘর স্থাপন করা হয়েছিল ।[২] উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যিক কারুশিল্পের বিকাশ অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা বিধান।

রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক–সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে বিশ্বের প্রতিটি দেশে প্রক্রিয়া ভিন্ন ও স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার । কোথাও এই প্রেক্ষিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সক্রিয়, বেগবান। কোথাও কোথাও বেগবান নয়। কোন না কোনভাবে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সূক্ষ্ম বিকাশ ঘটছে। এমনকি ক্ষীন ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের কারুশিল্প বেশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে এদেশের প্রকৃতি, পরিবেশের বেশিষ্ট্যময় উপকরণের ও কারুশিল্পির বংশ পরম্পরায়ের করণকৌশল ও দক্ষতার গুণে। বিকাশের এ বেশিষ্ট্য বাংলাদেশের এ দেশের সংস্কৃতির। বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে নিয়োজিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন লোক ও কারুশিল্পের শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা, কৌশল, উদ্ভাবনী শক্তির সম্ভাবনা বিকাশের প্রতি মর্যাদা প্রদানে তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর বিষয়ে প্রায়োগিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব বরেণ্য শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। তিনি ছিলেন আবহমান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একজন সচেতন মানুষ। জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে কারুশিল্পের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা আজকের এবং আগামী দিনের মানুষের কাছে চির জাগরূক ও ক্রিয়াশীল রাখাতে হবে। শিল্পাচার্য লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষন ও পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্ঠা গ্রহন করেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়কে স্মরণীয় করে রাখতে হলে তুলে ধরতে হবে জাতীয় লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যকে। বাংলাদেশের কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য, রূপ, গঠন এবং উপযোগিতা শিল্পাচার্যকে আকৃষ্ট করেছিল। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠার ফলশ্রুতি স্বরূপ সরকার **১২ই** মার্চ,**১৯৭৫** এ প্রকাশিত এক গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা শিল্পাচার্যের স্বপ্ন "বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করে । ঐ গেজেট ঘোষণা করা হয় "ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষন ও পুনরুজ্জীবনের এবং গ্রামীণ বর্তমান কারুশিল্পকে উৎসাহ ও বাঁচানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় সরকার লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে।"[৩] কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে শিল্পাচার্যের এমন ভূমিকা কারুশিল্পীদের একধাপ এগিয়ে নেয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপরেশন (বিসিক), কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখছে। ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের, কারুশিল্প বিভাগে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধান ও এর বিকাশের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কারুশিল্পের ঐতিহ্যের লালনের স্থান হিসেবে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের স্বাধীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওকে বেছে নেন। মুসলিন ও অন্যান্য লোক ও কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত ঐতিহাসিক সোনারগাঁওকে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গড়ে তোলার জন্য স্থান হিসেবে নির্বাচন করেন। বাংলায় সুলতানী শাসনামলে (১৩৩৮-১৫৩৮খ্রিঃ) স্বাধীন বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহ্, আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ্, সাধক সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের স্মৃতি বিজড়িত নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ এই সোনারগাঁও কেবল রাজনৈতিক কারণেই সুপরিচিত ছিল না বরং সোনারগাঁওয়ে উৎপন্ন প্রাচ্যের গৌরব বিখ্যাত মুসলিন ও জামদানী বস্ত্র প্রাচিন কাল থেকেই মিশর, চীন, সিংহল, বার্মা, মালাককা, সুমাত্রাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতো। এ ছাড়াও সোনারগাঁও অঞ্চলের ঝিনুকের কাজ ও চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতি, পুতুল কাঠের তৈরি কারুশিল্প সর্বভারতে অতি সমাদৃত ছিল। ইবনে বতুতা, মাহুয়ান, ফাহিয়ান, র‍্যালফিচ, প্রমুখ বিদেশী পর্যটক সফর করে তাদের ভ্রমন বৃত্তান্তে ইতিহাসের সোনারগাঁয়ের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[৪]

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা আশিভাগ গ্রামের কৃষিজীবি মানুষের শিল্পকর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও জাতীয় ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে এর অনিবার্য ভূমিকার কথা চিন্তা করেই এই ফাউন্ডেশন গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কাঠের তৈরি কারুশিল্পসহ অন্যান্য কারুশিল্পের বিকাশের জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৭৬ সালে লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরের কাজ শুরু করা হয় এবং লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদি ব্যাপক সংগ্রহ অভিযান চালান হয়। লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষন ও পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সরকার গৃহীত কর্মসুচি হিসাবে ১৯৭৭ সালে প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে "লোক ও কারুশিল্পের যাদুঘর" প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে "লোক ও কারুশিল্পের যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম–ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" নামে ১৫০ বিঘা জমিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। ১৯৯০ সালে প্রকল্পের প্রথম পর্যায় লোক ও কারুশিল্পের যাদুঘর প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়।[৫]

কাঠের তৈরি কারুশিল্প সাধারণত সুতার সম্প্রদায়ের হাতে তৈরি হয়। প্রাচীন বাংলার খোদই, তক্ষণ এবং স্থাপত্যশিল্প সুতারদের কাজ ছিল কিন্তু ইতিহাসের জটিল কালপরিক্রমায় একদা তা এসে কাঠমিস্ত্রীর কর্মের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ে। সূত্রধর যে শুধু কাঠমিস্ত্রী তাই নয় আমাদের প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রে সূত্রধর বলতে স্থপতি, তক্ষনকার, খোদাইকর সকলকেই বোঝায়। তাছাড়া সংসারের বিভিন্ন আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, গরুরগাড়ি, রথ, বিশেষ করে নদীগামী নানা প্রকার নৌকা, সমুদ্রগামী, বৃহদাকৃতি নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি সমস্তই ছিল কাঠের। এই দিক দিয়ে দেখলে কাঠের তৈরি শিল্পের সমৃদ্ধি সহজেই বুঝায় এবং সমাজের মধ্যে এই শিল্পীদের একটি স্থান ছিল।[৬] কিছুদিন আগেও শুধু অভিজাত উচ্চ

শ্রেণী নয়, সাধারণ অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে, চন্ডিমন্ডবে, সৌখিন শিল্পরীতি অনেক মন্দির, মসজিদের কাঠের খুঁটি, চালের বাতা, চৌকাঠ, কড়িকাঠ, খিলান ইত্যাদিতে আশ্চর্য্যরকম সুন্দর খোদাইকৃত কারুকার্য্যময় কাষ্ঠশিল্পের সন্ধান অতিসল্পই আজ আমাদের কাছে আছে। এছাড়া খাট, পালঙ্ক, সিন্দুক, ঢেঁকি, পিঁড়ি, খঞ্জা, বারকোষ, পিলসুজ, পেটেরা, চারা-চইরা, বাদ্যযন্ত্র, বাটি বিভিন্ন ধরেণের তৈজষপত্র, হুক্কা, হুক্কার নল, ছুরির বাট, কৌটা, মস্কা, কাঠের পুতুল, কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবহার যেমন ছিল প্রচুর, তেমনি এগুলো বাঙালী সূত্রধরদের কারুকার্য্য ও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বিকল্প পণ্যের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্প বোধকরি সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ অল্প কিছুদিন আগেও সম্পূর্ণ উচ্চবিত্তের তামা-কাঁসা, পিতলের তৈজষপত্রের মত প্রকৃত বাঙ্গালীর গৃহে কাঠের তৈজষপত্র বেশি ব্যবহৃত হত।

জেমস টেলর লক্ষ্য করেছিলেন সাধারণ নিম্নবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে যেমন পাথরের থালা-বাটি-গ্লাস ইত্যাদির ব্যবহার অধিক তেমনি নিম্নবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে কাঠের তৈরি থালা-বাটি, খঞ্জা-বারকোষ ইত্যাদি দৈনান্দিন ব্যবহার অধিক। গৃহের খুটি, চৌকাঠ, খিলান, চালের-বাতা, দরজা ইত্যাদি কারুকার্যই ছিল সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্টমন্ডিত। খুটি, দরজা, জানালার পাল্লায় খোদিত হত লতা-পাতা, ফুল-পদ্ম ইত্যাদি আলপনা চিত্র ও নানা জ্যামিতিক ছক; চৌকাঠ-কড়িকাঠের সরু লম্বাটে আয়তনে খোদিত হয়। নানা লতা-পাতা, বিশেষত, তরঙ্গিত ও পুষ্পিত লতা। সর্বাপেক্ষা চমৎকারিত্ব প্রকাশ প্রায় চালের বাতা ও ডাফ-এর মধ্যে। ডাফগুলো কখনও মনুষ্যাকৃতি কখনও হাতিরশুড়ের আকৃতি, কখনও পরী বা অর্ধপশু, অর্ধমানব অথবা নানা পশুর চিত্রে শোভিত হয়। চাকের সাহয্যে খোদাইকৃত খাট-পালঙ্কের পায়া, পিলসুজ, বিভিন্ন যন্ত্রের বাট বা আছারি, কৌটা, পুতলি ইত্যাদিতে সাধারণত কোন চিত্র থাকে না, ক্ষেত্র বিশেষে নানা জ্যামিতিক ছক থাকত মাত্র।[৭]

সম্রাট অশোকের শাসন আমলে (২৬৮-২৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) কাঠ মিস্ত্রিদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। গুপ্তযুগে কামার ও স্বর্ণকারের পাশাপাশি কাঠমিস্ত্রিদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের সময়ে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিশেষভাবে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করে। মোগল শাসনামলেও কারুশিল্পের বিশেষ কদর ছিল। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়ে কারুশিল্পী এবং তাদের শিল্পকর্ম বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল।[৮] সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার কাঠের তৈরি কারুশিল্প গৌরবের অধিকারী ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজপ্রাসাদ কাঠের তৈরি কারুশিল্পের কারুকাজে সমৃদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে এই কাঠের তৈরি কারুশিল্পের অনুকরণে বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ, জামিদার ও উচ্চবিত্তদের গৃহের দরজা, বেড়া, চেয়া, টেবিল, পালঙ্কেও ক্ষোদিত হয়েছে কাঠের কারুকাজ।[৯] লোহা, গরু, লাঙল ও জলাভূমিতে ধানের ব্যবহারের ফলে

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক কৃষির প্রসার ঘটে। গরু লাঙল টানে, গাড়ি বয়, ধানের খড় খায় এবং গোবর দিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মানুষ ও পশু উভয়ে মিলে এক চিত্তকর্ষক মিথোজীবন ব্যবস্থার জন্ম দেয়।[১০]

"মাটির গায়ে আলপনার রেখায় আমরা যে ছবি দেখিতে পাই সেইরূপ ছবিই আমরা দেখিতে পাই পাথরের ফলকে, ছুতার-মিস্ত্রির কারুকার্য আঁকা কাষ্ঠখন্ডে, দেহের উলকিতে, গহনায়, রঙিন কাথার এবং গৃহের সূক্ষ্ম বেত্রবন্ধনীতে।"[১১] বাংলাদেশের কারুশিল্প তার সর্বাপেক্ষা গৌরবের জিনিস। বাংলাদেশের কারুশিল্প প্রধানত কৃষিজ দ্রব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার প্রধান সহায় এই কাঠ। সেই সুদূর অতীতকাল হতে এখন পর্যন্ত মানুষের এই জগতে নানারূপে কাঠের ব্যবহার প্রায় সমানভাবেই চলে আসছে। কাঠের গুণাবলি অশেষ, অফুরন্ত এবং তাহার ব্যবহারের ক্ষেত্রও অগণিত। আগুন জালানের মধ্য দিয়ে সভ্যতার সূচনা হয়। কবে, কখন, কে আগুণ জালায় তা জানা নাই, কিন্তু এত সন্দেহ নাই যে, মানুষের হাতে প্রজ্বলিত আগুনের প্রথম মাধ্যম ছিল কাঠ। পৃথিবীর সব সুন্দর জিনিসই সহজ হয় কারণ সহজ ভাবই সৌন্দর্যের আদর্শ কাঠও তাই।

"এদেশের পল্লিগ্রামে ভ্রমণ করিলে অতি সহজেই চোখে পড়িবে, সাধারণ ছুতার মিস্ত্রিরা কাঠের উপর কত অপূর্ব কারুকার্য করিয়া রাখিয়াছে। ঘরের চৌকাঠ, কাঠের বেড়া, খাট-পালঙ্ক, সিন্দুক, বাক্স, লাঠি, সারিন্দা, দোতারা, কাঠের ও বাঁশের গুঁড়ির হুকা, রথ, পালকি গাড়ি, শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ প্রভৃতি সব জিনিসের উপরই এইসব শিল্পীরা সৌন্দর্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছে।"[১২] "ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে এক বৃদ্ধ মুসলমান খুব সুন্দর সুন্দর কাঠের পানের বাটা তৈরি করে। তাহার গায়ে রঙিন লতা-পাতা ও ফুল আঁকা হয়। এক কিশোরগঞ্জ ছাড়া আর কোথাও এরুপ পানের বাটা আমরা দেখি নাই।"[১৩]

নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষ জীবনে চলার পথে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উপাদান-কাঁচামালকে প্রাকৃতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে নানা গড়ণে, রূপে, বস্তুতে, পরিণত করে। মানুষ তার নিজ প্রয়োজনে এভাবেই প্রকৃতির সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপাদান-কাঁচামাল থেকে সৃষ্টি করেছে। তাই তার প্রয়োজনে জীবন রক্ষার জন্য হাতিয়ার, অস্ত্র, নিত্য ব্যবহার্য জিনিস, আশ্রয়ের জন্য বাসস্থান পরিধানের জন্য বস্ত্র তৈরি করছে। প্রতিদিনের গৃহস্থালী কাজের প্রয়োজনে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণ অনুষ্ঠানের জন্য টোটেম, দেবদেবীর মূর্তি, পুতুল। সবকিছুই জীবনযাপনের সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবেযুক্ত।

প্রাকৃতিক পরিবেশের আওতায় বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলে সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপাদান-কাঁচামাল দিয়ে সে অঞ্চলের মানুষ জীবনের প্রয়োজনে যা করেছে তা থেকেই শৈল্পিক কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে। আদিকাল থেকে আজ অবধি এই শৈল্পিক কারুশিল্প, বৈচিত্রময় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। বিকশিত হয়েছে সংস্কৃতি, রূপ লাভ করেছে নতুন মাত্রায়। এই প্রাকৃতিক কাঁচামাল থেকে কাঠের তৈরি কারুশিল্পই সংস্কৃতির বস্তুগত রূপ। সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ কাঠের তৈরি কারুশিল্পের কারিগর, শিল্পী সাধারণ মানুষ। মানুষ হাত ও হাতিয়ারের সাহায্যে কাঠের তৈরি কারুশিল্প সৃষ্টি করেছে। কারুশিল্পে ফুটে উঠে মানুষের জীবনের বহুমাত্রিক দিক। চারপাশের জগৎ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, পরিবেশ, জীবনাচরণ, উৎসব, লোকজ ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে মানুষ তার কারুশিল্পের সৃষ্টিতে তুলে ধরেছে। কারুশিল্পে ফুটে ওঠে সংস্কৃতির রূপ বৈশিষ্ট্য এবং চমৎকারিত্ব। মানুষ তার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রযুক্তি ও কৌশল দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে দক্ষতাকে আয়ত্বে এনে কাঠের তৈরি কারুশিল্প সৃষ্টি করে। বিশ্বের অঞ্চল ভেদে এই শিল্পের পরিচয়ে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যময় কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিকাশ হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশ মূলত অঞ্চলভিত্তিক। অঞ্চলের সংস্কৃতি ভিত্তিক।

ভারতীয়, মিসরীয়, মেসোপটেমীয়, চীনা, পেরু আজটেক, আরব, ইনকা রোমান সংস্কৃতি ও সভ্যতা সংশ্লিষ্ট কারুশিল্প। এছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে প্রাচীন কাল থেকে নৃগোষ্ঠী যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে এবং ঐ সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে যে কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই এ কারুশিল্পের সঙ্গে জাতিতত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। এমন ক্ষদ্র অঞ্চলের মানুষের সৃষ্টি কারুশিল্পও সাংস্কৃতিক কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।[১৪]

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং উক্ত অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের সাংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বিকশিত কারুশিল্প। সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এই কারুশিল্পকে সাংস্কৃতিক কারুশিল্পও বলা যেতে পারে।[১৫] এর সঙ্গে প্রকৃতি, পরিবেশ, জাতিতত্ত্ব সম্পৃক্ত। আবহমান কাঠের তৈরি কারুশিল্পে বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও আদি নৃগোষ্ঠীর জীবনযাপনের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক কারুশিল্পের বহু নিদর্শন রয়েছে যা আমাদের লোকশিল্পের অন্তর্ভূক্ত নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত নয়। কারুশিল্পের পরিচয়, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এখানে সংস্কৃতি সরাসরি, প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

ফলে সাংস্কৃতিক কারুশিল্প ভান্ডারের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি কারুশিল্প নিজ নিজ দেশের সংস্কৃতির পরিচয়কে, বৈশিষ্ট্যকে, শৈল্পিক মহত্তকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি কেন্দ্রিক কারুশিল্প

ছাড়াও ধর্মীয় আদর্শ মূল্যবোধ দর্শন, জীবন ও সমাজব্যবস্থাও কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিকাশ ঘটেছে।

কাঠের কাজ ইসলামী শিল্পকলায় বিকশিত হয়েছে মূলত ইরান ও তুরস্কের যাযাবর অধিবাসীদের শিল্প ঐতিহ্যর প্রভাবে। জেরুজালেমের 'ডোম অব রক' (৬৯১ খ্রিস্টাব্দ) এবং আল আক্সা মসজিদের কাঠের তাক বা কেবিনেটগুলোতে হেলেনিস্টিক শিল্পরীতির প্রভাব দেখা যায়। ফাতিমীয় যুগের কাঠের কাজেও আসে নতুন ধ্যান ধারণা ও রীতি পরিবর্তনের ছোঁয়া। তুলুনীয়দের ঐতিহ্যবাহী অলঙ্করণ এবং গভীর খোদাই কাজের নিদর্শন রয়েছে আল-হাকিম মসজিদের কাঠের বিম এবং আল-আজহার মসজিদের অলঙ্কৃত দরজায়। অ্যারাবেস্ক, পাতা নকশা, পাখি বিভিন্ন প্রাণী এবং মানুষের চিত্র, শিকার দৃশ্য, রাজকীয় দৃশ্য, এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে সজ্জিত পশু পাখির দৃশ্য প্রভৃতি এবং উদ্ভিজ্জ নকশার প্রাচুর্য ফাতিমীয় অলঙ্করণের বৈশিষ্ট্য বহন করে।[১৬] বাংলাদেশে ত্রয়োদশ শতক থেকে ইসলামী শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিস্তার ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সেই সময় থেকে আজ অবধি বাংলাদেশে স্বতন্ত্র ইসলামী শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা সক্রিয়। পাশাপাশি ত্রয়োদশ শতকের আগে মুসলমানদের এদেশে আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে লোকজ ধারা লোক কারুশিল্পের এবং লোকস্থাপত্যের ধারা তা আজো প্রবহমান।[১৭]

তবে সংস্কৃতির দুটি ধারার মধ্যে ক্রমাগত সম্মিলন ঘটছে। ফলে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পে নতুন সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের অবতারণা হয়েছে। আঞ্চলিক লোকজ ধর্মীয় অনুশাসন, বিশ্বাস গোরামি মুক্ত সার্বজনীন ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ধারার কাঠের তৈরি কারুশিল্প কেবল বিকাশ লাভ করেনি বরং এদেশের কারুশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বতন্ত্র ইসলামী কারুশিল্পের ধারা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে করেছে উজ্জ্বল। বাংলাদেশের ইসলামী কাঠের তৈরি কারুশিল্প বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নকশা ও মোটিফের জন্য বিশেষ গুরুত্ব ও উল্লেখের দাবি রাখে।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে ইসলামের শাস্বত বাণী, মূল্যবোধ ও চেতনা যুক্ত হয়ে নতুন ধারা ইসলামী শিল্পকলার বিকাশ হয়েছে। ফলে ইসলামী শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ইসলামী শিল্পকলা ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গ ইসলামী কারুশিল্পের বিকাশ হয়েছে। ইসলামী কাঠের তৈরি কারুশিল্পে একটি ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও বৈশিষ্ট্যের সাধারণ চরিত্রযুক্ত অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক প্রাচীন ধারার পাশাপাশি ইসলামী ধারা সক্রিয়, অগ্রসরমান। ভারতে প্রাচীন

ভারতীয় ধারা ও আঞ্চলিক ধারার কারুশিল্পের পাশাপাশি ইসলামী ধারার কারুশিল্প বিকাশলাভ করেছে এবং সক্রিয় রয়েছে। অনুরূপ অবস্থা বাংলাদেশেও বিরাজমান।[১৮]

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পে যে ইসলামী ধারা রূপান্তরের মাধ্যমে বিকাশ হয়েছে তা বাংলার কারুশিল্পের প্রধান চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রেখেই হয়েছে। সংস্কৃতির গ্রহণ-বর্জন এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে ইসলামী কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশ হয়েছে।

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। কাঠের তৈরি কারুশিল্পে সংস্কৃতির ধারা ও ইসলমী শিল্পকলা ধারার মিলন ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী শিল্পকলার ধারাকে অনুসরণ করে স্বতন্ত্র লোকজ ইসলামী কারুশিল্প ধারার সৃষ্টি হয়েছে। কখনো দুটি ধারা আঞ্চলিক লোকজ এবং ইসলামী ধারার সহবস্থান হয়েছে।

বর্তমানে কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিকাশে যেমন বাধাগ্রস্থ হয়েছে তেমনি কারুশিল্পের নিরিখে সুস্থ সবল বলিষ্ঠ আধুনিক এই শিল্প গড়ে ওঠার কোন পথ ও পরিবেশ পাচ্ছে না। নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, নকশা ও মোটিফের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে উদ্ভাবিত নতুন আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা সব সময় বিদেশী মোটিফের নকশার বিদেশী চিন্তা ও চেতনার আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের নগরজীবনের নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলার ঐতিহ্যগত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ভান্ডার হারিয়ে যেতে বসেছে।

কখনো বা অবিকল বিদেশী কাঠের তৈরি কারুশিল্প তৈরি হচ্ছে। কখনো মিশ্রভাবে। বিদেশের কয়েকটি দেশের কাঠের কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে কোন অংশ কোন দেশের কেউ জানতে পারছে না। এছাড়া রয়েছে দেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নকশা ও মোটিফের ব্যবহারে কৃত্রিমতা। সবকিছু মিলিয়ে এই অবস্থা আমাদের কারুশিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন।

তথ্যসূত্র

১. শাহরিয়ার হোসেন শাবিন, লোকশিল্পে লোকজ খেলনা:নওগা, ঢাকা ঃ মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ৭৪৯

২. বজলুর রহমান ভূইয়া (সম্পাদিত), কারুময় ফ্রেম প্রদর্শনী ও সেমিনার, নারায়ণগঞ্জ ঃ বাংলাদেশে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬, পৃ. ২২

৩. কে.এম. হাবিব উল্লাহ্ (সম্পাদিত), নারায়ণগঞ্জ ঃ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৯২

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪২০ বাং, পৃ. ১৫১

৭. খগেশকিরণ তালুকদার, বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৬৬

৮. জিনাত মাহরুখ বানু, evsjv‡'‡ki 'viæwkí, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ. ১৯

৯. জিনাত মাহরুখ বানু, Kviæwkíx I Kviæwkí, কারুশিল্প মেলা, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১০

১০. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, M½vF¡× †_‡K evsjv‡'k, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ৫৪

১১. মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ (সম্পাদিত), বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, দীপঙ্কর ঘোষ (সংকলন), কলকাতা ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি ভিাগ, ২০০৪, পৃ. ৫০

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. জাবীন মাহবুব (সম্পাদিত), Kviæwkí, কারুশিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণামূলক পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৬. সানাউল হক, evsjv‡'‡ki Kv‡Vi wkíKg, ঢাকা ঃ দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ২২

১৭. জাবীন মাহবুব (সম্পাদিত), কারুশিল্প, কারুশিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. কাঠের তৈরি কারুশিল্প সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস

বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট সম্পদ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ কাঠের তৈরি কারুশিল্প। জীবন ভিত্তিক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী লৌকিক আচার আচরণ ও উৎসবের উপর ভিত্তি করে এই কারুশিল্প গড়ে উঠে। গ্রামীণ লোক সমাজের সাধারণ মানুষের সৃষ্টি কাঠের তৈরি কারুশিল্প। আবহমান বাংলাদেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্যের পরিচয় মিলবে এই কারুশিল্পে। বাংলার গ্রামীণ লোক সমাজ কারুশিল্পের সৃষ্টির ধারক ও বাহক। এ দেশের লোক জীবনের শৈল্পিক বৈশিষ্টগুলো কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ফুটে উঠেছে তা যেমন ঐতিহ্যময় তেমনি ঐশ্বর্যময়। এর বিকাশের ধারা অভিনব ও ক্লান্তিহীন এবং অবশ্যই বিস্ময়ের দাবী রাখে। লোক সমাজের জীবন-ধারণ রীতিতেই অনিবার্য সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে কাঠের তৈরি কারুশিল্প। এখানে লোকজীবন, সমাজ, পরিবেশ, গার্হস্থ্যজীবন-বাংলার কারুশিল্প সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

একসময় সূত্রধরেরাই কাঠের তৈরি কারুশিল্প তৈরি করত। খড়ম, কলমদান, কোরআন শরীফ রাখার রেহেল, ঘরের দরজা, কাঠের বাক্স, ফ্রেম,আলমারি, খাট, বসবার আসন, সিংহাসন ইত্যাদি তৈরি করত। এখনও অনেক সূত্রধরেরা এই কাজ করে। এরা এইসব পণ্য তৈরি করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। এদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ কারুশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মানুষের বিকাশ-বিস্তারধারায় তার ভাব চিন্তা-কর্মের নানা দিক লক্ষ্য করা যায়। এই বিকাশ বিস্তার ধারার তার নিজস্ব প্রয়োজনেই তৈরি করেছেন প্রাকৃতিক প্রতিবেশের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের সভ্যতার প্রবাহে দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় কাঠের তৈরি শিল্পকৃতির নানা রূপ দেখা যায়। এই ভূখন্ডের অধিবাসী বাঙালি ও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠীর হাতে নির্মিত কাঠের তৈজস-পত্রে এক অনন্য ইতিহাস রচনা হয়েছে।

পৃথিবীতে খুব কম দেশ আছে, যার রয়েছে হাজার বছরের উজ্জ্বল অতীত। ধীরে ধীরে তারা চাহিদার প্রেক্ষিতে যা যা প্রয়োজন তা তৈরিতে অবদান রেখেছে। হোক তা কাঠ, হোক তা মাটি, হোক তা পাথর এর যে কোন মাধ্যমেই অবদান রেখেছে নিজস্ব চেতনায়, আবার কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। মানুষের সমাজজীবন, সাংস্কৃতিক জীবন এক কথায় প্রতিদিনের জীবন চলত একই ছন্দে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের কারিগরী দক্ষতা ও তৈরিকৃত কারুপণ্যের সৌন্দর্য্যের উল্লেখ রয়েছে এ দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস এবং নান প্রবাদে যার বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

২.১ প্রাচীন সাহিত্য

২.১.১ চর্যাপদ

বাংলাদেশের অতি পরিচিত সাধারণ জীবন থেকে চর্যাকারগণ উপমা, রূপক সংগ্রহ করেছিলেন। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীই চর্যাগীতিতে উপমা-রূপক উপাদান জুগিয়েছে। তাই এগুলির মধ্য দিয়ে সেকালের কাঠের তৈরি কারুশিল্প জীবনের সাথে জড়িয়ে ছিল তার উপস্থিতি চর্যাপদের বিভিন্ন পদে পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বাজ নাব পাড়ী পউআ খালে বাহিউ ॥
অদঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িউ ॥

বজ্র নৌকায় পাড়ি দিয়ে পদ্মাখালে বাওয়া হল, অদ্বয় (রূপ) বাঙ্গল দেশ লুণ্ঠিত হ'ল। অদ্বয় বঙ্গ হচ্ছে অক্ষয় মহাসুখভূমি।[১]

মাঙ্গত চড়িলে চউ দিস চাইত।
কেডু আল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারত ॥[২]

নৌকার গলুইয়ে চড়ে চারদিকে তাকায়। দাড় নেই (এ অবস্থায়) কে কি বাইতে পারে।

গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ।
তহি চড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই ॥[৩]

ওরে, গঙ্গা যমুনা মধ্যে নৌকা বয়। তাতে চড়ে প্রমত্তঙ্গী (অর্থাৎ প্রমও স্ত্রীলোক) নিমজ্জিত ব্যক্তিকে অবলীলাক্রমে পার করে দেয়।

তূলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসূ
আঁসূ ধুণি ধুণি নিরবব সেসূ[৪]

তুলো ধুনে ধুনে (হ'ল শুধু) আঁশরে আঁশ, আঁশ বুনে ধুনে শেষে (তাকে করা হ'ল) নিরবয়ব।

২.১.২ মৈমনসিংহ গীতিকা

দীনেশচন্দ্র সেন রচিত ‰ggbwmsn MxwZKvq যেসব গাথা বা গীতিকা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে মানুষের চিরকালের সুখ-দুঃখ-বেদনা ইত্যাদি রীতি হয়েছে। সুখ-দুঃখ-বেদনার সাথে তার নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যেও কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নানা ধরণের সামগ্রীর উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকা যেহেতু লোকসাহিত্য তাই কাঠের তৈরি কারুশিল্প উপস্থিতি বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।

ধনদৌলতের তার নাহি কোন সীমা।
ডিঙ্গা বান্ধাইছে বাপে দিয়া যত সোনা ॥
জলটঙ্গী ঘর আছে আমার বাপের বাড়ী।
খাট পালঙ্ক আছে কত চান্দুয়া মশারী।[৫]

এই গীতিকার লাইনগুলোতে কাঠের ডিঙ্গা, খাট-পালঙ্ক, এর কথা উল্লেখ আছে যা কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সামগ্রী।

চারা গাছ পানি দিয়া আগে বড় কইরে।
বড় অইলে মিঠাফল সুখে খাইবা পরে ॥
আমার বাড়ীত যাইত্তরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা।
জলপান করিতে দিয়াম সালি ধানের চিড়া ॥[৬]

অতি পরিচিত এই পংক্তিগুলোতে গাছ লাগানোর কথা এবং অন্যদিকে গ্রামবাংলার প্রিয় কাঠের তৈরি পিঁড়ির কথা উল্লেখ আছে।

বিষ লক্ষের ছুরি কন্যার কাকলে আছিল।
তা দিয়া ডিঙ্গার কাছি কাটিয়া ফেলিল ॥
অচৈতন্য হইয়া সাধু পড়িয়াছে নায়।
কুড়াল মারিল কন্যা ডিঙ্গার তলায়।[৭]

সন্ধ্যাকারে অতিথ আইল ভিন দেশে ঘর
পাঁচ পুত্রে ডাক্যা কয় সাধু হীরধর ॥
লোটা ভইরা শীতল জল দিল খরম পানি।
পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রান্ধে পরম রাঙ্গুনি ॥[৮]

বাংলাদেশের সমাজের অতিথিদের সম্মান ও আপ্যায়ন করার আগে হাত মুখ ধোয়ার জন্য পানি ও পাদুকা দেওয়ার রীতি এখনো কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। পূর্বে কাঠের তৈরি খড়ম পাদুকা হিসেবে ব্যবহৃত হতো তার চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

কে বা যাওরে নদী দিয়া বাইয়া পানসী নাও।
কার ঘরের যুবতী নারী ধইরা লইয়া যাও ॥
কিসের লাগ্যা কান্দ কন্যা পানসীতে বসিয়া।
নৌকা হইতে মাধব তারে কয় ডাক দিয়া ॥[৯]

নদী মাতৃক দেশের চিরচেনা দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। নদী পথে নৌকাই যোগাযোগের একমাত্র উপায় এখানে ঐতিহ্যবাহী পানসী নৌকার কথা উল্লেখ আছে।

প্রভাতে উঠিয়া পুনাই কোন কাম করে।
নৌকা সাজাইতে তবে কয় জাঙ্গাইলারে ॥
জাঙ্গাইলা আনিল পান্সী ঘাটেতে লাগায়।
কন্যারে লইয়া পুনাই রাজার দেশে যায় ॥[১০]

কপাটেতে খিল দিয়া পূজায় বসিল গিয়া
চক্ষে বহে জল দর দর
বলি আজ আত্মদানে দামোদর দাসে ভণে
অশ্রুধার পূজা উপচার ॥[১১]

উত্তম কাঁঠালের পিড়ি ঘরেতে পাতিল।
ছিটা ছড়া দিয়া কন্যা পরিচ্ছন্ন কইল।[১২]

বাপের বাড়ীতে খাট পালঙ্ক আছে শীতল পাটি।
কর্ম্মদোষে আমার পাংখী শয়ান ভূঁই মাটি ॥[১৩]

উপরে উল্লেখিত গীতিকাগুলিতে কাঠের দরজা খীল দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি, খাট-পালঙ্ক, লাঠি, দাড়, নৌকা এগুলো সবকিছুই কাঠের তৈরি কারুশিল্প হিসেবে পরিচিত।

২.১.৩ ঢাকা পুরাণ

মীজানুর রহমান রচিত ÒXvKv ci‡YÓ কাঠের তৈরি কারুশিল্প বা সামগ্রীর কথা বলা হয়েছে। "বৌবাজার মানে বাইজি অলংকার ফার্নিচার ঘড়িওয়ালদের পাড়া। তো আমাদের বাসাবাড়ির নিচেই ছিল এক ফার্নিচার তৈরির দোকান।"[১৪] এদিকে চাঁদনীঘাটের নামের সঙ্গে চাঁদনী যুক্ত হওয়ার পেছনে রয়েছে "নবাব ইসলাম খাঁর এক বজরা। এ ঘাটে থাকত নবাবের বজরার বহর। বহরে ছিল চাঁদনী নামের এক বিরাট শাহীবজরা। এটা প্রমোদতরী ছিল। যদিও ফত্হে দরিয়া নামেও আরেকটি প্রমোদতরী ছিল, তথাপি জাকজমকের দিক দিয়ে বেশি আড়ম্বর পূর্ণ চাঁদনীর নামেই ঘাটের নাম ছড়িয়ে পড়ে।"[১৫] বুড়িগঙ্গার ঘাটজুড়ে চোখে পড়ত বেদেদের নৌকার বহর। আর দেখা মিলত দূরদূরান্তের যাত্রী ও মাল বহনকারী গহনা নৌকাগুলোকে নোঙর ফেলতে এই ঘাটে। গহনার মাঝিদের এ রকমের হাঁকাহাঁকি ও ডাকাডাকিতে ঘাটটা মুখর হয়ে উঠত। শুধু কি গহনা, এই ঢাকার বুকে গ্রাম থেকে আসা পালকিও দেখেছি আমি। আমাদের দেশে যেসব পালকি বাহকদের দেখা যেত, তাদের বেশির ভাগই বিহারের চাপরা ও

মোজাফ্ফরপুর থেকে আসত। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন পেশায় ধর্মজীবী। দূরদূরান্তে ধর্ম প্রচারের জন্য যাতায়াত ছিল তাদের। বাহন ছিল প্রধানত ঘোড়া। তারপরই পালকি।[১৬] 'ঢাকা-ঢিক্কি' বা 'ঢাকা-ঢক্কা' শিরনামে কবিতাটি ঢাকাকে ঘিরে অনেক তথ্যের মধ্যে কাঠের তৈরি কারুশিল্পেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঠুনকো ঠাটের 'ঠাঠারিবাজারে' ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক;
ঢাকার ঢেঁকিতে ঢাকের ঢেঁকুর ঢিঢিক্কায়েতে ঢোঁড়ে।
সং 'বংশালে' বংশের শালে বংসে সেঁধেছে শিখ।

'ঢাকের ঢেঁকু-র কথা যদি ধরি, তাহলে বাদ্যযন্ত্র ঢাকের কথাই বলা হয়েছে। ঢাকের শব্দটা তো ঢাকের ঢেঁকুরই!

এই কবিতায় আরেকটি লাইনে বাক্সের কথা উল্লেখ আছে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

'বক্সীবাজারে' বাক্সে নকশা মকশো একশোবার,[১৭]

মীজানুর রহমানের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে ঢাকার কৃষ্ণদাস মশাই জন্মাষ্টমি এর প্রবর্তক। একদিন রাতে ঘুমের মাঝে বলরামের মূর্তি দেখে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়, এটা তার উপর মূর্তি প্রতিস্থাপনের প্রত্যাদেশ হয়েছে। তিনি মূর্তি গড়ার জন্য অধীর হয়ে পড়লেন। সব সেরা মূর্তি নির্মাতার ডাক পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দেবদারু কাঠ দিয়ে তৈরি করালেন বলরামের এক কারুকার্যময় সুঠাম মূর্তি।[১৮] তিনি আরও উল্লেখ করেছেনদাড়-বেদাড়া কাঠের বাড়িগুলোর যত রাজ্যের কাঠের আড়ত। এটি যথার্থই কাঠপট্রি।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে হোলস্টারে পিস্তল গোজ টুপভুজঙ্গ কেউ। মেহগিনির চকচকে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে প্রথমে ছিমছাম পরিবেশ হংসধ্বল চাদরে মোড়া টেবিল, চারপাশে কারুকাজ করা ভিক্টোরিয়ান চেয়ার।[১৯] তার গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে দূরদূরান্তে থেকে এক সাল্লাই-দোমল্লাই নৌকো এসে ভিড়ত নারিন্দার পুলের আশেপাশে। এসব নৌকায় বেনেরা নিয়ে আসত মাটির হাঁড়ি, কলসি ও অন্যান্য তৈজসপত্র থেকে শুরু করে ফটি তথা বাঙ্গি। কাঁঠাল ও কাঠের লাকড়ি বোঝাই নৌকাও ভিড়ত। ঢাকার দৈনন্দিন চাহিদার অনেকটাই মেটাত এসব মালবোঝাই নৌকা এসে।[২০]

২.১.৪ ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি

ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতিতে ছড়াকার কাঠের চরকা নাটাই এর কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে-

চরকা দিলাম চরকি দিলাম নাটাই দিলান দানে
তবু মেয়ে ঘুণঘুনাচ্ছে চক্কোবত্তীর কানে
বাবা, বাঁক দিলে না ক্যানে ?[২১]

বাংলয় লোক ছড়ায় ঢেকির উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে দেওয়া হল ঃ

শত্ত কোহানে ?
ঢেহি ঘরে।[২২]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী গৃহে ব্যবহৃত আসবাবপত্র ছিল অত্যন্ত সাধারণ। যেমন, ঘরের মধ্যে বসবাস এবং শোবার জন্য ব্যবহার করা হত মাদুর। কখনও কখনও কাঠের চৌকিও ব্যবহার করা হত। খাবার সময় বসবার জন্য ব্যবহার করা হত পিড়ি।

ছোট কাঠের সিঙ্গি আমার ছিল ছেলেবেলায়,
সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুরুষি খেলার।[২৩]

চট্রগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নিম্নোক্ত ছড়ায় খাট ও পালঙ্কের কথা উল্লেখ করলেও তাদের বাড়িতে নেই। তাদের যে কাঠের পিঁড়ি আছে সেটার উপস্থিতি এই ছড়ায় পাওয়া যায়।

নিদ্রালি মাউরে আমার বাড়ীত আইস
খাট নাই পালঙ্ক নাই
পিড়ি দিতাম জাগা নাই
আমার মণির চোখের উপর বৈস।[২৪]

চলল পিরিতের ঢেঁকি গুসকরা
কে ধান ভানবি, আয় লো তোরা।[২৫]

ছড়ায় - চরকা ও তাঁতের বর্ণনাও রয়েছে এভাবে

চরকা আমার আশয় বিষয়,
চরকা আমার হিয়া।
চরকার দৌলতে আমার
সাত পুতের বিয়া ॥
চরকা আমার ঘুরে যে, ভন্-ভন্-ভন্
চরকা আমার বুকের লউ সাত রাজার ধন ॥

কড়ি দিয়ে কিনলাম,
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম
হাতে দিলাম মাকু,
এখন 'ভ্যা' করতো বাপু![২৬]

লোকছড়ায় পশ্চাৎ ভাগ উন্মুক্ত কাঠের পাদুকা বা খড়মের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মেয়ে হব, ঘর নিকুব, পরবো পাটের শাড়ী,
খড়খড়েতে চড়ে যাব, জমিদারের বাড়ি![২৭]

খড় খড়ে বা খড় খড়ি পাল্কী বিশেষ অবশ্যই কাঠের তৈরি এই পাল্কি[২৮]

নিম্নে উল্লেখিত লোক ছড়ায় তক্তপোষের উল্লেখ পাওয়া যায়

...তক্তপোষে ব'সে যাদু
ডুগডুগি বাজায় ।
চন্দ্র গেলেন সূর্যের বাড়ী,
বসতে দিলেন চৌকি-পিড়ি।...[২৯]

তামাক খাবার জন্য ছিল হুঁকো ও ডাবার ব্যবহার। ষোড়শ শতাব্দীতেও যে হুঁকো অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ রাজদরবারে হুকোর বহুল প্রচলন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায় ঃ "They (farmer) mitigate their hard labour by smoking in the hukkah which is also used at home." ছড়ার কথায় ...বুড়োর হুকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।[৩০]

খাদ্যশস্য ভানার জন্য ঢেঁকি ছিল প্রাচীন বঙ্গের ঘরে ঘরে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ঃ "...dheki which is a non Aryan word was their instrument for husking paddy adopted in Bengal."[৩১] একটি বাংলা লোকছড়ার ঢেঁকির বিস্তৃত চিত্র পাওয়া যায়

চলল পিরিতের ঢেঁকি গুসকরা
কে ধান ভানবি, আয় লো তারা।
যেমন ঢেঁকি, তেমনি পোয়া
মুষুলিটা তের পারা[৩২]

নানাবর্ণ নৌকা সব দেখি চারি পাশে
নব শশীগণ যেন জলে নামি ভাসে।
দশদিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়।
সুবর্ণের হংস যেন লহরী খেলায়।

রজতের বৈঠা সব শোভন নৌকার
জল সিঞ্চে স্বর্ণ পাখি পক্ষ যে রূপার
দীপ্তিমত নৌকা যেন বিজলী সঞ্চারে
মরকত স্তম্ভ সব রজতের ছা'নী
নবরঙ্গ খোপা যেন মুকুতা খেচনী।
আগে পাছে চামর দোলায় ঘন ঘন
বিবিধ পতাকা উড়ে নৌকার শোভন।
স্বর্ণ শিখি পেখমে বিচিত্র পাছা নৌকা
সুরচিত উষ্ণ অগ্র যেন দেখি শিখা।
বিশ্বকর্মা গঠন প্রায় নৌকার গঠন
পবন গমন নৌকা সমুদ্র বাহন।[৩৩]

২.১.৫ মধ্যযুগে সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

'চন্দ্রাবতী' এ দেশে-প্রচলিত প্রাচীন রূপকথা ভিত্তিক মৌলিক রচনা। তাই এই কাব্যে হিন্দু সমাজের আবহই দৃশ্যমান।

যোগী বেশঃহস্তে কাষ্ঠ মালা গলে শুধুরী বান্ধিয়া
কর্ণেত বৈরাগী মুদ্রা মুখে ভস্ম দিয়া।
হস্তে কমন্ডুলি চক্র সাথে কৃত্তি কেশ।[৩৪]

মধ্যযুগের সাহিত্য 'পদ্মাবতীতে' বাদ্যযন্ত্র কাঠের তৈরি কারুশিল্প হিসেব উল্লেখ করা হয়েছে -

মুরলী দুন্দুভি জোড়া বাজ এ পেগম কাঁড়া
ঢাক ঢোল ঘন মনোহর।
রবার দোতারা বীণ কপিলাল রুদ্রবীণ
সমন্ড বাজা এ সুললিত[৩৫]

আলাওল রচিত (১৬৭৩ খ্রিঃ), সিকান্দার নামা, রাজা-বাদশার কাহিনীতে গরিবের কুটির, মধ্যবিত্তের ভবন ও ধনীর অট্টালিকার কথা মেলে না। এখানে রাজার টঙ্গী তথা প্রাসাদের ও তার আনুষঙ্গিক যোগ্য বস্তুসামগ্রীর বর্ণনা পাই। আসবাব পত্রতো কাঠের তৈরি এছাড়াও দোলনা ও বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অধিকাংশই কাঠের তৈরি কারুশিল্প তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আসবাবপত্র ঃ খাট পাট পালঙ্ক খাইতে উপহার

দোলনা ঃ কাঞ্চনের ঢুলনি এক রতনে জড়িয়া
তাহাতে রাখিছে কন্যা বসনে বেড়িয়া।

বাদ্যযন্ত্র ঃ ১. ঢোল ধামা পিনাক সারিন্দা পাখোয়াজ।

২. পরা ভেরী মৃদঙ্গ ঝাঁঝরা করতাল
সারিন্দা রবাব বেণু বীণা সিঙ্গা বাঁশী
ঢাক ঢোল কাড়া কবিলাস অভিলাষী।
কন্দিরা মন্দিরা ধারা ডম্বুর পিনাক
তাম্বুরা জঙ্গলা বাজে শঙ্খ শিঙ্গা ঢাক।[৩৬]

লালমতি সয়ফুল মুলুক, আব্দুল হাকিম বিরচিত সতেরো শতকের কবি আব্দুল হাকিম বহুগ্রন্থ প্রণেতা এবং মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় কবি, তার লেখায় কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

বাহন ঃ চতুর্দোলে তুলিয়া কুমারে আন হেথা।
গজের আম্বারি' পরে হই আরোহণ।
গজের আম্বারী মাঝ, চলি যাএ যুবরাজ
নৃপতিহ চলিল চতুর্দোলে।
ডুলি আরোহণে চলে কোন নারীগণ।[৩৭]

বাদ্য ঃ আদেশিলা নৃপতি উৎসব মঙ্গল
বাজায় নানান বাদ্য পরম উৎসব
ঢাক ঢোল কাড়া দামা পঞ্চশব্দের রব।[৩৮]
বাদ্যযন্ত্র ঃ কাড়া ডামা ঢেলে ঢাক দ্বারে বাজে লাখে লাখ
শিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কর্ণাল
মৃদঙ্গ কর্তাল কাঁস বীণা বেণু কবিলাস
সহস্র যন্ত্রেত বাজে তাল
দোতারা রবাব বেণু শুনি পুলকিত তনু
সানাই বিগুল সুললিত
সারঙ্গী ডম্বরু চঙ্গ শুনি অতি মনোরঙ্গ
সহস্র গায়ক গায় গীত[৩৯]

নওয়াজিস বিরচিত (১৮ শতক), গুলে বকাউলি, চট্রগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত 'সুখছড়ি' গাঁয়ে তার নিবাস। তার কাব্যেও এখানে গীত-বাদ্য-নাট এ কাঠের তৈরি কারুশিল্পের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে।

হাস্যরস রাজরস বাদ্য বাজে নিত।
পতি শব্দ শুনি স্তব্ধ সুস্বর সুগীত ॥
দোতারা সেতারা কাড়া কাস করতাল।
'ঝাঞ্ঝরী মন্দিরা বাঁশি ভৈরব বর্ণাল ॥[৪০]

গোপীচাঁদের সন্ন্যাস (১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত) শুকুর মাহমুদ বিরচিত এ কাব্যে যোগতত্ত্বের সঙ্গে অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পার্বনিক আচার-আচরণের এবং রীতি-পদ্ধতির কথাও রয়েছে। এর মধ্যে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উল্লেখ আছে

পানি আনে কাষ্ঠ কাঠে গৃহে দে এ ছড়া।
ভক্ষণ করিতে পাএ একপোয়া চিড়া ॥[৪১]

২.১.৬ খনার বচন

খনার জীবনের কথা যা জানা যায় তার প্রায় পুরোটাই কিংবদন্তি। তার রচিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক শ্লোকগুলো যেমন নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে আজ প্রবাদ বাক্যের মতো ছড়িয়ে আছে লোকের মুখে মুখে, তেমনি প্রচলিত আছে তার বিস্ময়কল জীবন নিয়ে হাজারো গল্পকাহিনীও। তার জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী মানুষের মনে এমন করে গেথে আছে। খনার বচনে বিষয় বস্তুর বিস্তৃতি ব্যাপক। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশাল অংশ জুড়ে আছে খনার পদচারণা। আকাশতত্ত্ব, কৃষি বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, তথা বিবাহ অনুষ্ঠান, সন্তান ধারণ, ঘর সংসার, যাত্রা অযাত্রা, মৃত্যু রহস্য ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে রচনা করে গেছেন শ্লোক। এইসব শ্লোকে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উল্লেখ রয়েছে।

শূণ্য কলসী, শুকনো না (নৌকা)।
শুকনো ডালে ডাকে কা ॥[৪২]

যাত্রা কালে যদি কেউ শূণ্য কলসি, শুকনো নৌকা, শুকনো গাছের ডালে বসে কাককে ডাকতে দেখে তাহল অশুভ তখন যাত্রা করতে নেই।

লাঙ্গলে না খুঁড়লে মাটি।
মইনা দিলে পরি পাটি।
ফসল হয় না কান্না কাটি ॥[৪৩]

লাঙ্গল দিয়ে জমি খুব উত্তম রূপে চাষ করতে হয়। তারপরে মই দিয়ে জমি পরিপাটি করতে হয়। নইলে ফসল হয় না কান্নাকাটি সার।

২.২ ধর্মশাস্ত্র

ম্যাক্সমুলার বলেন 'আর্য' বা-আর্য' কৃষি ব্যবসায়ী। সামান্য চাষা অর্থাৎ কৃষিরত প্রাচীন এই নরগোষ্ঠী নিজেদের আর্য বলতেন।[৪৪] তারা যজ্ঞ করতেন এটিই তাদের জীবন কর্মের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। আর্য জাতির ব্যবহৃত ভাষা, যে ভাষায় ঋগ্বেদ রচিত হয়েছে। ঋগ্বেদের ঋকগুলি বহুদিন ধরে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। পঠিত ও রক্তিত এই কাব্য অনেক পরে সংহিতা আকারে সঞ্চলিত হয়েছে।

ঋগ্বেদে নানা শৌখিন ও প্রয়োজনীয় বেসাতি নিয়ে ধনলাভেচ্ছু বণিকরা শত দাঁড়যুক্ত নৌকা ভাসিয়ে বিপদ অগ্রাহ্য করে নানা অজ্ঞাত দেশে যাতায়াতে ভীত ছিল না।[৪৫] ভূজ্যুর নৌকা ভেঙ্গে গেলে অশ্বিদ্বয় সুগঠিত নৌকায় তাদের পার করেন। তাদের নৌকা ছিল শত দাঁড়যুক্ত। এই দ্বীপ কোথায় তা অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু সমুদ্র উপকূল থেকে ভূজ্যুর পিতৃগৃহ ছিল অনেক দূরে। সেখান থেকে অশ্বিদের তিনখানি শত চক্রবিশিষ্ট রথ তিন দিন তিন রাত্রি ধরে আর্দ্র সমুদ্যের জলশূন্য পারে চলিয়াছিল।[৪৬] "রথগুলি কাঠের তৈরি আর গোচর্মের আচ্ছাদনে ঢাকা সোনার কারুকার্যে সাজানো।"[৪৭]

রথের ব্যবহার ব্যাপকভাবেই ছিল। সাধারণ লোকও রথে যাতায়ত করত, কেবল রাজা নয়। ভূগুরা রথ তৈরি করতেন। রথ খাদির কাঠের তৈরি এবং গরুর চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকত।[৪৮] "বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্তত সঞ্চালিত হয় তখন আমার বড়ই আনন্দ জন্মে।" সোমের চেয়েও বিভিতক কাঠের তৈরি অক্ষ ঋষির প্রিয়।[৪৯] জৈন শাস্ত্র মতে, ঋষভদেব (মনুষ্যদের প্রথম নৃপতি) মনুষ্যদের প্রথম গৃহ নির্মাণ, মৃৎপাত্র নির্মাণ এবং চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা দেন।[৫০]

বশিষ্ঠ-বংশীয়রা সমুদ্র ভ্রমণের শোভা সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন, "যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দর রূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম জলের উপর দোলনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ (দোলায়) সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।"[৫১]

রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" তে উল্লেখ করেছেন যে আর্য সমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়েছিল ভাষ্যকর ব্যাস সেগুলিকে ব্যাস দ্বৈপায়ণ একত্রিত করেন। মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের কথাও উল্লেখ আছে। বিখ্যাত যোদ্ধারা রথে চড়ে যুদ্ধ করতেন। এই রথ কাষ্ঠ নির্মিত এতে চার ঘোড়া জোতা হত। ধ্বজদন্ড রথের ভিতর থেকে উঠত আরোহিত রথী আহত হলে ধ্বজদন্ড ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতেন। অর্জুন ও কর্ণের রথ শব্দহীন বলে বর্ণিত হয়েছে।[৫২]

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষের রাজাদের অনেক ধরণের ছাতা ছিল, এবং কার্যবিশেষে তা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হত। এই সকল ছাতার উপাদান ও উপাদানের রঙ ভিন্ন প্রকার হবার রীতি ছিল।

বিশুদ্ধকাষ্ঠস্য তু দন্ডকন্দৌ তথা শলাকা অপি শুদ্ধবংশজাঃ।
রজ্জুশ্চ রক্তা বসনঞ্চ রক্তং ছত্রং প্রসাদং নৃপতেবদন্তি ॥

"রাজাদিগের 'প্রসাদচিহ্ন' ছত্রে বিশুদ্ধ বাঁশের শলাকা ও বিশুদ্ধ কাঠের দন্ড ব্যবহৃত হইত, এই ছাতার রজ্জু ও বস্ত্র রক্তবর্ণ হইবার নিয়ম ছিল ॥"[৫৩]

চান্দনৌ দন্ড-কন্দৌ চেৎ সুশুক্লে রজ্জু-বাসসী।
ছত্রং মনোহরং রাজ্ঞাং স্বর্ণকুন্তেন শোভিতম ॥

"রাজাদিগের এক প্রকার মনোরম ছত্রে চন্দনকাষ্ঠের দন্ড ও কন্দের ব্যবহার ছিল; তাহার রজ্জু ও বস্ত্র শুক্লবর্ণ হইত, এবং সেই ছাতার উপরি-ভাগে স্বর্ণকুন্ত সংযুক্ত হইত।"[৫৪]

শাস্ত্রে সাধারণত: চারজন বাহকের দ্বারা বহনীয় যান চতুর্দোল নামে পরিচিত। কিন্তু ভোজদেব বলেন, যে যান চারজন বাহকের দ্বারা বহনীয় অথচ দন্ড অর্থাৎ ডাঁট চারটি, থাম আটটি, যাতে ছয়টি কুন্ত সুন্দররূপে সংস্থাপিত হয়ে থাকে, তা অতুৎকৃষ্ট চতুর্দোল বলে ধরে নেয়া হয়।

রাজ্ঞোযদ্দিপদ যানং বিশেষ্যখ্যমলং (মিদং) বিদুঃ ॥
চতুর্ভিরুহাতে যত্তু চতুর্দোলং তদুচ্যতে ॥

"যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে 'চতুর্দোল' যানের বিশেষ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। এটা রাজভোগ্য নিরতিশয় মূল্যবান যান বলিয়া কথিত হয়েছে।"[৫৫]

অনন্তর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গী লোক নৌকায় বসিবে, তখন তুমি বলিও, "সেই আল্লাহরই প্রশংসা; যিনি আমাদিগকে অত্যাচারী দল হইতে উদ্ধার করিলেন ২৮।[৫৬] এবং তাহাদের জন্য নিদর্শন এই যে, আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে নৌকাতে পূর্ণ করিয়া উঠাইয়া ছিলাম। ৪১।[৫৭]

কারণ তাহাদের বাণিজ্য-দ্রব্য কেহ আর ক্রয় করে না। এই সকল বাণিজ্য-দ্রব্য স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য মণি, মুক্তা, বেগুনিয়া বস্ত্র, পট্ট বস্ত্র, সিন্দুরবর্ণ বস্ত্র, সর্বপ্রকার চন্দন কাষ্ঠ হস্তিদন্ডের সর্বপ্রকার পাত্র, বহুমূল্য কাষ্ঠের ও পিত্তলের, লৌহের ও মর্ম্মরের সর্বপ্রকার পাত্র[৫৮] কিন্তু কোন বৃহৎ বাটীতে কেবল স্বর্ণের ও রৌপের পাত্র নয়, কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার পাত্রও থাকে।[৫৯]

২.৩ ইতিহাস

মানুষের জানা মাধ্যমগুলোর মধ্যে কাঠ সবচেয়ে প্রাচীন। আর কাঠ খোদাইয়ের মাধ্যমে কারুকার্য করাও অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। বিভিন্ন অপরিণত হাতিয়ার ও সরঞ্জামাদির গায়ে অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে শুরু হওয়া এ কারুকার্য বর্তমান সময়ের কারুশিল্পীদের হাতে এসে আধুনিক আকার ও আঙ্গিক লাভ করেছে। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ম্যাক্সিকো ও পলিনেশিয়ার আদিম কারুশিল্পীরা উপাসনার অংশ হিসেবে কবচ ও মুখোশ খোদাই করেছে, যা শত শত বছর ধরে অপরিবর্তিত আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিকারী মানুষের কাছে পাথরের অস্ত্র ছিল একমাত্র প্রধান অস্ত্র। এর পাশাপাশি গছের ডালকে সে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার শুরু করে। তখন থেকেই কাঠের তৈরি কারুশিল্পের যাত্রা শুরু। কাঠ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে মানুষের জীবনের সাথে জড়িয়ে যায়। এরপর বর্শার দন্ড বা হার্পূন তৈরিতে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। "নতুন পাথর যুগের শেষ দিকে এসে লাঙ্গল তৈরিতে কাঠের গুরুত্ব বেড়ে যেতে থাকে। সভ্যতার যুগে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহে কাঠের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পায়।"[৬০]

প্রায় ৫০০০ বছর আগে থেকেই মানুষ কাঠের উপর নির্ভরশীল এবং কাঠ খোদাই প্রাচীন হস্তশিল্পগুলির একটি। কাঠ ও কাঠের তৈরি কারুশিল্প মানুষের সাথে প্রকৃতির এক সেতুবন্ধক। হেন কাজ নেই দোলনা থেকে শবযাত্রা সর্বত্রই কাঠের তৈরি কারুশিল্প মানুষের সঙ্গী। কাঠ বা কাঠের তৈরি কারুশিল্প পচনশীল হওয়ায় এর ব্যবহার করে কখন কোথায় শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে অনুমান করা যায় যে প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে কাঠের ব্যবহার শুরু হয়েছিল।[৬১]

শিল্প সৃষ্টির অনুষঙ্গে বলা যায়, শিল্পের প্রয়োজনে নান্দনিক চেতনা প্রবাহ থেকে আদিম মানুষ শিল্প সৃষ্টি করেনি। জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন বাধা অতিক্রমের অভিজ্ঞতা থেকে এবং জীবনের প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছে শিল্প ও শিল্পের বিভিন্ন প্রকরণ। উল্লেখ্য, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয়তা আদিম মানুষের কাছে প্রথম অনুভূত হয়েছে, তার ফলশ্রুতিতে প্রাচীন প্রস্তর যুগের শুরু থেকেই কাঠের দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার ও শৈল্পিক নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্লেইস্টোসিন পর্বের মাঝামাঝি সময়কালে ইংল্যান্ডে ক্ল্যাকটন-অন-সি তে মধ্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে কাঠের তৈরি বর্শা ফলক পাওয়া গেছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে কাঠের তৈরি তীরফলক, বর্শাফলক, ধনুক, মুগুর, তীরের আধার, ভেলা, ডিঙ্গিনৌকা, ঘর-বাড়ি প্রমাণ পাওয়া গেছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরে কাঠের শৈল্পিক নিদর্শনগুলোর পরিচয় পাওয়া যায়।[৬২]

কাঠের হাতিয়ার যে মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে কাঠের তৈরি প্রথম কারুশিল্প তা প্রমাণিত। তাইতো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে এই কারুশিল্প পাওয়া যায়। আফ্রিকায় প্লেইস্টোসিন পর্বের শেষের দিকে সানগোয়ান ও লুপেমবান সংস্কৃতিতে কাঠের নিদর্শন গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও জাম্বিয়াতে মধ্য ও শেষ পাথরের যুগের কাঠে তৈরি তীর, ধনুক, খননযোগ্য হাতিয়ার, বর্শা, খুঁটি ও গোঁজ আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্য প্রস্তর যুগের আটেরিয়ান সংস্কৃতিতে দুই দিকে ধারালো হাল্কা ও ছোট আকৃতির নিক্ষেপণযোগ্য কাঠের বর্শা পাওয়া গেছে। ফ্লোরিসবাদেও নিক্ষেপণযোগ্য কাঠের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। কালামবো ফলসে

অ্যাশিউলিয়ান হাতিয়ারের সঙ্গে মুগুর জাতীয় কাঠের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক দিকে আগুনে পুড়িয়ে তীক্ষ্ণ করা এবং গর্ত খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত হাতিয়ার অন্যতম।[৬৩]

মধ্য প্রস্তর যুগে উন্নত ধরনের কুঠার, অ্যাজ, বড় ধরনের চিজেল প্রভৃতির সুবিধাজনক কার্যকারিতার কারণে কাঠের কাজ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মধ্য প্রস্তর যুগেই কাঠ ব্যবহার করে গৃহনির্মাণ শুরু হয়। এসময়ই মানুষ কাঠে খাঁজ কেটে জোড়া লাগানোর নতুন পদ্ধতি (Tenon & Mortise) আবিষ্কার করে। পাইন দিয়ে তীর, দেবদারু ও ইউ দিয়ে তীর ধারক, ফলক ও হ্যাজেল দিয়ে বর্শা তৈরি করতো ॥ এছাড়া বার্চের বাকল দিয়ে ঘরের ছাদ, পিচের বাকল দিয়ে কন্টেইনার, পাইনের বাকল দিয়ে জালের কাঠি তৈরি করত।

নিওলিথিক বা নব্যপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন ধরনের কাঠের হাতিয়ার পাওয়া যায় যেমন- তীর, ধনুক, বর্শা বিভিন্ন রকম ফাঁদ ও কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র প্রভৃতি পাওয়া গেছে। কেনিয়ার জোরো গুহায় প্রাপ্ত খোদইকৃত কাঠের পাত্রটি আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাওয়া গেছে। বড় কাঠের গুড়ি কেটে তৈরি করা নৌকা এ সময়েরই আবিষ্কার।[৬৪]

মেসোপটেমিয়ার উর এর রাজকীয় সমাধি থেকে আনুমানিক ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের, বাদ্যযন্ত্র, কাঠের পাত্র এবং হাতিয়ারের হাতল পাওয়া গেছে। আর্মেনিয়ার কারমির অঞ্চল থেকে খ্রিস্টপূর্ব সাত শতকের ইনলে অলঙ্করণ খচিত কাঠের পাত্র পাওয়া গেছে। একই ধরনের কাঠের নিদর্শন আনাতোলিয়া ও জেরিকোতেও পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।[৬৫]

প্রাচীন মিসরীয়রা পিরামিড নির্মাণের সময় বড় পাথরের টুকরো ভেঙ্গে ফেলার জন্য পাথরের মাঝখানে একটি ছোট্ট ছিদ্র তৈরি করে নিয়ে ছিদ্রের মধ্যে এক টুকরো শুকনো কাঠ ঢুকিয়ে পানি ঢালতে শুরু করতো। যখন শুকনো কাঠ পানি গ্রহণ করে আয়তনে প্রসারিত হতো তখন কাঠের প্রসারণের চাপে বড় পাথরের টুকরো ফেটে খন্ড বিখন্ড হয়ে যেত।[৬৬] প্রাচীন মিসরেও খোদাই করা কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ধর্মীয় ভূমিকা রয়েছে এবং পুতুল ও মন্দিরের মূর্তি নির্মাণে কাঠ ব্যবহৃত হতো। পাশপাশি আলঙ্কারিক কারণে আসবাবপত্রে ও ছাদেও এটি ব্যবহৃত হতো। প্রাথমিক অবস্থার মিশরে সম্ভবত প্রথম কাঠের আসবাবপত্রের আবির্ভাব ঘটে। এছাড়া "৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই হাতির দাঁত (গজদন্ত) ও সোনার সঙ্গে খোদাইকৃত কাঠও ব্যবহার করা হতো। আর রোমানরা আসবাব, নৌকা ও রথে বিস্তৃত পরিসরে অলঙ্করণের কাজে এটি ব্যবহার করতো।"[৬৭]

হরপ্প-মহোঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সীলমোহরে উৎকীর্ণ নানা ধরণের কাজ এবং সেই সাথে জীবজন্তুর মূর্তি খোদিত কাঠের আসবাব দরজার কপাট প্রভৃতি থেকে অনুমান করা হয় যে ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে কাঠের কারুশিল্প তৈরি হত। রামায়ণ-মহাভারতেও কারুশিল্পীদের অলঙ্কৃত গৃহদ্বার, রথ, সিংহাসন ইত্যাদি তৈরির প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির অন্যতম সেরা অবদান হচ্ছে শিল্পকলা। পরে পাথর, হাড়, হাতির দাঁত এবং কাঠের হাতিয়ার ইত্যাদি শিল্পকলা গুলোতে নান্দনিকতা বা শিল্পরূপ যোগ করা হয়েছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু সামগ্রীতে শৈল্পিক নিদর্শন পরিস্ফুটনের জন্য সময়ে কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের অলংকরণ বা নকশা শুরু হয়। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই কাঠ সামগ্রী এবং তার পরবর্তী সময় থেকে কাঠের কারুশিল্প তৈরি হয়ে আসছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্প হলো কাঠের তৈরি ব্যবহারিক জিনিসের শিল্পিত রূপায়ণ। কাঠের তৈরি কারুশিল্প ব্যবহারিক দিক দিয়ে আমাদের মনে সৌন্দর্যবোধের সঞ্চার করে। সময়ের পরিবর্তনের ধারায় যুগে-যুগে কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিষয় ও বৈচিত্র্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

কাঠের তৈরি কারুশিল্প বাঙ্গালী জাতির ঐতিহ্যবাহী শিল্প মাধ্যম। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সময়ের পরিবর্তনের সূত্র ধরে কাঠের তৈরি কারুশিল্প পরিণত রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্প কবে থেকে শুরু হয় সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়নি। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, ময়নামতি, মহাস্থানগড়, কান্তজিরমন্দির ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খননের ফলে যে কারুশিল্প পাওয়া গেছে সেগুলো মাটির, কাঠের নয়। উত্তর রোড়েশিয়ার কালাম্বো জলপ্রপাতে কাঠের ছড়ি, যা সম্ভবত খননকাজে ব্যবহৃত হতো এবং লাঠি পাওয়া গেছে। যার বয়স রেডিওকার্বন পদ্ধতিতে ৫৭,০০০ বছর নির্ধারি হয়েছে।[৬৮]

উল্লেখ আছে, "এছাড়াও 'শিল্পশাস্ত্র', 'বৃহৎসংহিতা' ও 'মনুসংহিতা' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কাঠ ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।"[৬৯]

"সাধারণ লোকেরা বোধ হয় কোনও চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না, যদিও কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি ও পিতৃদায়িত গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষে কাষ্ঠ এবং চর্মপাদুকা উভয়ের ব্যবহারেরই ইঙ্গিত বর্তমান। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের মধ্যেও কাষ্ঠপাদুকার চলন খুব বেশি ছিল।"[৭০]

মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় এ অঞ্চরে স্থাপত্যে কাঠের ব্যাপক ব্যবহারের উল্লেখ আছে। প্রাচীনকাল থেকে এই বাংলার অঞ্চলে পাথর বা ধাতুর চেয়ে সহজ লভ্য ছিল কাঠ।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে কাঠের কারুশিল্প তৈরিতে বিভিন্ন কাঠের ব্যবহার সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নীতি নির্দেশের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে বৃক্ষায়ুবেদোক্ত চার প্রকার বৃক্ষের কাঠ নৌকার উপাদান উল্লেখ রয়েছে। চার প্রকার কাঠ যথাক্রমে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চার শ্রেণিতে বিভক্ত। তারমধ্যে যে কাঠ লঘু, কোমল ও সুঘট (যাহা সহজে অন্যের সহিত জোড়া লাগে) তা ব্রাক্ষণ জাতি। যাহা দৃঢ়, লঘু ও অঘট (সহজে জোড়া মিলে না) তা ক্ষত্রিয় জাতি। যা কোমল অথচ গুরু তা বৈশ্য জাতি এবং যা দৃঢ় ও গুরু তা শুদ্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। বিভিন্নজাতি কাঠের তৈরি নৌকা সুখকর এবং মঙ্গলদায়রা ছিল না বা হয় না। নির্মিত এমন নৌকা জলে ডুবে যেতে পারে এবং অল্পদিনের মধ্যে ভেঙ্গে যায়।[৭১] শোনা যায় ইটালির শিল্পীরা ভারতবর্ষ থেকে সেগুন তক্তা সংগ্রহ করতেন।[৭২] বিচারিক কাজের জন্য যুগ যুগ ধরে আদালতে বিচারকের নিয়ন্ত্রণ দন্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেটি যে কাঠের তৈরি কারুশিল্প।[৭৩]

প্রাচীনকাল থেকে আমাদের শিল্পীরা নান্দনিক শিল্পকর্ম তৈরির মাধ্যমে এদেশের কারু ঐতিহ্যের মাধ্যমে সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। কারুশিল্প আমাদের ঐতিহ্য। কারুশিল্পীদের কাঠের তৈরি কারুপণ্যের শিল্প নৈপূণ্য ও সৌন্দর্য চেতনা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে। এমন শিল্পকে বংশ পরম্পরায় বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের কারুশিল্পীরা। তাইতো কলকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিস্তৃতির এইসময়েও আমাদের কারুশিল্প টিকে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), PhvMxwZKv, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ঃ বাংলাবাজার, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ পৃ. ১৭৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪
৫. শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর (সঙ্কলিত), ‰gqbxmsn-MxwZKv, ঢাকা ঃ গতিধারা, ২০০০, পৃ. ৩৪৩
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০
১৪. মীজানুর রহমান, XvKv civY, ঢাকা ঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩,পৃ. ২০
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪
২১. সৈয়দ মোহম্মদ শাহেদ, Qovq evOvjx mgvR I ms¯‹vZ, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ১৭৪
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩
২৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত, AvÂwjK fvlvq Awfavb, ১ম খন্ড, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ১১৮
২৯. সৈয়দ মোহম্মদ শাহেদ, Qovq evOvjx mgvR I ms¯‹vZ, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ২০১
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭
৩২. প্রাগুক্ত
৩৩. আহমদ শরীফ, ga¨h‡Mi mwnZ¨ mgvR I ms¯‹vZi i‡c, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ২৪৪
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫
৪২. ভবেশ রায়, Lbvi ePb, ঢাকা ঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৫, পৃ. ৩৬
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৪৪. মৈত্রেয়ী দেবী, F‡M‡‘i †‘eZv I gvbl, কলকাতা ঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৯, পৃ. ১৪
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৫০. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, wPÎKjv, কলকাতা ঃ কাঞ্চন চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৮৪, পৃ. ৩৯-৪০

৫১. মৈত্রেয়ী দেবী, F‡M‡'i †'eZv I gvbl, কলকাতা ঃ উজ্জল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৯, পৃ. ৭৯

৫২. রাজশেখর বসু, Kò‰Øcvqb e¨vm KZ gnvfviZ, কলকাতা ঃ এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

৫৩. গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, cvPxb wkí-cwiPq, কলিকাতা ঃ সুবর্ণরেখা, ১৩৭৯ বাং, পৃ. ৫০

৫৪. প্রাগুক্ত

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৫৬. গিরিশিচন্দ্র সেন (অনুবাদিত), e½vbev' †KviAvb kixd, ঢাকা ঃ সালমা বুক ডিপো, ২০১১, পৃ. ৩৫১

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪

৫৮. evsjv wbD †U÷v‡g›U (bZb wbqg), ঢাকা ঃ দি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, পৃ. ৪৩৭

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

৬০. সানাউল হক, evsjv‡'‡ki Kv‡Vi wkíKg, ঢাকা ঃ দিব্য প্রকাশ ২০০৩, পৃ. ১১

৬১. জিনাত মাহরুখ বানু, evsjv‡'‡ki 'viæwkí, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ. ভূমিকা

৬২. সানাউল হক, evsjv‡'‡ki Kv‡Vi wkíKg, ঢাকা ঃ দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ১৬

৬৩. প্রাগুক্ত

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

৬৬. অরুণ কুমার লাহিড়ী, KvV msiÿY weÁvb, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৭৮

৬৭. Stain Smith And Professor H.F. Ten Holt (Consultant Editors), The Artists manual Equipment, materials, Techniques, New York : An Imprint of W.H. Smith Publishers Inc. 1988, PP. 106.

৬৮. জিনাত মাহরুখ বানু, evsjv‡'‡ki 'viæwkí, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ. ভূমিকা

৬৯. তারাপদ সাঁতরা, evsjvi Kv‡Vi KvR, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ঃ সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ২০০৩, পৃ. ১

৭০. নীহাররঞ্জন রায়, ev½vjxi BwZnvm Aw'ce, কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪২০ বাং, পৃ. ৪৬০

৭১. গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, cvPxb wkí-cwiPq, কলকাতা ঃ সুবর্ণরেখা, ১৩৭৯ বাং, পৃ. ১৫৯

৭২. নন্দলাল বসু, wkíPPv, কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১৪ বাং, পৃষ্ঠা ৪৭

৭৩. এ কে এম শাহনাওয়াজ, Avgvi evsjv‡'k ga¨hM, ঢাকা ঃ চন্দ্রাবতী একাডেমী, ২০১৬, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩. বাংলাদেশের জাদুঘরসমূহে সংরক্ষিত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নিদর্শন

৩.১ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

নিদর্শন - পালকি
সংগ্রহ সংখ্যা - জ - ৮০.৩৭৫

মাধ্যম - কাঠ ও দড়ি, আঙ্গিক - রিলিফ কাজ, মাপ - দৈর্ঘ ৩মি. ৬২ সে.মি, প্রস্থ ৮১ সে.মি, উচ্চতা ১মি. ১৬সে.মি. নির্মাণকাল - বিংশ শতকের প্রথম ভাগ, প্রাপ্তিস্থান - রাজৈর, ফরিদপুর, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

পালকি যোগাযোগের একটি বাহন। এখানে নবদম্পতির বিশেষ বাহন। পালকিটি দৃষ্টিনন্দন ও সৌন্দর্য্য মন্ডিত। ঐতিহ্য অনুসন্ধানে এই পালকির ভূমিকা অনেক। পালকিটির গায়ে নকশা চয়নে বাংলার লোকায়িত শিল্প বৈশিষ্ট প্রয়োগ করা হয়েছে। কারুকাজ মন্ডিত গ্রাম বাংলার সূত্রধরদের হাতে রিলিফ অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। পালকির দুইপাশে দুটি উড়ন্ত ময়ুর পাখা ঠোটের কাজে সুক্ষ্মতা আছে। ছাদের দুইপাশে দুটি ডানাওয়ালা পরিমূর্তি পাখা মেলে উড়ে যাবে। ভাস্কর্য স্বরুপ এই পরিমূর্তির কারুময়তা কাঠের তৈরি কারুশিল্পের অন্যান্য উপহার।

নিদর্শন - সিন্দুক
সংগ্রহ সংখ্যা - জ - ৭৭.২০৬৯

মাধ্যম - সেগুন কাঠ, আঙ্গিক - রিলিফ ওয়ার্ক, মাপ - দৈর্ঘ ১মি. ৯৩ সে.মি, প্রস্থ ১মি, ১৭সে.মি, উচ্চতা ১মি. ১৪সে.মি. নির্মাণকাল - উনিশ শতকের, প্রাপ্তিস্থান - গোপালগঞ্জ, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

সিন্দুকটি দেখতে খুবই সুন্দর। এই সুন্দর নকশা বহুল সিন্দুক কাঠের তৈরি কারুশিল্পী বা সূত্রধরের অনুপম সৃষ্টি। এর সম্মূখভাগে রয়েছে চারটি আর্চ আকৃতি প্যানেল। প্রতিটি প্যানেলেই নিচের বর্গাকৃতি অংশটি ছোট ছোট কাঠের উচু বিট দিয়ে দাবার ঘরের মত সমান মাপের ষোলটি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত। সিন্দুকটির সম্মুখভাগের বাম দিক থেকে প্রথম আর্চ নকশার ভিতরে দুইটি টিয়া পাখি তাদের মাঝের অংশে ফুটন্ত পদ্ম। অর্ধ গোলাকৃতি আর্চ নকশার জোড়া টিয়া অতিপরিচিত লোকায়ত ফর্ম যা ঘরে রাখলে দাম্পত্য সুখ বাড়ে। দ্বিতীয় আর্চ নকশার ভিতরে লাফিয়ে চলা ঘোড়ার রিলিফ ওয়ার্ক যা গতির প্রতিক হিসেবে

চিহ্নিত। ঘোড়ার পরে অর্ধ গোলাকৃতি আর্চের ভিতরে রয়েছে বাঘের খোদাই। লোকজ ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাঘতো শক্তির প্রতিক। একদম শেষে অর্থাৎ চতুর্থ আর্চ নকশায় হাতির নকশা খোদিত হয়েছে। হাতিটি চলমান কোথাও থেকে বের হয়ে আসছে। হাতি বুদ্ধি ও শক্তির প্রতিক। সিন্দুককে ঘিরে এই প্রতিকি রূপায়ণগুলি তাৎপর্যপূর্ণ।

এছাড়াও এতে রয়েছে দশ দল এবং এগারো দল বিশিষ্ট অর্ধ পদ্ম নকশা। বিকশিত পদ্ম-ফুল-লতা-পাতা, তরঙ্গায়িত লতা সমূহ, সিন্দুকটি ছয়টি পায়া রয়েছে। চতুষ্কোণ পায়ার উপরিভাগে অর্ধবিকশিত পদ্মের কলি নকশায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সিন্দুকের উপরের অংশে কাঠ কুন্দিয়ে পদ্ম কলি সদৃশ চার কোনায় চারটি কলি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তরঙ্গায়িত লতার মধ্যে বিদেশী প্রভাব থাকলেও বাংলার নিজস্ব শৈলী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই সিন্দুকটির খোদাইকাজের সুক্ষ্মতার সাথে ছন্দোময়তাও রয়েছে, যা আমাদের দেশীয় নিজস্ব শিল্পশৈলী। যা আমাদের ঐতিহ্য।

নিদর্শন - নারকেল কুরানি
সংগ্রহ সংখ্যা - জ - ৭৭.১৩৩৩

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - ত্রিমাত্রিক রিলিফ কাজ, মাপ - দৈর্ঘ ৮৯মি. থালার ব্যাস ৩৬সে.মি. নির্মাণকাল - উনিশ শতকের শেষ ভাগে, প্রাপ্তিস্থান - ঢাকা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

নারকেল কুরানি বাংলাদেশের ঐতিহ্য। ঐতিহ্যবাহী কাঠের তৈরি এই কারুশিল্পের আকার, আকৃতি সবকিছুতে ভারসাম্যপূর্ণ নকশা করা। নারকেল কুরানি স্ট্যান্ডটির নকশায় সর্বপ্রথমে হনুমান দেখা যায়। হনুমানটি সিংহের ঘাড়ের উপর বসে আসে এবং সাপের লেজ ধরে আছে। সিংহটি তার গায়ে প্যাচানো সাপটিকে আক্রমণ করছে। সিংহের নিচে মকর স্থাপন করা আছে। এই মকর কারুঐতিহ্যের চিরচেনা রূপ। মকরটির মুখে একটি মাছ ধরে আছে। কুরানির নিচে ফুল সদৃশ থালা বৌদ্ধের পদ্ম আসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। থালার কিনারে পদ্মের পাপড়ি এবং মাঝে ফুল লো-রিলিফে খোদিত। সুন্দর গড়ণের বসার স্থানে লতা-পাতা লো রিলিফে নকশা খোদিত হয়েছে।

নিদর্শন - প্রসাধনী বাক্স
সংগ্রহ সংখ্যা - জ - ৭০৭

মাধ্যম - চন্দন কাঠ, আঙ্গিক - রিলিফ কাজ ও জালিকাজসমৃদ্ধ, মাপ - দৈর্ঘ ২৭সে.মি, প্রস্থ ১৭সে.মি, উচ্চতা ৯সে.মি. নির্মাণকাল - উনিশ শতকের প্রথম ভাগ, প্রাপ্তিস্থান - বলধা জমিদার বাড়ি, ঢাকা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
প্রসাধনী বাক্স হলো অলংকার এবং নিজেদের সাজবার মূল্যবান উপকরণ রাখার পাত্র। এটি কাঠের তৈরি অতি সূক্ষ্ম রিলিফের। এতে তরঙ্গায়িত ফুল, লতা, পাতা ও জ্যামিতিক নকশার খোদাই অলঙ্করণে সমৃদ্ধ।

ঢাকনার উপরের অংশের কারুকাজ খুবই সূক্ষ্ম। ঢাকনার মধ্যবর্তীস্থলে সূক্ষ্ম জালিকাজের তরঙ্গায়িত লতা-পাতার নকশা খোদিত। নকশাগুলো একে অপরকে পরস্পর বেধে রেখেছে। এ জাতীয় নকশা বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পে সচরাচর দেখা যায়। ঢাকনাটির উপরিভাগে সাতটি বর্ডার নকশা লক্ষ্য করা যায়।

তথ্য অনুসারে প্রসাধনী বাক্সটি ভারতের কাশ্মিরে তৈরি। তবে বাংলাদেশে এমন কাজ খাট, পালাঙ্ক, পার্টিশন এমনকি চেয়ারে দেখা যায়।

নিদর্শন - সারিন্দা
সংগ্রহ সংখ্যা - জ - ৭৮.১৩৮২

মাধ্যম - কাঠ ও টিনের পাত, আঙ্গিক - হাই রিলিফ কাজ, মাপ - উচ্চতা ৮৯সে.মি., নির্মাণকাল - বিংশ শতকের প্রথম ভাগ, প্রাপ্তিস্থান - ঢাকা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

সারিন্দা বাংলাদেশের লোকবাদ্যযন্ত্রের কারুময় উপস্থাপনা। এর ঐতিহ্য আছে। ঐতিহ্যবাহী এই সারিন্দার খোলের গায়ে নকশা খোদিত নেই। তবে খোলটার গড়ণ বা ফর্মটা খুবই সুন্দর। সারিন্দার শীর্ষে মানুষের মুখ মন্ডলের উপর একটি হাতি। হাতির উপরে একটি সিংহ সামনের পা দিযে হাতিসুর ধরে মুখে পুড়েছে। লেজটি মাথার সাথে পরস্পর আবদ্ধ হওয়ায় এর ত্রিমাত্রিক নকশা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশের লোকায়ত এ ধরনের নকশা নৌকার গলুই-এ দেখা যায়। এতে মালিকের নাম ‘মছর আলী’ উৎকীর্ণ রয়েছে।

নিদর্শন - সরোজ
সংগ্রহ সংখ্যা - জ - ৭৮.১৩৪২

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - হাই রিলিফ কাজ, মাপ - উচ্চতা ১৪সে.মি. নির্মাণকাল - বিংশ শতকের প্রথম ভাগ, প্রাপ্তিস্থান - গোপালগঞ্জ, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

সরোজের শীর্ষে একটি ময়ুর সুন্দর ভাবে রিলিফ করা। ময়ুরের পাখায় লো রিলিফ করে পালকের নকশা করা। ময়ুরের মসৃণতা লক্ষ্য করা যায়। ময়ুরের গঠনভঙ্গিমায় লোকজ শিল্পশৈলীর প্রভাব রয়েছে। কাঠের তৈরি এই কারুশিল্পে নকশা বা অলঙ্করণে কারুশিল্পীর নিজস্বতা রয়েছে। সরোজের কাঠের খোলে লো রিলিফে পদ্ম ও ফুল-লতা-পাতার নকশা উৎকীর্ণ রয়েছে। অলঙ্করণে ছন্দোময়তাও রয়েছে। কাঠে গালা স্পিরিটে বার্নিশ করা। ময়ুরের বুকে ‘আমূল্য’ নামটি লেখা রয়েছে।

নিদর্শন - মিষ্টির ছাঁচ
সংগ্রহ সংখ্যা - জ - ৭৫.৩৭৪.১-২

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - খোদাই, মাপ - দৈর্ঘ ১৯.৫ সে.মি, প্রস্থ ৫.৫ সে.মি, নির্মাণকাল - বিংশ শতকের মধ্য ভাগ, প্রাপ্তিস্থান - করিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

পিঠা বা সন্দেশের ছাঁচের জন্য বহুল প্রচলিত মাধ্যম হলো কাঠ। বাংলার রমণীরা নরুন দিয়ে খোদাই করে কাঠের এই ছাঁচ তৈরি করত। এটা সূত্রধররাও তৈরি করতেন। সংগ্রহ সংখ্যা জ-৭৫.৩৭৪.১-২ মিষ্টির ছাঁচটিতে কাঠের তৈরি প্যানেলের দুইটি অংশে বা থেকে হাতি, পাখি, দুইটি দুই ধরনের পাতা। আর একদম শেষে হাতির মাথা গর্তো করে খোদাই করা। নকশাকৃত কাঠের ২টি প্যানেলের মধ্যে পিঠা, মিষ্টি বা সন্দেশ ভরে প্যানেল দুইটি অংশকে একত্রে চাপ দিলে পাঁচটি পিঠা, মিষ্টি বা সন্দেশ তৈরি করা যায়। লোকায়ত কাঠের তৈরি এই কারুশিল্পটির নিজস্ব শৈলী লক্ষ্য করা যায়।

নিদর্শন - ঢেঁকি
সংগ্রহ সংখ্যা - জ-৭৯.১৭৭

মাধ্যম - কাঁঠাল কাঠ , আঙ্গিক - রিলিফের কাজ, মাপ - দৈর্ঘ্য ২ মি. ৫৮ সে.মি. প্রস্থ ৩২ সে.মি. নির্মাণকাল - বিংশ শতকের প্রথম ভাগ, প্রাপ্তিস্থান - খুলনা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে এমন প্রবাদ ঢেঁকিকে বাচিয়ে রেখেছে মানুষের মুখে মুখে। এখন ঢেকিতো প্রায় অচল। উনবিংশ শতকের দিকে গ্রাম বাংলায় এ ধরনের ঢেঁকির বহুল প্রচলন ছিল। কুমির আকৃতির ঢেঁকিতে সূক্ষ্ম রিলিফের কাজ করা। এই ঢেঁকির খোদাই কারুকাজ খুবই উন্নত। ঢেঁকির মাথার নিচে চাল, ডাল, মশলা ইত্যাদি কোটার দন্ডটি চতুষ্কোণ। এই দন্ডটিকে কোথাও মোনাই বলে। এই দন্ডের সামনের অংশে তিনটি খোপ এবং প্রতিটি খোপে মাছের নকশা লো রিলিফে করা। মোনাইর একপার্শ্বে মোরগ, হাঁস ও বক খোদিত। আরেকপার্শ্বের তিনটি খোপে হাতি, ঘোড়া, হরিণ লো রিলিফে আকর্ষনীয়ভাবে খোদাই করা। কুমির আকৃতির ঢেঁকির পিছনের পাটাতনের দুই দিকে মাছ কোটার চাল ঝাড়ার চিরচেনা গ্রাম বাংলার খোদইকৃত চিত্র শোভা পাচ্ছে। ঢেঁকি দেশের ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকিটির নকশায় লোকজ শিল্পশৈলী লক্ষনীয়।

নিদর্শন - পালঙ্ক
সংগ্রহ সংখ্যা - ৭৬.১২৬৯

মাধ্যম - সেগুন কাঠ, আঙ্গিক - রিলিফের, মাপ - দৈর্ঘ্য ৩ মি. ১২.৫ সে.মি, প্রস্থ ২ মি. ২১ সে.মি, উচ্চতা ২ মি. ৬ সে.মি. পায়ার উচ্চতা ১ মি.৩৯ সে.মি, নির্মাণকাল - উনবিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - ফরিদপুর, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

আকর্ষনীয় এই নকশাবহুল পায়াটি প্রাণীদের অবয়ব খোদিত হয়েছে পায়ার একদম নিচে বাঘের থাবা তার উপর একটি হাতি, হাতির উপর সিংহ, সিংহের উপর বাজপাখি হাই রিলিফে শক্তিশালী জীবজন্তুর মূর্তি খোদিত হয়েছে। একই রকমের রিলিফের কাজ বাকি তিনটি পায়াতেও আছ। পালঙ্কের মশারির স্ট্যান্ডটি অর্ধনগ্ন চারটি নারী ধরে আছে। এত পুঙ্খনুপুঙ্খ রিলিফের কাজ মুগ্ধ করার মত। পালঙ্কটি বর্ডারে তরঙ্গায়িত রিলিফের কাজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গ্রিক স্থাপত্যের অনুকরণে করা হলেও দেশজ ধারা অক্ষুন্ন রেখেই কাজটা করেছেন। পায়াতে দেশজ শিল্পশৈল্পী পূর্ণ মাত্রায় ফুটে উঠেছে। এই খাটে ছোট ওভাল আকৃতির আয়না। আয়নার চারপাশে জালিকাটা তরঙ্গায়িত লতাপাতার নকশা। পায়ের দিকে সিরানায় প্রসাধনী রাখার শোকেস আছে এবং তার দুই পার্শ্বে হরিণ ও দুইটি নারী মূর্তি হাই রিলিফে করা। ফরিদপুরের এক জমিদার এই খাটটি ব্যবহার করতেন। এ পালঙ্কটি উনিশ শতকের শিল্পশৈলীতে অলঙ্কৃত যার বেশির ভাগ হাই রিলিফে করা।

৩.২ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নিদর্শন - ষন্ডারোহিত শিব ও পার্বতী
পরিগ্রহণ নং- ২৯৭৩

মাধ্যম - সেগুন কাঠ , আঙ্গিক - রিলিফের কাজ, মাপ - দৈর্ঘ্য ৬৮ সে.মি, প্রস্থ ৩৮ সে.মি, পুরু ৮ সে.মি, নির্মাণকাল - বিংশ শতকের প্রথম ভাগ, প্রাপ্তিস্থান - তাহেরপুর, বাঘমারা, রাজশাহী, সংগ্রহকাল: ০৪-০৯-১৯৬৯ সাল, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান- বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিব ও পার্বতী ষন্ডায় আরোহণ করে কোথায় যাচ্ছে। তাদের মাথার উপরে একটি হাতি তাদেরকে দেখছে। হাতির পাশে কলাগাছ সদৃশ একটি গাছ খোদিত আছে। সম্পূর্ণ কাজটি হাই রিলিফে খোদাই করা। কাজের চতুর্দিকের ফ্রেমে তরঙ্গায়িত লতা পাতার লো রিলিফে নকশা করা আছে এবং নকশার পিছনে লো রিলিফের সূক্ষ্ম টেক্সচার খোদিত রয়েছে।

নিদর্শন - রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা
পরিগ্রহণ নং: ৬৬১১ (৯১.২৮৪)।

মাধ্যম - বেল কাঠ , আঙ্গিক - হাই রিলিফের কাজ, মাপ - দৈর্ঘ্য ২৪.৫ সে.মি, প্রস্থ ১৬ সে.মি, পুরু, ২ সে.মি.। নির্মাণকাল - উনিশ শতক, প্রাপ্তিস্থান - শিবগঞ্জ, বগুড়া, সংগ্রহকাল: ১৪-১২-১৯৯১ সাল, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলায় অন্তরঙ্গ মুহূর্ত উপস্থাপিত। একখণ্ড কাঠের অর্ধচন্দ্রাকৃতি পৃষ্ঠে রাধা-কৃষ্ণকে পাশাপাশি রিলিফ পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কৃষ্ণ স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় বাঁশি বাজাচ্ছেন আর রাধা শাড়ির আঁচল ধরে মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। রাধা-কৃষ্ণ দুজনেই আপাদমস্তক অলংকার সজ্জিত। কাজটি উনিশ শতকে হাই রিলিফে করা হয়েছে।

৩.৩ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর

নিদর্শন - তাক
সংগ্রহ সংখ্যা - ৭৬ (৬) ২১

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - হাই রিলিফ, মাপ - দৈর্ঘ্য ৬০ সে.মি, প্রস্থ ৩০ সে.মি, উচ্চতা ৩০ সে.মি, নির্মাণকাল - অষ্টদশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - সোনারগাঁও, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

একটা উড়ন্ত পাখি গলা বাকিয়ে নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। শূন্যে বিরাজমান দুটি পাখা মেলে দিয়েছে, পাখায় সূক্ষ্ম লো রিলিফের নকশা করা। এই দুটি পাখা ও ঘাড়ের উপর তাকটি স্থাপিত। লেজের পালকে সূক্ষ্ম নকশা খোদিত হয়েছে। পাখির পেছনের নকশাকৃতি কাঠটি দেওয়ালে আটকানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। এর উপরে জিনিসপত্র রাখার ফলে তাক যেন সহজেই ভার বহন করতে পারে সেজন্য এ ব্যবস্থা। উনিশ শতকের দিকে এ ধরনের দেওয়াল তাক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হত।

নিদর্শন - কাহাইল ছিয়া
সংগ্রহ সংখ্যা - ৮৮ (০৬) ১৭৮

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - ত্রিমাত্রিক, মাপ - উচ্চতা ৪৫ সে.মি. ছিয়া ২৪০ সে.মি. আনুমানিক, নির্মাণকাল - উনবিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - ঢাকা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

বাংলাদেশের ঐতিহ্য কাহাইল-ছিয়া। এর গায়ে কোন নকশা নেই। কাহাইলের মাঝামাঝি পেটে চাপা জায়গায় ঘাত কাটা আছে। এর সাথে লম্বা ছিয়া আছে। তাতেও কোন নকশা নেই। বাংলাদেশে কাহাইল ছিয়ার ব্যবহার এখনও ব্যাপক ভাবে হয়ে থাকে। কাহাইল ছিয়ার শুধুমাত্র হাতের ব্যবহারে সাধারণত চাল, হলুদ, মরিচ, নানা ধরনের মশলা গুড়া করা হয়।

নিদর্শন - খড়ম
সংগ্রহ সংখ্যা - ৮৩ (৬) ২৭১, ৭৭ (৬) ৬২

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - ত্রিমাত্রিক, মাপ - ৮৩ (৬) ২৭১ - উচ্চতা ২.৫ সে.মি, ৭৭ (৬) ৬২ - উচ্চতা ৫ সে.মি, নির্মাণকাল - অষ্টাদশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - ঢাকা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই খড়মের গায়ে কোন নকশা নেই। দুই জোড়া খড়ম রাখা আছে এবং উচ্চতার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলো বইল্যা খড়ম হিসেবে পরিচিত। খড়ম মূলত পাদুকা বিশেষ। উনিশ শতকের পর বইল্যা খড়মের ব্যবহার কমে আসতে থাকে। বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। পূজা-অর্চনা ছাড়া খড়মের প্রচলন নেই।

নিদর্শন - প্রদীপদানী
সংগ্রহ সংখ্যা - ৭৭ (৬) ৫৭

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - ত্রিমাত্রিক হাই রিলিফ, মাপ - উচ্চতা ৩০ সে.মি. আনুমানিক, নির্মাণকাল - বিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - নোয়াখালি, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী প্রদীপদানটি দেখতে খুবই সুন্দর। এক সময় এর ব্যবহার বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ছিল, এখন যাদুঘরে স্থান করে নিয়েছে। কুন্দানো মেশিনে হাই রিলিফ নকশা করা।

নিদর্শন - দুধ মাপার কেড়ে
সংগ্রহ সংখ্যা - ৭৬ (৬) ২০

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - ত্রিমাত্রিক কাজ, মাপ - উচ্চতা ৩০ সে.মি. উপরের মুখে ১৪ সে.মি. নিচে ২১ সে.মি. আনুমানিক, নির্মাণকাল - বিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - নোয়াখালি, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

দুধ মাপার কেড়ে দেখতে খুব সুন্দর, সচরাচর দেখা যায় না। সুন্দর দেখার জন্য এবং ধরার সুবিধার জন্য মুখে কাদার মত অংশ আছে। গায়ে কুন্দানো লো রিলিফে তিন চারটি দাগের নকশা করা। সহজ সরল ফর্মটি দেখতে আকর্ষনীয়।

নিদর্শন - বিয়ের পিঁড়ি
সংগ্রহ সংখ্যা - ৮১ (৬) ১৬২

মাধ্যম - কাঠ,আঙ্গিক - লো রিলিফের নকশা করা, মাপ - দৈর্ঘ্য ৬৮ সে.মি. প্রস্থ ৩৭ সে.মি. উচ্চতা ৬ সে.মি. ছিয়া আনুমানিক, নির্মাণকাল - উনবিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - নোয়াখালি, বান্দরবান, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

বিয়েরে পিঁড়ির শেষ প্রান্ত ঘেষে চার কোণায় চারটি ফুল লো রিলিফে খোদিত। সংযোগ হিসেবে তরঙ্গায়িত লতা পাতা চারদিকেই বেষ্টিত ২ ১/২ ভিতরে বর্ডার আছে তাতে নকশা করা আছে। দুইটি বিটের মাঝে বাকা বাকা চিকন লো রিলিফ দাগ টানা আছে। বর্ডার সংলগ্ন চারকোনাতে প্রস্ফুটিত কলি খোদিত হয়েছে। একদম মাঝে ফুটন্ত পদ্ম ফুলের নকশা খোদিত হয়েছে। নকশাটি দেখলে মনে হয় লোকায়েত এবং নিজস্বতা রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী এই পিড়ি হিন্দুদের বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কারুশিল্প হিসেবে পরিচিত।

নিদর্শন - গণেশ
সংগ্রহ সংখ্যা - ৮০ (৬) ১২৮

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - হাই রিলিফের কাজ, মাপ - উচ্চতা ৬৬ সে.মি. প্রস্থ ৫২ সে.মি. আনুমানিক, নির্মাণকাল - উনবিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - সোনরগাঁও, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

গণেশের ৫টি মাথা রয়েছে। ৮টি হাত রয়েছে। নিচে পায়ের কাছে তিন জন ভক্ত পূজায়রত। গণেশের হাতে ফুল, কুঠার, ত্রিশূল, শঙ্খ ইত্যাদি সূক্ষ্ম ভাবে হাই রিলিফের কাজ রয়েছে। গণেশের মাথার পিছনে একটি গোলকৃতি চালা আছে তাতে ফুল লতাপাতার নকশা ও উপরের দিকে মানুষে দুইটি ফিগার দুই দিকে হাত দিয়ে আম পরছে। হাই রিলিফের এই কাজটি জলচৌকি সদৃশ বেজের উপর রাখা আছে। এই বেজের চার কোনায় চারটি কুন্দানো নকশায় ফুলের কালির ন্যায় কাঠ লাগানো আছে। কাঠের রঙটি গাঢ় রূপ ধারণ করেছে। গণেশের এই হাই রিলিফে করা কাজটি পূজার নিমিত্তে ব্যবহার হত।

নিদর্শন - দোলনার স্ট্যান্ড
সংগ্রহ সংখ্যা - ৭৯ (৬) ১০৮

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - হাই রিলিফের কাজ, মাপ - উচ্চতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৩ ফুট, নির্মাণকাল - উনবিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - ফরিদপুর, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

দোলনার স্ট্যান্ডটি দেখতে খুব সুন্দর। উপরের অংশটি ত্রিভূজ আবার এই আকারের কেন্দ্র করে নকশা করা হয়েছে। ত্রিভূজ আকারের নিচের প্যানেলটির দুই মাথায় দুটি হাতীর মূখ হাই রিলিফে করা। হাতির ঘারে দুই পার্শ্বে দুটি ঘোড়া উপরের দিকে উঠছে। দুই পার্শ্বে দুটি সিংহ উপরের দিকে উঠছে। কোন এক দেবতার ত্রিভূজের চূড়ায় ফুলের শেপ। ত্রিভূজের প্রতিটি বাহুতে তরঙ্গায়িত লতাপাতা ও ফুলের খোদিত নকশা ত্রিভূজের মাঝামাঝি আরেকটি প্যানেল দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ভাগকৃত প্যানেলে মধ্যে ফুল দুই পাশে লতা-পাতা পূণরাকৃতি। নিচের প্যানেলে মাঝামাঝি প্যানেল বসে আছে দুই পার্শ্বে দুটি হাতি দাড়িয়ে আছে। গণেশের বাহ ইদুর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দেলানার স্ট্যান্ডটি দেখলে মনে হয় মন্দিরের তোরণদ্বার।

নিদর্শন - মস্কা
সংগ্রহ সংখ্যা - ৮৩ (৬) ২২১

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - নকশাদার মস্কা, মাপ - দৈর্ঘ্য ২২ সে.মি (আনুমানিক), নির্মাণকাল - অষ্টদশ শতাব্দি, উনবিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - কিশোরগঞ্জ, যশোর, ময়মনসিংহ, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

০১ ও ০২ নং সম্বলিত ২টি মস্কা সংগৃহীত আছে। ০১ নং মস্কায় উপরের অংশে পাঁচটি খাচ কাটা নকশা এবং ০২ নং মস্কায় চারটি খাচ কাটা নকশা। দুইটি ঘাতের উপর তা বসানো। যা প্রস্ফুটিত ফুলের মত মনে হয়। দেখতে খুবই সুন্দর এবং সহজ ফর্ম। অষ্টাদশ শতাব্দি ও উনবিংশ শতাব্দিতে চুল আচড়ানোর কজে এর প্রচুর ব্যবহার হত। এখনও চুল আচড়ানো এবং উকুন আনার কাজে ব্যবহার হয়।

নিদর্শন - কুলা
সংগ্রহ সংখ্যা - ৭৯ (৬) ৮৪

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - কুলায় গড়ণে লো রিলিফের কাজ, মাপ - দৈর্ঘ্য ৩৩ সে.মি. (আনুমানিক), নির্মাণকাল - উনবিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - কুমিল্লা, ঢাকা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

কাঠের তৈরি কারুশিল্পের অনন্য অবদান কাঠের কুলা। কুলার আকারে কাঠ দিয়ে করা। কুলায় বাধনের মত সূক্ষ্ম বাটালি দিয়ে বাধন সদৃশ লো রিলিফে খোদাই করা। কুলার চতুর্পার্শ্বে তরঙ্গায়িত ফুল লতা পাতা। মাঝে দূর্গার প্রতিমা লো রিলিফে খোদিত। তার নিচে দুটা সিংহ। মুখোমুখি দাড়িয়ে। দূর্গা

প্রতিমার বর্ডারের বাহিরে চারটি চঞ্চল সাপ খোদিত হয়েছে। কালো রঙ করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এর ব্যবহার ছিল। এখন ব্যবহার একেবারেই নেই। এই কুলার ধরণ দেখে মনে হয় মন্দিরে বা পূজায় ব্যবহার হত। এদেশের লোকায়ত শিল্প শৈলীর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

নিদর্শন - কাঁচকুঠুরী
সংগ্রহ সংখ্যা - ৭৮ (৬) ৬৭

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - গোলাকার পাত্র, মাপ - উচ্চতা ৭.৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য ১৫ সে.মি (আনুমানিক), নির্মাণকাল - উনবিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - কুমিল্লা, ঢাকা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।
লাল রঙের কাঠের তৈরি কাঁচ কুঠুরী পাত্রটি দেখতে খুবই আকর্ষনীয়। কাঁচকুঠুরীর ঢাকনাটি উত্তল আকৃতি। ঢাকনার মাঝামাঝি উচু হয়ে উঠেছে। ঢাকনাটির গোলাকার শেষ প্রান্ত পাত্রের চেয়ে বাড়তি কারণ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। ঢাকনাটির উপরিভাগে ফুল লতা পাতার ছন্দায়িত লো রিলিফে নকশা খোদিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এমন পাত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

নিদর্শন - নকশি টেবিল
সংগ্রহ সংখ্যা - ৩২০

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - অষ্টকোণাকৃতি টেবিল, মাপ - উচ্চতা ৭৫ মে.মি. টপ ৬০ সে.মি. চওড়া (আনুমানিক), নির্মাণকাল - অষ্টাদশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - ঢাকা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘর।

লো রিলিফ ও হাই রিলিফ খোদাইকাজ করা নকশি টেবিলটির উপরের অংশটি অষ্টাকোণাকৃতি । অষ্টাকোণাকৃতি অনুযায়ী বর্ডার দেওয়া আছে। তাছাড়া মাঝে গোলাকার আরও দুইটি চিকন বর্ডার আছে। তরঙ্গায়িত লতার ভিতরে বাঘ, সিংহ বানর হাতি লো রিলিফে নকশা করা আছে। মাঝের অংশে বর্ডারের ভিতরে লতাপাতার সাথে দুইটি নারকেল গাছ সদৃশ লক্ষ্য করা যায়। টপটি একটি নকশাদার স্ট্যান্ডের উপরে দাড়ানো এই স্ট্যান্ডটির মাঝামাঝি পাটিবোনা নকশা সদৃশ খোদিত। একদম নিচে চারটি ভাগে চারটি বাঁকানো পা আছে, যা স্ট্যান্ডটিকে ধরে রেখেছে সহজেই। নকশাদার বাকানো পায়ার শেষে পাখির ঠোঁট হাই রিলিফে খোদাই করা আছে। খোদাই অলঙ্করণে কোন রকম ছন্দপতন ঘটেনি। টেবিলটি দেখতে খুবই সুন্দর ফুল লতাপাতার অলঙ্করণে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের মোগল স্থাপত্য শিল্প শৈলির নকশার প্রভাব থাকলেও এতে দেশীয় শৈলীর ছাপ রয়েছে। অষ্টাকোণাকৃতি টেবিলটির প্রতিটি অলঙ্করণের মাঝে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত ভাবটি স্পষ্ট।

৩.৪ আহসান মঞ্জিল

নিদর্শন - আইসক্রীম বালতি
সংগ্রহ সংখ্যা - উল্লেখ নাই

মাধ্যম - কাঠ ও ধাতব, আঙ্গিক - নকশা ও রিলিফহীন, মাপ - উচ্চতা ২০ মে.মি. নির্মাণকাল - উল্লেখ নাই, প্রাপ্তিস্থান - উল্লেখ নাই, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - আহসান মঞ্জিল।
আইসক্রীমের এই বালতিটির ধাতব হাতল এবং ভিতরের অংশটি ধাতব, ভিতরের অংশটি পিতলের হলেও বাহিরের অংশটি ৪ সে.মি.-৫ সে.মি. কাঠের স্লাইস দিয়ে পিতলের অংশকে ঘিরে লাগানো। ১০-১১টি স্লাইস গায়ে গায়ে লাগানো আছে। সুন্দর এবং নান্দনিক এই বালতিটি।

নিদর্শন - দরজার অলংকৃত পাল্লা
সংগ্রহ সংখ্যা - আ-৮৮.৭১

মাধ্যম - কাঠ, আঙ্গিক - রিলিফের কাজ, মাপ - উচ্চতা ২২৮ মে.মি. প্রস্থ ৬০ সে.মি, নির্মাণকাল - উনবিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান - এওয়ার্ড হাউস, ঢাকা, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - আহসান মঞ্জিল জাদুঘর।

দরজার পাল্লাটির ৬টি খোপ আছে। দরজাটি লো রিলিফ এবং হাই রিলিফে ফুল লতা পাতার নকশার ভিতরে ফিগার খোদিত হয়েছে। ফিগারগুলি নৃত্যরত যা দেশীয় শৈলীতে খোদিত হয়েছে। এই দৃষ্টি নন্দন দরজার চৌকাঠে কোন নকশা নেই।

নিদর্শন - টেবিল
সংগ্রহ সংখ্যা - ৯০.১৫৩২

মাধ্যম - কাঠ ও ধাতব, আঙ্গিক - অষ্টকোণাকৃতি, মাপ - উচ্চতা ৮৫ সে.মি. নির্মাণকাল - উনিশ শতক, প্রাপ্তিস্থান - আহসান মঞ্জিল, সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান - আহসান মঞ্জিল।

টেবিলটি উনিশ শতকের হলেও ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলন ঘটেছে। অষ্টকোণাকৃতি টেবিলে প্লেন নকশা করা টেবিলটি একটি স্ট্যান্ডের উপর দাঁড়ানো। একসাথে নিচে আটটি কচ্ছপ অষ্টকোণাকৃতির প্রতিটি কোণায় কোণায় একটি করে কচ্ছপ মোট ৮টি কচ্ছপ বেজকে ধরে রেখেছে। উনিশ শতকের ধাতব সহযোগে কাঠের যে ব্যবহার বাংলাদেশে সচরাচর হয়ে থাকে, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪. উপকরণ ও করণকৌশল

বাংলাদেশে উন্নত মানের কাঠের তৈরি কারুশিল্প দেখা যায়। সেখানে সৃজিনশীলতার উন্মেষ ঘটেছে কাঠের অনুশীলন ও ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে লব্ধ কাঠের কারুকর্ম চর্চার ক্ষেত্রে সৃজনশীল গুনটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে উপকরণ ও করণকৌশল এই দুইটি প্রশ্নই জড়িত। সৌন্দর্য প্রকাশ করতে যেমন দক্ষতার উপর নির্ভর করতে হয় তেমনই কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতাকে ব্যাক্ত করতে উপকরণ প্রয়োগের উপর নির্ভর করতে হয়। সব সময় মনে রাখতে হবে যিনি অনেক দেখেছেন দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরণের চর্চা করেছেন, যার অনেক অভিজ্ঞতা আছে যে কোন শিল্প সমস্যা যার কাছে সর্বদাই একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং সর্বপরি শিল্প বিষয়টি যিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন তাঁর পরামর্শ এবং তাকে অনুসরণ সব সময়ে চূড়ান্ত গ্রহণযোগ্য না হলেও অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বলা যায়। যেহেতু কাঠের কারুশিল্পের একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, কাজেই বিষয়টি বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রমাণিত যেখনেই কাজটি হাতে কলমে করার প্রশ্ন রয়েছে সেখানেই ব্যাপক অভিজ্ঞাতার মূল্য সবচেয়ে বেশি। বংশ থেকে বংশে যুগ যুগ ধরে লালিত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের করণকৌশল নিজে হাতে কলমে করা এবং অন্যকে করতে দেখা এবং উন্নত কারুশিল্পকর্ম অনুশীলন এগুলি কাঠের কারুশিল্প চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

অত্যন্ত সচেতন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ভাঙ্গা গড়ার চড়াই উৎরাইয়ে ভূল ত্রুটি ও সাফল্যের পথ ধরে একজন কাঠের কারুশিল্পীকে প্রয়োগ পদ্ধতি রপ্ত করতে হয়। স্বকীয় একটি স্টাইলকে আবিস্কার করতে হয় যা অঞ্চল ভিত্তিক হতে পারে, ঐতিহ্য ভিত্তিক হতে পারে আবার সর্বজনিন হতে পারে। একজন সফল কারুশিল্পী বাহুল্যের চেয়ে গড়ণে অত্যান্ত সরল ফর্মে রূপ দেন।

তিনি আনন্দ পান রূপের সম্পূর্ণতায়, অতি সূক্ষ্ম, অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে। বস্তুত আর্টের সৃষ্টিতে উপায় জিনিসটা যতই হালকা ও প্রচ্ছন্ন হচ্ছে ততই সৃষ্টির দিক থেকে তার মর্যাদা বাড়বে। আর্টে প্রগলভতার চেয়ে মিতভাষা, বাহুল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেষ্ঠ।[১] কাঠের তৈরি কারুশিল্প গড়ণের দিক দিয়ে খুবই সরল

হয়ে থাকে। তৈরির সুবিধার্থেও সরলতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এগুলোর তৈরির ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণ কাঠামোই নির্বাচন করা হয়। কাঠ বনজ দ্রব্যের মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। এই উপকরণটি

শুধুমাত্র কাঠের কারুশিল্পেই নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার আছে। একজন অভিজ্ঞ কাঠের কারুশিল্পী তাকেই বলব যখন কোন কাঠ খন্ডকে কোন হাতিয়ার ব্যবহার করে, খোদাই করে, ছেটে-কেটে, কিছু বাদ দিয়ে প্রয়োজন মত একটি আকার আকৃতি দেবে। আবহাওয়াগত কারণে এ অঞ্চলে কাঠের তৈরি কারুশিল্পসহ অন্যান্য জিনিস সহজে নষ্ট হয়ে যায়। পোড়ামাটি, ধাতু ও পাথরের তুলনায় কাঠ সহজে পচনশীল ও পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যায়। ফলে কাঠের তৈরি পুরোনো কারুশিল্প খুব কম পাওয়া যায়। সংরক্ষণের অভাবে এগুলির কারুকর্ম অচিরেই বিনষ্ট হতে পারে। সামান্য উপকরণের মাধ্যমে এবং সমান যন্ত্রপাতি দিয়ে বাংলাদেশের কারুশিল্পীরা আবহমানকাল ধরে কাঠের তৈরি কারুশিল্প নির্মাণে অসামান্য কারিগরি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪.১ কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উপযোগী কাঠ, কাঠ সংগ্রহ ও কাঠ সীজন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ সবুজ বৃক্ষের দেশ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান হিমালয়ের ভুখন্ড থেকে মালভূমি ও সমতলের উপর দিয়ে অজস্র জলাধারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেখানে বিপুল পরিমাণে কাঠ উৎপাদনকারী গাছ জন্মে। "উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে বাংলায় চল্লিশ ধরনের কাঠ উৎপাদনকারী গাছ আছে।"[২] এসব গাছের কাঠ সাধারণত ঘরের খুঁটি, কড়ি, বর্গা, গরুর বা ঘোড়ার গাড়ী, জোয়াল, লাঙল, পালঙ্ক, খেলনা, সাঙ্গিতিক যন্ত্রাদি, আসবাবপত্র, কৃষিজ সরঞ্জাম, রেলগাড়ির বগি, নৌকা, মাস্তুল ও বৈঠা, জ্বালানি কাঠ, ছড়ি, সিগেরেটের বাক্স, গৃহস্থালী সামগ্রী, কাঠমো, সিঁড়ি, মেঝে, ঘরের পার্টিশনের কাজে, চিরুনি, কলমদানি, হাতল, হুকার ডান্ডা, বিছানার পায়া, টেবিল, গাণিতিক সরঞ্জাম তৈরি, বিভিন্ন নির্মাণকাজে ও অলংকৃত বিভিন্ন বস্তু তৈরিতে ব্যবহার করা হতো। আর ব্যবহার করা হতো ম্যাচ তৈরির কারখানায়।

সূদূরে অতীত থেকেই এইসব কাঠের তৈরি এ দেশের শিল্প সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এই কারুশিল্প শুধু আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয় বরং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিল্প বিশেষ সুনির্দিষ্ট এলাকা বা পাড়ায় গড়ে উঠেছে। আর এই দৃষ্টিকোন থেকেই গোষ্ঠী ভিত্তিক কারুশিল্পী হিসাবে আমাদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশে কাঠের ব্যবহার ব্যাপক। মানুষ আদিম যুগ হতে কাঠকে নানাভাবে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে আসছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন কাঠ ব্যবহার হয়। কাজের ধরণ বুঝে কি ধরনের কাঠ ব্যবহৃত

হবে, তা কাঠের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে কাঠকে ভালভাবে জেনে ও চিনে কাজ করা দরকার। কাঠ যে সব কাজে ব্যবহার হয়, মোটামুটি তাদের তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যায়।[৩]

১. শিল্প কাজ,
২. স্থায়ী কাজ,
৩. অস্থায়ী কাজ

১. শিল্প কাজ- কারুশিল্প, ভাস্কর্য, কার্ড-বোর্ড, কাগজ, নৌকা, কৃষিকাজের সরঞ্জামাদি, সিল্ক ও রেয়ন তৈরির কাজ, এরোপ্লেন, বাস লঞ্চ, স্টীমার, রেলগাড়ী, স্লিপার ইত্যাদি যানবাহনাদির কাজ।

২. স্থায়ী কাজ- দরজা-জানালা, আসবাবপত্র, দালান-কোঠার বর্গা, খুঁটি চালার কাজ, সাঁকো বা পুল, ইলেকট্রিক লাইনের খুঁটি ও ভিত্তির জন্য পাইল, ঘরের মেঝে ইত্যাদি।

৩. অস্থায়ী কাজ- চালা, মাচা, খুটি, সেন্টারিং ও ফর্মের কাজ, জিনিসপত্র রাখিবার বাক্স ইত্যাদি।

৪.১.১ কাঠের প্রকারভেদ নির্ণয়

কাঠ বনজ দ্রব্যের মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। শুধুমাত্র কারুশিল্পের জন্যই নয় এর ব্যাপকতা বেশ। ভারত বর্ষে অরণ্যের বিস্তীর্ণ জমিতে বিভিন্ন প্রকার কাঠ উৎপন্ন হয়। মধ্য প্রদেশের অরণ্য অঞ্চল হতে সর্বাধিক কাঠ পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, বোম্বাই, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রায় ১৫% বনাঞ্চল রয়েছে। সারা বিশ্বে বৎসরে কাঠের তৈরি কারুশিল্পে প্রচুর কাঠ ব্যবহার হয় তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিবীজী (জিমনোস্পার্ম) ও দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী (ডাইকটিলিডনাস অ্যানজি ও স্পার্ম) বৃক্ষের কাঠ সাধারণতঃ নরম এবং দ্বিবীজ পত্রী বৃক্ষের কাঠে সাধারণতঃ সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ থাকে। কাঠের তন্তু প্রধানতঃ সেলুলোজে গঠিত। উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশের মধ্যে "জাইলেম" নামক প্রণালী থাকে, এর মধ্য দিয়েই সে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবাহিত করে থাকে। এছাড়াও কাঠ উদ্ভিদ দেহের ভার বহন করে থাকে। কাষ্ঠল অংশের বাৎসরিক গৌনবৃদ্ধির (সেকেন্ডারি গ্রোথ) ফলে কাঠের গায়ে বর্ষ বলয় বা অ্যানুয়্যাল রিং সৃষ্টি হয়। একটি গাছ বা কাঠে নিম্নলিখিত সাতটি অংশ বিদ্যমান থাকে।

১. Cortex- বাকল বা গাছের ছাল;

২. Bast- আঁশালো বাকল;

৩. Cambium- আঁশালো বাকলের নিচের অংশ;

৪. Pith- বৃক্ষাদির মজ্জা;

৫. Medullary- বৃক্ষাদির সারাংশ জনিত রিং;

৬. Annual ring Summer ring- বর্ষবৃত্ত বা গ্রীষ্মের বর্ষ রিং বা গোলক;

৭. Annual ring Spring wood- বর্ষবৃত্ত বা বসন্তের বর্ষ বৃত্ত বা গোলক

নিকৃষ্ট ধরনের কাঠ সাধারণতঃ জ্বালানি হিসেবে ও প্যাকিং বাক্স, প্লাইউড ইত্যাদি তৈরির ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট কাঠ আসবাবপত্র, সেতু, রেল লাইনের স্লিপার, নৌকা, জাহাজ, ভাস্কর্য এবং কারুশিল্পের উপকরণ হিসেবে নেয়া হয়। কাঠের মণ্ড থেকে কাগজ ও রেয়ন তৈরি হয়। কাঠের পাতন (ডিসটিলেশন) দ্বারা মিথানল, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, টারপেণ্টাইন প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন প্রকার কাঠের, পার্থক্য ও শিল্পগত মূল্য কাঠের বিভিন্ন গুণাগুনের মাধ্যমে হয়। কাঠের বর্ণ, বুনন, বস্তুপুঞ্জ, কাঠিন্য, অনমনীয়তা, স্থায়িত্ব, চেরাই করার সুবিধে প্রভৃতি বিচার করেই কাঠের মূল্য নির্ধারিত হয়। এত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কাঠের অভ্যন্তরীন গঠনের উপর নির্ভর করেও কাঠের শ্রেণীভেদ, ব্যবহার ও মূল্য নির্ভর করে। কাঠের অংশের হালকা রঙ এর বহির্ভাগ বা সফ্ট উড ও কেন্দ্রস্থলের ঘন রঙ-এর অংশ হার্ট উড ভিন্ন কাজের জন্য র্ববহৃত হয়। হার্ট উড খুব শক্ত ও সেশ শুষ্ক, এতে সহজে পোকা ধরেনা। সে জন্য এটা অপেক্ষাকৃত মূল্যবান কাঠ।

বাংলাদেশে সরকারীভাবে ৪২ প্রজাতির কাঠকে ব্যবহারের উপযোগী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এসব কাঠের মধ্যে বিশেস শ্রেণী "এ" "বি" এবং "সি" ভূক্ত কাঠ রয়েছে। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন, ১১৬/এ, তেজগাও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা সূত্রে জানা যায়। আবার চট্রগ্রামের রিসার্চ ইন্সটিটিউট এদেশে ১১৬ প্রজাতির কাঠ রয়েছে বলে ১৯৮১ সালের জুন মাসে প্রকাশিত গ্রন্থে দাবী করেছে। ব্যবহারে অভ্যস্ত না হওয়ায় মাত্র ৪২ প্রজাতির কাঠ এদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে এসব প্রজাতির অনেক কাঠই এখন বিরল। নির্দিষ্ট প্রচলিত প্রজাতির কাঠ কম পাওয়া যায় বলে বাজারে তার দাম ও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি মানের কাঠ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিলে নির্দিষ্ট প্রজাতির কাঠের উপর চাপ কমবে।

৪.১.২ বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর কাঠের সংখ্যা প্রায় ১৮টি

এদের প্রচলিত নাম- (১) বয়লাম কাঠ (২) চম্পাফুল কাঠ (৩) চাপলাশ কাঠ (৪) চিকবাশি কাঠ (৫) গামার কাঠ (৬) গর্জন কাঠ (৭) গণদ্রোই কাঠ (৮) জারুল কাঠ (৯) কান্থাল কাঠ (১০) মেহগনী কাঠ (১১) নাগেশ্বর কাঠ (১২) পিনখাদা কাঠ (১৩) শিল কড়ই কাঠ (১৪) তেলশুর কাঠ (১৫) তুন কাঠ (১৬) বাবলা কাঠ (১৭) লিচু কাঠ (১৮) কামেনি কাঠ (ছোট চিকন)

দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত কাঠের সংখ্যা প্রায় ১২টি

(১)বান্দর হোলা কাঠ (২) হলুদ কাঠ (৩) জাম কাঠ (৪) কাইনজল কাঠ (৫) কালা কড়ই কাঠ (৬) কামদেব কাঠ (৭) পানিসজ কাঠ (৮) পিতরাজ কাঠ (৯) টালিকাঠ (১০) নিম কাঠ (১২) বেল কাঠ।

তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত কাঠের সংখ্যা প্রায় ১৭টি

(১)বার্তা কাঠ (২) ছাতিম কাঠ (৩) চুয়াংরী কাঠ (৪) সিভিট কাঠ (৫) হরিতকী কাঠ (৬) খাদাম কাঠ (৭) কনক কাঠ (৮) নারিকেলি কাঠ (৯) পাইরক কাঠ (১০) রকতন কাঠ (১১) শিমুল কাঠ (১৩) সুন্দরী কাঠ (১৪) কেওড়া কাঠ (১৫) কেকড়া কাঠ (১৬) পশুর কাঠ (১৭) দেওদার কাঠ। বর্ষ বলয়ের মাধ্যমে এই কাঠগুলির বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

এছাড়া উচ্চতর প্রথম শ্রেণীর কাঠগুলো হচ্ছে (১) সেগুন কাঠ (২) শাল কাঠ (৩) শিশু কাঠ (৪) চন্দন কাঠ (৫) শিরিষ কাঠ (৬) বার্মাটিক কাঠ (৭) মেহগণি।

প্রত্যেক প্রজাতির কাঠের একটি নির্দিষ্ট বোটানিকেল নাম ছাড়াও তার একটি অঞ্চল ভিত্তিক ব্যবসায়িক নাম থাকে। আবার প্রতীক নামও প্রত্যেক কাঠের রয়েছে। নিম্নে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের জন্য বাংলাদেশে প্রাপ্ত কিছু উপযোগী কাঠ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ-

গামারী ঃ এ গাছ সোজা ও লম্ব হয়। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের জন্য উপযোগী কাঠ বড় রাস্তার পাশে এদেরকে বেশ মনোরম দেখা যায়। এতে ভাল মজবুত কাঠ হয়। এই কাঠ নরম তাই কারুশিল্পের নানা মাত্রার কাজ করা যায়। আসবাবপত্র, খুটি, টমটম, বদ্যযন্ত্র, প্রতিকৃতি, ড্রাম নানা ধরনের কারুশিল্প তৈরির কাজে ব্যবহার হয়। ভাল পালিশ হয়, আঁশ, সরু, শক্ত ও পানিতে টেকসই এবং সহজে রং দেয়া যায়। ঘুন বা পোকা এই কাঠকে সহজ নষ্ট করতে পারে না।

মেহগনি ঃ কাঠটা দেখতে লালচে, শক্ত মজবুত ও কাজে সহজ। ইহা খুব ভাল পালিশ নেয় বলে বিশেষতঃ সর্ব-প্রকার কারুশিল্পে এর ব্যবহার প্রচলিত।

বাবুল ঃ এটি দেখতে লাল, ঘন আঁশযুক্ত, সেগুন হতেও মজবুত। গাড়ীর চাকা, খড়ম, লাংগলের উপরিভাগ, যন্ত্রপাতির হাতল বা বাট ইত্যাদির কাজে ব্যবহৃত হয়। পানাহার তৈরি করতে বুগরাওয়াতি পদ্ধতিতে মাটিতে একটা গর্ত করে তাতে বাবুল কাঠের ছাই দিয়ে পূর্ণ করে নেয়।[৪]

দেবদারু ঃ এই গাছ সোজা, ঘন সুন্দর পাতা বিশিষ্ট ও রাস্তার পাশে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সব গাছ ছাড়িয়ে উপরে ওঠে যায়। কাঠ নরম ও সাদা। প্রতিকৃতি, বক্র জিনিস, নৌকা, সিঁড়িসহ অন্যান্য কারুশিল্প ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

পেয়ারা ঃ এর সুমিষ্ট ফল সবাই পছন্দ করে। কাঠ বেশ শক্ত, ভাল পালিশ নেয়। দা, কাঠি, কোদাল, কুড়াল ও নানান যন্ত্রপাতির হাতল তৈরির কাজেই ইহা ব্যবহার হয়।

কাঁঠাল ঃ বাংলাদেশের সর্বত্রই এই গাছ পাওয়া যায়। এই গাছের সুস্বাদু কাঁঠাল সবাই ভক্ষণ করে। এই কাঠ বেশি শক্ত নয়, মোটা আঁশ যুক্ত, কিন্তু সহজে পালিশ দেওয়া যায়। আসবাবপত্র, বেলনা, পিড়ি, লাটিম, ফুলদানি, দরজা-জানালা ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। আইন-ই-আকবরীতে কাঠাল গাছের কথা উল্লেখ আছে। "সরকার হাজীপুরে কাঁঠাল ও বরহাল ফল প্রচুর উৎপন্ন হয়। প্রথমটি বড় আকারের হয় যে কোনো লোক অতি কষ্টে এটি বহন করতে পারে।"[৫]

জাম বা কাল জাম ঃ দেশের সর্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে। এই কাঠ শক্ত এবং দরজা-জানালা নানা ধরনের কারুশিল্পসহ সাধারণ কাজে ব্যবহৃত হয়। পানির নিচের কাজে, যেমন পুল, বাঁধ, নৌকা ইত্যাদির কাজে লাগে।

আম ঃ আম দেশের সর্বত্রই দেখা যায়। এই কাঠ অপেক্ষাকৃত ভারী ও মোটা আঁশযুক্ত। সাধারণ কাজে যেমন প্যাকিং বাক্স, নৌকা, আসবাবপত্রসহ অন্যান্য কারুশিল্পের ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

নিম ঃ এই গাছ দেশের পাহাড়ী অঞ্চলে বেশি জন্মে। এর কাঠ শক্ত, টেকসই ও মজবুত। রাস্তার পাশে বাড়ির আশেপাশেও এই গাছ রোপণ করা হয়। আকারে লম্বা এবং সোজা। আঁশ লালচে। সব ধরনের কারুশিল্পের জন্য উপযোগী কাঠ। কৃষিকর্মের সরাঞ্জামাদি কাজে, যন্ত্রের হাতলে, জাহাজের কাজে, সাঁকোর খুটি, নৌকা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘুনপোকা সহজে এই কাঠ নষ্ট করতে পারে না। তাবে নিম কাঠ যেকোন কাজের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বলে জানা যায়। এই গাছ নিয়ে কথিত গল্প আছে, প্রাচীনকালে কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা শুভ দিনক্ষণ দেখে নিম গাছের চারা রোপণ করতেন। শুধু তাই নয় ব্রাক্ষণ ডেকে পূজা অর্চনাও করা হতো। এরপর প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পরিবারের সকালে ভূমিষ্ট হয়ে সেই চারা গাছকে

প্রণাম করতো এবং প্রতিদিন পানি দিয়ে যত্নআত্তি করতো। যখন গাছ মূর্তি বা কাঠের তৈরি কারুশিল্পের জন্য পূর্ণতা পায় তখন হোমাগ্নি জ্বেলে ব্রাক্ষণ দিয়ে পুনরায় পূজা করিয়ে তারপর সেই গাছ কাটা হয়।

চাম্বল ঃ এটি মাঝারী রকমের আঁশযুক্ত, শক্ত ও টেকসই। ভাল পালিশ দেওয়া যায়। আসবাবপত্র, নৌকা, ঘরের খুঁটি, দরজা-জানালাসহ কারুশিল্পের সূক্ষ ইত্যাদি কাজে বহুল ব্যবহার হয়। কাঠালী ও তেঁতো এই দুই প্রকারের চাম্বল পাওয়া যায়।

সুপারি ঃ সরু লম্বা এই গাছ। পরিবেশের সৌন্দর্য বর্ধনে এই গাছের তুলনা হয় না। এর কাঠ দিয়ে দাড়িপাল্লার বাট বানানো হয়। যা কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সহজ সৃষ্টি। এছাড়া নানা ধরনের সৌখিন কারুশিল্প তৈরি হয়ে থাকে। যা টেকসইও বটে।

দাতই ঃ পাহাড়ী অঞ্চলে এই গাছ জন্মে। পাহাড়ী জঙ্গলে এই গাছ এমনি এমনি হয়। এখন পর্যন্ত এই গাছের কোন চাষ হয় না। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এর কাঠের বিশেষ ধরনের আশ থাকে বলে 'মস্কা' বানানো সহজ হয়। কারুশিল্পীরা এই কাঠ দিযে 'মস্কা' তৈরি করেন।

তিলসু ঃ এই গাছ চাম্বল কাঠের অনুরূপ। মাত্র ৫০/৬০ বৎসর যাবত এর প্রচলন হয়েছে। এতে ভাল পালিশ রঙ দেওয়া যায়, বেশ শক্ত ও টেকসই। আঁশগুলি মোটা, রঙ হলুদে ও ক্রমে কালচে হয়ে যায়। ওজনে ভারী। ফুলদানি, নানা ধরনের স্ট্যান্ড, দরজা-জানালা ও আসবাবপত্রে এর ব্যবহার প্রচুর হচ্ছে।

নারিকেল ঃ নারিকেল কচি হতে পাকা পর্যন্ত সবাই খায়। বাংলাদেশের সাগর উপকূলে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। নারিকেল ছোবড়া হতে রজ্জু, মাদুর, পাতা হতে ঝাড় শলাকা এবং গাছ হতে খুঁটি, বাতা, নানা রকমের সৌখিন কারুশিল্প তৈরি হয়। যেমন হুক্কার ডাবা।

নাগেরশ্বর ঃ ইহা খুব শক্ত টেকসই কাঠ। রৌদ্র বা বৃষ্টিতে, পোকা বা ঘুনে সহজে নষ্ট করতে পারে না। ইহা দ্বারা পুলের খুঁটি, নৌকার পাটাতন, রেলের স্লিপার, তাবুর খুঁটি ও খোঁটা এবং অন্যান্য কারুশিল্প ইত্যাদি তৈরি হয়। এই কাঠ দুস্প্রাপ্য।

পলাশ ঃ পলাশের ফুল খুব সুন্দর কিন্তু গন্ধহীন। এর কাঠ খুব নরম এবং সাদা ও আঁশ মোটা, সাধারণ কাজে যেমন- দিয়াশলাই, নৌকা ও প্যাকিং এর কাজে ব্যবহার হয়।

ছাতানি বা ছাইতন ঃ এই গাছ খুব বড় হয়। কাঠ হলদে, সাদা, বেশ শক্ত, মসৃণ ও ঘন আঁশ। কাজ সহজ সাধ্য, এতে যে কোন জ্যামিতিক আকার দেওয়া যায়। ওজনে পাতলা। ম্যাচ বাক্সে, প্রতিকৃতি, মস্কা, কৃষিকর্মের যন্ত্রপাতি।

শাল ঃ শাল কাঠ সোজা হয়। কারিগরী কাজে এই কাঠ খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি খুব মজবুত, আঁশ মোটা শক্ত, কাঠ ওজনে বেশি ভারি। ভাল বার্নিশ ইহাতে করা যায় না, কিন্তু খুব মজবুত ও টেকসই বলে প্রায় সব কাজেই ইহা ব্যবহৃত হয়। এই কাঠ ঘরের চৌকাঠ, চালা, খুঁটি, পুল, রেলের স্লিপার, লঞ্চ ও স্টীমারের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সেগুন ঃ এই কাঠ আমাদের দেশে খুব কম জন্মে। বার্মায় ইহা প্রচুর পরিমাণে হয়। চট্রগ্রাম হতে যে সেগুন কাঠ পাওয়া যায়, ইহাও নানা কাজের জন্য প্রচুর ব্যবহার করা হয়। একে ভালভাবে মসৃণ ও পালিশ করা যায়। ইহা শক্ত, মজবুত, আঁশগুলি সরু ও মসৃণ, কাঠটি দেখতে হলুদ বর্ণ। ভালভাবে পানেট বা সিজন করা হলে এই কাঠ খুব কম ফাটে, দরজা-জানালা, আসবাব-পত্রাদি হতে আরম্ভ করে লঞ্চ-স্টীমার ও অন্যান্য যানবাহনদিতে প্রায় সব কাজেই এর ব্যবহার আছে।

গর্জন ঃ এর আঁশ মোটা, মজবুত কিন্তু পালিশ হয় না। খুব মজবুত বিধায় ইহা দালান কোঠার কাজে, খুঁটি ও চালা, মেঝে, আসবাবপত্র, রেলের স্লিপার ও মালগাড়ীর কাজে বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয়। অস্থায়ী কাজে এর প্রচুর ব্যবহার হয়। ইহা অতিরিক্ত গরমে ফাটে ও কুকড়ে যায়।

সুন্দরী ঃ সুন্দরবনে প্রচুর উৎপন্ন হয়। ইহা খুব শক্ত মজবুত টেকসই, আঁশ সূক্ষ্ম ও শক্ত, ভাল পালিশ দেওয়া যায়। দরজা-জানালা, নৌকা ও সর্বপ্রকার কাঠের কারুশিল্পের কাজে ইহা ব্যবহার হয়।

তুন ঃ এই কাঠ লাল। আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র, বাক্স-পেটরা, নৌকা, খেলনা, প্রতিকৃতি ইত্যাদি তৈরিতে ইহা ব্যবহার হয়। এর আঁশ ঘন কিন্তু সহজে যে কোন আকারে রূপ দেওয়া যায়। কাঠ বেশ মসৃণ ও নরম।

জারুল ঃ বিশেষ করে চট্রগ্রাম অঞ্চলে ও সিলেটে এই কাঠ প্রচুর উৎপন্ন হয়। এর রঙ লালচে সাদা, মজবুত ও টেকসই। দরজা, জানালা, খুঁটি, নৌকা, ঠেলা-গাড়ীর চাকা ইত্যাদি তৈরি হয়। সুন্দর আকর্ষণীয় কারুশিল্প সামগ্রী আসবাবপত্র, নৌকা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার হয়।

কুল ঃ এই বৃক্ষ থেকে বেশ শক্ত ও লালচে ধরনের কাঠ পাওয়া যায়। ইহাতে ভাল জ্বালানি কাঠ হয়। কৃষিকার্যের সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি, পাদুকা, খুঁটি ইত্যাদির কাজে ব্যবহৃত হয়। ওজনে বেশ ভারি।

কদম ঃ এর ফুল অত্যন্ত সুন্দর। কাঠ সাধারণতঃ হলদে-সাদা, আঁশ পাতলা, কাঠ শক্ত। দালান-কোঠার কাজে, দেয়াশলাই ও আসবাবপত্রে ব্যবহার হয়। বিভিন্ন ধরনের পুতুল যেমন নারায়ণগঞ্জের আশতোষের তৈরি হাতি, ঘোড়া, পুতুল ইত্যাদি এই কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। কাঠ নরম হওয়ায় যে কোন আকার আকৃতি কারুশিল্প বানাতে সহজ হয়।

চন্দন ঃ দেশের সিলেটের পাহাড় অঞ্চলে ও সুন্দরবনে এই কাঠ পাওয়া যায়। এই পানিসহ পাথরে ঘষলে মনোরম গন্ধ বের হয়। এই কাঠ নানা ঔষধ এবং ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহার হয়। ইহা সবচেয়ে দামী কাঠ এবং ওজনে বিক্রয় হয়। ইহার প্রত্যেক অংশ কাজে লাগে। এই কাঠ অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য। ছোট ছোট ব্যবহারপোযোগী গহনা তৈরি করা হয়।

অর্জুন ঃ এই প্রজাতির কাঠ বেশ শক্ত এবং ভাল পালিশ নেয়। জাহাজ বা নৌকার মাস্তুলের জন্য এর ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত।

গাব ঃ এ গাছ দেশের প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান। কাঠ মোটামোটি শক্ত। এর ফল হতে আঁঠা হয়। জেলেদের জাল রঙ করতে, নৌকার জোড়া ও ছিদ্র বন্ধ করতে গাবের আঠা ব্যবহার হয়। কাঠের হাতুরি বানাতে এ কাঠের জুরি নেই। এর কাঠ দিয়ে নানা রকমের কারুশিল্প পণ্য তৈরি করা হয়।

বেল ঃ বেল ফল পেটের অসুখ বা আমাশয়ের অত্যন্ত উপকারী। কাঠ হলদে রঙ এর বা একটু কালচে-সাদা। আঁশ বেশ শক্ত ও মোটা। কৃষিকার্যের জিনিস পত্র, কাঠের যন্ত্রপাতি ও হাতলের কাজে, নৌকা, ঠেলা গাড়ীর চাকা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার হয়। এর কাঠ ও পাতা হিন্দু ধর্মীয় কাজে ব্যবহার হয়।

শিশু ঃ পাহাড়ী উচ্চ ভূমিতে এই গাছ জন্মে। গাছ আকারে লম্বা এবং দেখতে বেশ সুন্দর। এটা খুবই শক্ত কাঠ। ভাল পালিশ নেয় না ও রঙ হলদে অথবা লালচে, কাল আঁশ, খুব মজবুত, কাঠ ভারী এবং টেকসই। মাল চলাচলের গাড়ী, নৌকা, আসবাবপত্র, খেলার জিনিসপত্র, বন্দুকের বাট, কৃষিকর্মের যন্ত্রপাতি, প্রতিকৃতি, পুল ও খুঁটি ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার হয়। সহজে পোকা বা ঘুন আক্রমণ করে না।

শেওড়া ঃ শেওড়া গাছের সাদা ও পাতলা কাঠ হয়। নরম আঁশ কিন্তু শক্ত ও নমনীয়। এই গাছের কাঠ থেকে নৌকা, ঠেলা গাড়ীর চাকা ইত্যাদি তৈয়ার হয়।

তেঁতুল ঃ তেঁতুলের চাটনির সঙ্গে কম বেশি সবাই পরিচিত। দেশের সর্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে। রঙ লালচে, আঁশগুলি শিথিল, কাঠ খুব শক্ত। ভাল জ্বালানি কাঠ, হাতল, কুষিকার্যের সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি, নৌকা, হাতুড়ী ইত্যাদি এই কাঠ দিয়া তৈরি হয়।

শিমুল ঃ এই গাছ আকারে বেশ বড় হয়। কাঠ নরম, পাতলা, সাদাটে, পাতলা আঁশ, পানিতে বিশেষ নষ্ট হয় না। এটা দ্বারা কোন বিশেষ শক্ত কাজ করা উচিত নয়। সাধারণতঃ নৌকা, প্যাকিং এর বাক্স, চা বাক্স, দিয়াশলাই শলাকা, কাগজ, মলাট ইত্যাদি তৈরির কাজে ব্যবহার হয়। এই গাছের তুলা দ্বারা বালিশ, তোশক, লেপ ইত্যাদি হয়।

তালগাছ ঃ "তালগাছ একপায়ে দাড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে" রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার লাইন কে না জানে। এই গাছ বাংলাদেশের নিসর্গকে করেছে সমৃদ্ধ। এই গাছের কাঠ দিয়ে ঘরের ডাব হয়। তাতে নানা ধরনের নকশা করা যায়। মুখোশ, বাট বা হাতল, ডিঙ্গি নৌকা বানানো যায়।

এছাড়াও যে সব কাঠ বাজারে পাওয়া যায় তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হলো-

চাম্বল ঃ	সুন্ধী চাম্বল	ডুমুর
	তিতা চাম্বল	বট
	কাঠালী চাম্বল	পাকুর
সাচি ফরাস ঃ	পানি পলাস বা	ভেন্না
	পানি বল্লাস	হিজল
কাসু ঃ	বইলম	উড়ি আম
	কড়ই	আমড়া
	চালিতা	কাফিলা
	কেওড়া	জিকা
	পুঁয়া	বাবলা
	বাদাম	সোনালু
	পিতরাজ বা	আমফল
	রয়না	কন-লিচু
	কৃষ্ণচূড়া	খয়ের
	ঝাউ	তাল
	বাইন	মেউ
	বাহেরা	মাদার
	হরতকী	পলাশ
	আমলকি	কাউ
	কাকরা	লটকা

৪.১.৩ কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উপযোগী কাঠ

পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপন শুরুর প্রাক্কালে মানুষ প্রকৃতির বিচিত্র উপাদান স্বকীয় প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে। এ সব উপাদানের মধ্যে গাছ অন্যতম। প্রাগৈতিহাসিক কালে লজ্জা নিবারণের জন্যে মানুষ ব্যবহার করেছে গাছের পাতা, গাছের ছাল। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে খাদ্য হিসেবে অবলম্বন করেছে গাছের

ফল। বন্য পশুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং নিজেদের নিরাপদে রাখার জন্যে গাছের খুঁটি, পাতা, লতা, গুল্ম দিয়ে তৈরি করেছে বাসস্থান। ধাতব অস্ত্র ব্যবহারের পূর্বে মানুষ পশুদের তাড়া করেছে গাছের ডালের তৈরি লাঠি দিয়ে। উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সহজেই অনুমান করা যায়, যেহেতু মাটি, ধাতব দ্রব্যাদি ব্যবহারের অনেক আগে থেকে মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনে গাছকে অবলম্বন করেছে, সেজন্য শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে নিজেদের যখন সম্পৃক্ত করেছে তখন উপাদান হিসেবে কাঠের ব্যবহার অনুপস্থিত থাকার কথা নয়।

গাছ আমাদের জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় বস্তু। পৃথিবীতে আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন অক্সিজেন, তার ভারসাম্য রক্ষা করে যাচ্ছে সবসময়। এ জন্য গাছ একটি মূল্যবান সম্পদ। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর মত গাছেরও প্রাণ আছে। একটি গাছ শিকড়, কান্ড, ডালপালা, পাতা, শিরা, উপশিরা, সেল, কান্ডের ভেতরে বাৎসরিক চাক, মেডুলারীরে, ছাল, আঁশ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়।

গাছ ও গাছের কাঠ ছাড়া সভ্যতার বিকাশ লাভ কল্পনাই করা যায় না। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশে বাতাসের প্রয়োজনীয় উপাদান অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, খাদ্য সরবরাহ, মাটিতে ও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ানো, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিও প্রাকৃতিক সম্পদ গাছ থেকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী প্রবাহিত অসংখ্য নদীর প্লাবিত উর্বর মাটিতে শাল (Sal Balla), সেগুন (Teak), মেহগনি (Mehogony), শিমুল (Shimul), কদম (Kodomba), গামারী (Gamar), কাঁঠাল (Jack), জাম (Jaman), আম (Mango), নিম (Neem), তাল (Palmyra), চাম্বল (Chambal), দেবদারু (Devdaru), কড়ই (Koroi), সাতানি বা সাইতন (Satin), বাবলা (Babla) ইত্যাদি বহুসংখ্যক গাছ জন্মে। এই গাছ থেকে মূল্যবান প্রয়োজনীয় কাঠ হয়। সেই কাঠ আমাদের কাঠের সামগ্রীর তৈরির ক্ষেত্রে বহুবিধ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কাঠ অন্যান্য প্রয়োজন মিটিয়ে মানুষের ঘরে শিল্প হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে কাঠ হলো সেলুলোজ লিগনিন ও হেমিসেলুলোজের সমন্বয়ে তৈরি শক্ত জৈব পদার্থ বিশেষ । সুতরাং যে কোন ধরনের উদ্ভিদের যে কোন অংশে এই তিনটি মৌলিক উপাদান একত্রে অবস্থান থাকলে উদ্ভিদের সেই অংশকে কাষ্ঠল অংশ বা কাঠ বলা যেতে পারে।[৬] খুব সহজেই এক বাক্যে বলা যায় দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ ও ব্যক্তবীজি উদ্ভিদের গৌণকলাকে (Secendary) কাঠ (Wood) বলা হয়।[৭] এই কাঠের কঠিন জমিনে খোদই করে সৃষ্টি করেছেন বিচিত্র স্বভাবের শিল্পসামগ্রী। যা বংশ বংশানুক্রমে নিরলস প্রচেষ্টায় সুনিপুণ দক্ষতার সাথে তারা বাংলার কাঠের তৈরি কারুশিল্প ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই শিল্পিরা অতি দরিদ্র কিংবা সাধারণ পরিবারের সদস্য। তারা জানেন কাঠের বুনো

স্বভাবকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বশে এনে কিভাবে শিল্প নির্মাণ করতে হয়। তারা কাঠকে কারুশিল্প নির্মাণ উপযোগী কাঠে পরিণত করেন। যে সকল গাছ থেকে কাঠ পাওয়া যায় সেই সমস্ত গাছকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৮] যেমন-

১. The naksed seeds, also know by the less accurate names of conifers (Conifer ঃ হচ্ছে সরল বর্গী বৃক্ষ, দেবদারু জাতীয় গাছ। এই জাতীয় গাছের কাঠ খুব নরম প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং এই গাছের পাতা চির সবুজ ও সূঁচালো হয়।) or con-bearing trees, evergreens, needle-leaved and soft woods, examples of this groups are: pines, cedars and red woods.

২. The two seeds leaves, more commonly known as broad-leaved trees, deciduous (Deciduous ঃ হচ্ছে এমন জাতীয় গাছ যার পাতা প্রতি বছরই ঝরে পড়ে যায় এবং নতুন পাতা গজায়) trees and hardwoods which shed their leaves annually. Examples of this group: oak, mahogany, maple and gum.

৩. The one seed leaves, such as the palms, yuccas and Bamboos. এই তৃতীয় শ্রেণীর গাছ ব্যাতিত অন্যান্য সকল গাছের সাহায্যে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের যাবতীয় কাজ করা হয়ে থাকে।

৪.১.৪ কাঠ সংগ্রহ

কাঠের কারুশিল্প তৈরিতে ব্যবহার উপযোগী কাঠ সংগ্রহ ও ব্যবহারে ছিল শাস্ত্র অনুযায়ী কাঠের নিয়ম। যে কোন কাঠ দিয়ে কারুশিল্প তৈরি রীতিসিদ্ধ ছিল না। তেমনি নিয়ম কানুন মেনে নিয়েই কাঠ সংগ্রহ করা হত। গাছ আমাদের পরিবেশের অংশ এবং মূল্যবান সম্পদ। এই মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গাছ থেকে প্রাপ্ত কাঠ অন্যতম। সেই আদিকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত কাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাছ থেকে কাঠ হয় এবং সেই কাঠ বহুবিধ ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য একজন কারুশিল্পী শিল্প তৈরির পূর্বে এর কাঁচামাল অর্থাৎ কাঠ সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামল, গ্রাম্য ভূ-প্রকৃতিতে গাছ বা কাঠ খুব সহজলভ্য উপাদান। বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে উদ্ভিদের যে অংশগুলো কাঠ হিসেবে ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহৃত হয় সে অংশগুলোই হলো কাঠ যেমন- সুপুষ্পক ও ব্যক্তবীজি বৃক্ষশ্রেণীর (Tree) গাছের কান্ডকেই কাঠ হিসেবে জানা হয়ে থাকে এবং সেই জন্যই কাঠকে অনেক সময় টিম্বার (Timber) বলা হয়।[৯]

কারুশিল্পের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কাজের প্রয়োজনীয়তায় সবজাতের কাঠ দিয়ে কারুশিল্প তৈরি করা যায় না। এজন্য কারুশিল্পীরা আঁশহীন নরম কাঠ যেমন- গামারী, সেগুন, আমড়া, হিজল, শ্যাওড়া, ছাতিম, আম,

কাঁঠাল, শিমুল, নিম, কড়ই, শাল, চাপালিশ, বাবলা, কদম, তুলা, মেহগনি এজাতীয় কাঠ দ্বারা কারুশিল্প পণ্য তৈরি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কাঠ সংগ্রহের জন্য তারা সবসময় আশ-পাশের এলাকায় খোঁজ করে গাছ কিনে রাখেন, যেন প্রয়োজন মতো সহজেই কাজে লাগাতে পারেন। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে "স-মিল" স্থাপন হওয়ায় "স-মিল" থেকেও কাঠের জোগান মেলে, তাও মিলের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে। পছন্দমতো কাঠ সংগ্রহের জন্য সেখানে কখনও কখনও অগ্রিম টাকা জমা রাখতে হয়। "টিম্বার যখন করাত দিয়ে চেড়াই করে বিভিন্ন বড় বড় আকারের ফালি দেয়া হয় তখন ফালিগুলিকে লাম্বার (Lumber) বলা হয়। সব লাম্বারই টিম্বার কিন্তু সব টিম্বারই লাম্বার নয়।"[১০]

কাঠ-চিরা ঃ গাছ কেটে রোদে বা বৃষ্টিতে ফেলে রাখলে স্বল্প কালের মধ্যে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য গাছ কাটার সঙ্গে এর চারপাশ ছেটে ফেলে গাছ থেকে একটি মোটামোটি বড় মোটা কাঠ তৈরি করে ফেলা হয়। কাটবার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন যতটুকু সম্ভব কম পরিমাণ কাঠ নষ্ট হয়। কাঠের যে মাথা শুকনা দিকে থাকে ওটাকে অনেক সময় গোবর মেখে রাখা হয়। কাঠের গুড়ির শাঁস কাঠের পক্ষে ক্ষতিকর। উপরোক্ত কাঠকে এমনভাবে কাটা উচিৎ যেন এটি মাঝামাঝিভাবে কাটা পড়ে। কাঠ করাত দিয়া কাটার সময় $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি পরিমাণ মত অংশ করাতের ফাঁকে আটকে গুড়ি হয়ে পড়ে যায়। এই জন্য প্রত্যেক তক্তা বা কড়ি বর্গা, বাতা ইত্যাদি কাটার সময় প্রয়োজনীয় মাপের চেয়ে কমপক্ষে $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি বেশি ধরে মূল কাঠে দাগ দিতে হয় এবং তারপর কাঠ উক্ত দাগের উপর দিয়ে কাটা হয়। মূল কাঠে বাকল বা বার না থাকাই উত্তম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একটি গাছ হতে এর প্রায় শতকরা ৫০ হতে ৬০ ভাগ কাঠ পাওয়া যায়।

প্রকৃত ও বাজার পরিমাপ ঃ প্রকৃত পরিমাপ যে কাঠ খন্ড পুরোপুরি প্রয়োজনীয় মাপে আছে তাকে প্রকৃত পরিমাপের কাঠ বলা হয়।

বাজার পরিমাপ ঃ বাজারে যে সব কাঠ পাওয়া যায় তার পরিমাপ করতে যে অংশ নষ্ট হয় ($\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি) তাও ধরা হয়। সে জন্য বাজার পরিমাপের কাঠে প্রয়োজনীয় মাপ হতে সাধারণতঃ $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি কম থাকে, উক্ত নিয়মকে বাজার পরিমাপ বলে।

বাজারে প্রচলিত কাঠের মাপ ও নাম

লগ ঃ গাছের কান্ডটিকে লগ বলা হয়। ইহা যে কোন ব্যাসের বা আয়তনের থাকে, যা থেকে প্রয়োজনীয় কাঠ বের করা হয়।

(Balk)-মূল কাঠকে (Squared log) balk বলা হয়।

তক্তা পাশে ৬ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি বা তদূর্ধ্বে, $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি মোটা ও লম্বায় ৬ ইঞ্চি হতে ১৫ ইঞ্চি বা তদূর্ধ্বে থাকে।

খুঁটি ৩ ইঞ্চি হতে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত পাশে এবং ১০ ইঞ্চি হতে উর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের পাওয়া যায়।

পাউড, আড়া, বগা কড়ি, বাতা ২ ইঞ্চি x ২ ইঞ্চি থেকে ৩ ইঞ্চি x ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত মোটা ও দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি বা তদূর্ধ্বে পাওয়া যায়।

পাতা বা পাত কাঠ বা বাটাম $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি হতে ১ ইঞ্চি x ২ ইঞ্চি হতে ৫ ইঞ্চি পর্যন্ত মোটা ও যে কোন মাপের লম্বা হতে পারে। এছাড়াও বাজারে ক্রেতা চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে বা মাপের কাঠ সংগ্রহ করতে পারেন।

দেশের সব অঞ্চলে সর্বধরণের কাঠ সহজলভ্য নয়, তাই শিল্পীরা হিজল, ছাতিম, শিমুল, নীম, আম, গামারী, কদম ও তুলা কাঠের উপর নির্ভরশীল। এলাকায় প্রয়োজন মতো গাছ পেলে তা কয়েকজন মিলে অথবা কেউ একা কিনে নেন। গাছ কিনে কাজ করায় তারা বেশ লাভবান হন, কারণ এতে গাছের সম্পূর্ণ অংশই কাজে লাগিয়ে থাকেন, যেমন- গাছের মূল কান্ড কেটে প্রয়োজনমতো দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও ঘনত্বের তক্তা বানিয়ে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের কারুপণ্য এবং গাছের কান্ড অর্থাৎ সরু অংশ মাপ মতো লম্বায় কেটে মাঝা-মাঝি ফালি করে কাঠের কারুশিল্প তৈরি করেন। গাছের বাকি অংশ যেমন সরু ডাল-পালা, পাতা ও কান্ডের অংশগুলো জ্বালানী হিসেবে এবং পারিবারিক অন্যান্য কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু গাছ কিনতে না পারলে "স-মিল" থেকে প্রয়োজনীয় কাঠ কিনায় বেশ চড়া দাম পড়ে, তাই তখন কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা বেশি করে কাজ করতে পারেন না।

কারুশিল্পীরা কাঠের পুতুল তৈরিতে বর্তমানে কদম কাঠ তুলা কাঠকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। তুলা ও কদম কাঠ বাংলাদেশে অতি সহজে পাওয়া যায় এবং দামে সুলভ। তাছাড়া তুলা গাছের সাধারণ ব্যাস (১৪ ইঞ্চি - ১৬ ইঞ্চি) পুতুল তৈরির কাজে খুব উপযুক্ত। তাই তুলাগাছসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য গাছ কিনে ভ্যান বা

ঠেলাগাড়ীতে করে বাড়ি এনে কোনটা কুড়াল বা করাত দিয়ে মাপমতো কেটে, কোনটা কুড়াল দিয়ে লম্ব-লম্বি, কোনটা মাঝখানে ফালি করে উঠোনের একপাশে রেখে দে'য়া হয়। কাঠ কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করা যায় না। কাঁচা কাঠ দিয়ে কারুপণ্য তৈরি করলে শুকানোর পর তা ফেটে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে ঘুনে ধরে, তাছাড়া কাঁচা অবস্থায় এগুলোতে রঙ করলে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কাঠের কারুশিল্প তৈরির জন্য বিভিন্ন গাছ বা গাছের শাখা অংশে কাজ করার পূর্বে তা পানিতে কয়েকদিন ভিজিয়ে পচিয়ে নেয়া হয়, তাছাড়া শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে কাঠকে মাপমতো কেটে বড় কড়াই বা পাতিলে পানির সাথে তুঁত মিশিয়ে জ্বাল করে নে'য়া হয়। তারপর রোদে ৭-১০ দিন শুকিয়ে চূড়ান্তভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এভাবে কাঠ পচিয়ে রোদে শুকিয়ে নেয়াকে "সীজন" বলা হয়। এভাবে কাঠ "সীজন" করার ফলে কারুশিল্প সামগ্রী দীর্ঘদিন পোকা মাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

৪.১.৫ কাঠ সংরক্ষণ

কাঠের কাজ সংরক্ষণ করবার জন্য যে যে নিয়ম আছে তার মধ্যে তিনটি নিয়মই বহুল প্রচলিত এবং স্বল্পব্যয়ে সমাধা হয়। যথা - আলকাতরা মাখান বা রঙ দেওয়া, পোড়ান এবং রাসায়নিক দ্রব্যে ডুবিয়ে নেওয়া।

১. আলকাতরা বা রঙ দেওয়া ঃ বিশেষ করে যে সব কাঠ মাটি বা পানির নিচে থাকে সেইগুলির মাটি বা পানির নীচের অংশে ভাল করে আলকাতরা ব্রাশ দ্বারা লাগিয়ে দেওয়া হয়। আলকাতরার সঙ্গে পিচ মিশিয়ে গরম করে দিলে ভাল হয়। দরজা-জানালা বা অন্যান্য কাঠের কাজ যা বৃষ্টিতে ভিজতে বা রৌদ্রে শুকাতে পারে তাতে ব্রাশ দিয়ে দুই বা ততো রংয়ের প্রলেপ দিয়ে দেওয়া হয়। বার্নিশ দিলেও কাঠ ভাল সংরক্ষিত হয়, এবং কাঠের মসৃণতা চাকচিক্য বৃদ্ধি করে।

২. পোড়ানো ঃ এটি একটি পুরাতন প্রচলিত প্রথা। কাঠের অংশে হালকা পুড়িয়ে নিলে উই পোকা ও ঘুন ধরার আশংকা খুব কম থাকে। অবশ্য এতে কাঠের শক্তি ক্ষয় হয়। ধোয়ার মাধ্যমেও কাঠকে পাকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

৩. রসায়নিক দ্রব্য যোগে ঃ ক্রিসটি তেল রঙ, সোহাগা ইত্যাদির মধ্যে ২৪ ঘন্টার মত কাঠকে ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর বাতাসে কাজে লাগান হয়। আমাদের দেশে কাঠে মেটে তেল দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। দূর্গন্ধময় এবং এর উপর কোনরূপ রঙ বা বার্নিশ দেওয়া চলে না। তবে মেটে তেল ব্যবহার করলে কাঠে সহজে উই পোকা বা ঘুণে ধরে না।

৪.১.৬ সময়োচিত করা (সিজিনিং)

কারুশিল্পীরা সাধারণত যেভাবে কাঠের কারুশিল্পের কাজ সম্পন্ন করে থাকেন তাতে অনেক প্রক্রিয়া না মেনেই তা করে থাকেন তাতে কৃত কারুশিল্পটি সম্পন্ন হয় ঠিকই কিন্তু তার দীর্ঘ স্থায়ীত্ব কমে যায় এবং খুব সহজেই কারুপণ্যটি নষ্ট হয়ে যায়। উপকরণগত ভাবেই কাঠ দীর্ঘ স্থায়ী নয় এবংমুক্ত আঙ্গিনার জন্যতো অবশ্যই নয়। বর্তমানে অনেক আধুনিক প্রক্রিয়ার গুণে কাঠ বেশ সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। একটি কাঠকে কারুশিল্পের উদ্দেশ্যে তৈরি করার পূর্বেই দেখে নিতে হবে কাঠটি কি প্রকারের এবং তা অবশ্যই সিজিনিং বা সময়োচিত করে নিতে হবে কিনা। অবশ্য সিজিনিং করা কাঠ পেলে আরো ভালো হয়। কারুশিল্প বিভাগের শিক্ষায়তনের বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা কঠের তৈরি কারুশিল্পে খোদাইয়ের পূর্বে সিজিনিং-এর ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়। কিন্তু একজন খোদইকার কারুশিল্পীর বেলায় এটা করা উচিৎ নয়।

সিজিনিং সাধারণত দুই ভাবে করা যায় তবে কাঠ এর তারতম্যের কারণে সময় কম বেশি লাগতে পারে। একটি প্রাকৃতিক ভাবে এবং অপরটি কৃত্রিমভাবে করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিকভাবে সিজিনিং করতে গেলে প্রথমত একটি গাছের খন্ড কেটে বা খন্ড করার পূর্বেও গাছের ডাল-পালা ছেটে নিয়ে মুক্তস্থানে রেখে দেয়া হয়। এভাবে প্রায় ১ বৎসর থেকে ২ বৎসর পর্যন্ত রাখা হয়। এতে করে বাতাস-রৌদ্র এবং বৃষ্টি এই তিনের সমন্বয়ে পর্যায়ক্রমে ক্রিয়া চলতে থাকে। তাতে করে কাঠের বস্তু পুঞ্জ বা দানা (গ্রেইন) বেশ শক্ত সামর্থ হয়। এরপর কাঠটিকে সুবিধেমত আকার করে নিয়ে কাজ শুরু করা যায়। উন্মুক্ত স্থানে বহুদিন ফেলে রাখা হয়। তাতে করে বাতাসের সংস্পর্শে থেকে ক্রমশঃ কাঠের জলীয় ভাগ কমে যায়। এইভাবে শুকানো কাঠে শতকরা ১২ হতে ৩০ ভাগ জল থাকে। আবার কাদা-মাটি-পানিতে কাঠের গাছের খন্ডটিকে ঢুকিয়ে রেখে সময়োচিত করা যায়। এতে করে কাঠের ভিতরে পানি প্রবেশ করে এবং কাদা-মাটিতে গাছের অসার অংশ মিশে গিয়ে শুধুমাত্র সার অংশ থেকে যায়। কাঠের ভিতরের কস বেরুতে পারে। তাতে কাঠ বেশ উপযোগী সামর্থ অর্জন করে এবং কাটার সময় বা খোদাই করার সময় সুবিধে পাওয়া যায়। কাদা-মাটি-পানিতে মোটামুটি ৬ মাস থেকে প্রায় ১ বৎসর পর্যন্ত রাখার পর গাছের খন্ডটিকে মুক্তস্থানে রেখে শুকাতে হয় তারপর সুবিধে মত খন্ড করে নিয়ে কাজ শুরু করা যায়। যে কাঠে সহজে ঘুণ বা পোকা ধরে না কাঠের তৈরি কারুশিল্প তৈরির ক্ষেত্রে সেই কাঠই ভালো। যে কাঠের আশ অত্যন্ত কড়া নয়, নরম আর সমান তবুও সে কাঠের সিজনিং করা দরকার। এর জন্য বহুদিন ধোওয়া লাগালে কাঠে পোকা ধরে না।

গাছ কাটার সময় হিসেবে শীতের ঋতুকে বেছে নিলে ভালো হয়। শীতের সময় গাছটিকে কেটে নিয়ে গুড়িটির উপর ও নিচের কাটা অংশে বাকাটিং-এর মুখে লেকার কালার লাগিয়ে রাখতে হয়। আমাদের

দেশে সাধারণত নালি, আলকাতরা ইত্যাদি দিয়ে লেকার কালারের কাজ সম্পন্ন করে থাকে বিকল্প হিসেবে। শীতের সময় শুকনো জলবায়ুর কারণে গাছের ভিতরের যে কষ থাকে তা বের হতে পারেনা এবং ভিতরেই থেকে যায়, যা কাঠের গ্রেইন বা দানার জন্য খুবই উপযোগী। কৃত্রিম পদ্ধতিতে বড় বড় কাষ্ঠ খন্ডের জলীয় অংশ কমিয়ে কাঠকে সকল ঋতুর উপযোগী স্থায়িত্ব প্রদান করায় হয় (সিজিনিং)।

কাঠগুলিকে ছাল মুক্ত করে প্রথমে ক্রিয়োজোট তেল ও লবণ জলে ভিজিয়ে পরে ৯০-৯৫ সেন্টিগ্রেড উত্তাপের সাহায্যে এর জলীয় অংশ দ্রুত বাহির করে দেয়া হয়। অবশেষে বাতাসের সংস্পর্শে শীতল করা হয়। এই পদ্ধতিতে শুকনো কাঠে শতকরা মাত্র ৪ থেকে ১২ ভাগ জল থাকে। আবার দেখা যায় যে, কাষ্ঠ খন্ডগুলিকে তেল এবং লবণ জলে ভিজিয়ে উত্তপ্ত বাষ্প ও উচ্চ চাপের সাহায্যে দ্রুত সিজন করা হয়ে থাকে।

৪.২ বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের করণকৌশল

দেখা যায় কারুশিল্প চর্চার ক্ষেত্রে সৃজনশীল গুণটির সাথে অভ্যস্ত প্রত্যক্ষভাবে উপকরণ ও প্রয়োগ এই দুই প্রশ্নই জড়িত। আইডিয়া প্রকাশ করতে যেমন দক্ষতার উপর নির্ভর করতে হয়, তেমনিভাবে কারুশিল্পীদের সৃজনশীলতাকে ব্যক্ত করতে উপকরণ ও প্রয়োগের উপর নির্ভর করতেই হয়। উপকরণ ও প্রয়োগ কারুশিল্পীর উদ্দেশ্যহীন বা বিচ্ছিন্ন কোনো সমস্যা নয়। কারুশিল্পীর সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটেছে কাঠোর অনুশীলন ও ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে উপকরণ ও প্রয়োগ-এর মাধ্যমে।

প্রতিটি কারুশিল্পীকে একেবারে শুরু থেকে এ সম্পর্কে সচেতন হতে হয়, সতর্ক হতে হয়। তার অন্যতম প্রধান কারণ বলা যায়-খুব স্বাভাবিক নিয়মে যার মধ্যে কারুশিল্প হবার উপাদান থাকে, তার মধ্যেই উপকরণ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ও দুর্বলতা থাকে।

সব সময় মনে রাখতে হবে, যিনি, অনেক দেখেছেন, দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের চর্চা করেছেন কারুশিল্প চর্চায় যার ব্যাপকতম অভিজ্ঞতা আছে যে কোন শিল্পীর সমস্যা যার কাছে সর্বদাই একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং সর্বপরি শিল্প বিষয়টি যিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন, তার পরামর্শে এবং তাকে অনুসরণ সব সময়ে চূড়ান্ত গ্রহণযোগ্য না হলেও অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বলা যায়। এই বিষয়টি বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রমাণিত, যেখানেই কাজটি হাতে কলমে করার প্রশ্ন রয়েছে, সেখানেই ব্যাপক অভিজ্ঞতার মূল্য সবচেয়ে বেশি। নিজে হাতে কলমে করা, অন্যকে করতে দেখা এবং উন্নত সৃষ্টি কর্ম অনুশীলন এ সব চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

অত্যন্ত সচেতন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, ভাঙ্গা গড়া, চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, ভুলত্রুটি ও সাফল্যের পথ ধরে একজন কারুশিল্পীকে প্রয়োগ পদ্ধতি রপ্ত করতে হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে লক্ষ করলেই দেখা যায়, একটি পেশাতে দীর্ঘকাল কোন অভিজ্ঞ লোকের কাছে অথবা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ হিসেবে থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষ কুশলী হতে হচ্ছে। চিকিৎসা, আইন, প্রযুক্তি থেকে যেখানে সামান্যতম কাজও হাতে কলমে করে বিদ্যাটি অর্জন করতে হয়, সেখানেই উপকরণ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্র অনুসরণ করতেই হয়।

৪.২.১ খোদাই প্রক্রিয়া

কারুশিল্পের ক্ষেত্রে যেকটি মাধ্যমে কাজ করতে হয় তা হলো মাটি, কাঠ, কাপড় ইত্যাদি প্রধান। কাঠ মাধ্যমে নানা ধরনের কারুশিল্প তৈরি করা হয়। পদ্ধতিগুলো প্রায় বিপরীত ধর্মী। কিন্তু এগুলোর যৌথতার সাহায্যেও একটি কাজ সম্পন্ন করা যায়। উপকরণ গত কারণে কাঠকে জোড়া দিয়ে এবং খোদাই করেও কাঠের কারুশিল্প নির্মাণ করা যায়। সে কারণেই কার্ভিং এর ব্যাপারে কিছু কথা বলে নেয়া ভালো, তাতে করে এ বিষয়টির মৌলিক দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কার্ভিং আবার কোন আকারকে দৃশ্যায়িত করার জন্য কঠিন কোনো পদার্থকে কেটে-ছেটে, ঘষে-মেজে কাংখিত রূপদান করা যায় সম্পূর্ণ বিয়োগ পদ্ধতিতে তবে তাকে কার্ভিং বলতে পারি।

কাঠ খোদই এর ব্যাপারে কার্ভিং গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। কারণ আমরা কারুশিল্প সম্পন্ন বা অনুশীলন যেভাবেই করিনা কেন, সবাইকে এর শ্মরণাপন্ন হতে হয়। একজন অভিজ্ঞ কারুশিল্পী তাকেই বলা যায় যখন কোন কাঠকে কোনো হাতিয়ার ব্যবহার করে, খোদাই করে, ছেটে-কেটে, কিছু বাদ দিয়ে প্রয়োজন মত একটি আকার-আকৃতি দেবে। তবে ব্যবহারিকভাবে বা প্রচলিত অর্থে দেখতে গেলে উপরে যে বর্ণনা দেয়া হলো, তা গ্রাহ্য হয় না। কারুশিল্পীরা কারুশিল্প বলতে বিশেষ কতকগুলো গুণকে বোঝান। যার অন্যতম একটি গুণ হল ঐতিহ্য অন্যটি সৃষ্টিশীলতা নতুন ফর্ম এর ব্যবহার। আমাদেরকে কাভিং সম্পর্কে সাধারণ স্বচ্ছ ধারণা রাখা প্রয়োজন। কাঠে কার্ভিং পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় বিপরীতধর্মী, তাই এর কাজ করার পথও ভিন্ন। কাঠকেই খোদাই এর উপকরণ হিসেবে বেছে নেয়া হয়। আমাদের দেশে কাঠ সহজলভ্য হওয়াতে কাঠকেই একমাত্র কার্ভিং-এর জন্য বেছে নেয়া হয়। কার্ভিং-এর পদ্ধতি অনেক কষ্ট সাধ্য এবং দূরহ।

কারুশিল্পীর বক্তব্যের বিশ্বস্ততা এসব উপকরণের কাধ্যমেই অনেকটা প্রস্ফূটিত। উপকরণগুলোর বস্তুগত স্বভাব কারুশিল্পকর্মকে প্রভাবিত করে। যেমন একটি কাঠ খন্ড শিল্পীর হাতুড়ি-বাটালীর আঘাত কিভাবে

কতটা সহজে সাড়া দেয় তার উপর কারুশিল্পের গঠন অনেকটা নির্ভরশীল। এ কারণেই কারুশিল্পীকে অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করে কাঠ বাছাই করে নিতে হয়। এগুলোর নিজস্ব স্বাভাবিক ঘনত্ব এবং আকৃতি আছে যা শিল্পকর্মকে প্রভাবিত করে। একজন কারুশিল্পী যখন কাঠ দিয়ে কাজ করেন, উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এদের সবার দায়িত্ব এক রকম নয়। প্রাচীন বাংলাদেশে এটা যেমন সত্য ছিলো, আধুনিক কালেও তা তেমনি সত্য রয়েছে।

কার্ভিং এর জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় সেটাও আবার খোদাই উপকরণে উপর নির্ভরশীল। যদি পাথর খোদাই হয় তবে যেমন বাটালী হাতুড়ী প্রয়োজন, আবার কাঠ খোদাই এর সময় ভিন্ন রকম যন্ত্রের প্রয়োজন। প্রাক-আয়োজন, কাজের পর্যায় ধরা এমনকি সংরক্ষণ পর্যন্ত ভিন্ন পদ্ধতির। আধুনিক যন্ত্রপাতির ফলে অনেকে নিত্য নতুন পদ্ধতিও পেয়ে যেতে পারে। তবে সাধারণত এই পরিবেশে এবং বাংলাদেশের মত গরীব দেশের কারুশিল্পীরা সাধারণত কুড়াল, করাত, বাটালী, রান্দা, বাইস ইত্যাদি হাতের সাহায্যেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। (১) হুয়িটলিং(Whitting) (২) চিপ কার্ভিং (Chip Carving) (৩) রিলিফ কার্ভিং (Relief Carving) (৪) মুক্ত খোদাই (Carving in the round) এই পদ্ধতি গুলো অনুসরণ করে কারুশিল্পে কার্ভিং করা হয়ে থাকে।

উড কার্ভিং বা কাঠ খোদই একটি প্রাচীনতম শিল্প মাধ্যম। এটা সহজেই বলা যায়, যে কেউ যদি জাদুঘরের সংরক্ষণ দেখে অথবা জনসাধারনের ব্যবহার্য আসবাবপত্র দেখে তবে কোনো প্রকার দ্বিধা না করে একমত হবেন এটি প্রাচীনতম মাধ্যম। কাঠ খোদাই প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. হুয়িটলিং (Whitting) ঃ চাকু বা ছুরি দিয়ে চেছে ফেলা বা চেছে ছোট করে তৈরি করা যায়। এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণভাবে একটি কাজ সম্পন্ন করা যায়। এটি অবশ্য হালকা এবং ছোট পরিসরের কাজের বেলায় সুবিধাজনক। অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

২. চিপ কার্ভিং (Chip Carving) ঃ কুচি কুচি করে কাটা বা অল্প অল্প করে খোদাই করা। এই পদ্ধতির বেলায় চাকু বা ছুরি, ছোট খোদাই বাটালী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাইশ ব্যবহার করে করতে হয়। সাধারণত ছোট কাজ বা জ্যামেতিক নকশার বেলায় এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

৩. রিলিফ কার্ভিং (Relief Carving) ঃ রিলিফ অর্থ "সমতল পৃষ্ঠ দেশ থেকে উচু করে করা মূর্তি বা নকশা।"[১১] একটি সমতল কাঠের উপর কোনো বিষয়কে উৎকীর্ণ করতে গেলে রিলিফ খোদাই

পদ্ধতিতেই করতে হবে। মোটামুটিভাবে নকশা করে ত্রিমাত্রিক এর কাছাকাছি যাওয়া যায়। এটাকে অবশ্য Low relief বলে। তবে এটা অবশ্যই পরিষ্কারভাবে উৎকীর্ণ হয়। যদি নকশা মোতাবেক আরো গভীরে যাওয়া যায় তবে তাকে high relief বলা হয়ে থাকে। সমতল পরিসরে কেটে কেটে এই পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ করা হয়ে থাকে।

৪. মুক্ত খোদাই (Carving in the round) ঃ এই পদ্ধতির কাজ খুবই চিত্তাকর্ষক এবং প্রতি পদক্ষেপেই অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে একটি ফ্রিষ্ট্যান্ডিং বা অনুরূপ মুক্ত আকারের বেলায় কঠিন হয়ে থাকে । সাধারণত এই পদ্ধতিকেই সকলে বেশ গুরুত্ব সহকারে দেখেন এবং এর জন্য কাজের পদ্ধতিতেও ভিন্নতা আছে।

৪.২.২ কাজের প্রক্রিয়া

কাঠের তৈরি কারুশিল্পের জন্য সাধারণত একটি কাঠের খন্ড দিয়ে কাজ করতে গেলে বিভিন্ন রকমের পর্যায় ক্রমিক একটি পথ অনুসরণ করতে হয়। দু'টি কাঠের খন্ডে কোন কারুশিল্প তৈরিতে তার একই শিল্পকর্মের গুরুত্বে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এক একটি কাঠের মাপের উপর এক একটি চিন্তা করেন এবং ভিন্নতার প্রভাব পরে। যখন কোন কাঠের গুড়ি পাওয়া যায়। তখন বেশ সাবধানের সাথে সেই কাঠের ইঙ্গিত বুঝে নিতে হবে। কারণ এক সময় সেই কাঠে কারুশিল্প তৈরি এবং প্রয়োজন মাফিক খোদাই কাজ করতে হবে এবং উপরের অসার বা পল বাড়তি কাঠ বাদ দিয়ে সার কাঠ এর আসল আকার বুঝে কাজ করতে হবে। সার কাঠ আর অসার কাঠের সংলগ্ন স্থানটি ভালোভাবে দেখে তার পর কাঠটি কাজের জন্য গ্রহণ করা ভালো নচেৎ কাজটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

একজন কারুশিল্পী মুক্তভাবে দাড়িয়ে থাকা কারুশিল্প তৈরির উদ্দেশ্যে চাহিদা অনুযায়ী একটি ছোট বা বড় কাঠের

গুড়ি বা খন্ড পছন্দ করতে হবে। সত্যিকার অর্থে-একটি মধ্যম আকারের কাঠের গুড়ি অথবা একটি বড় আকারের গুড়ি একজন নবাগত কারুশিল্পীর জন্যে ভালো হয় ছোট আকারের কাঠের খন্ডের তুলনায়। বড় গুড়ি বেশ ওজনধারী হয় যা নিজেই নিজের অবস্থানে গাঢ়ভাবে অবলম্বন হয়ে থাকে এবং কোনো পাত, কাঠের বাতার বন্ধন, খিল বা কাটা দ্বারা মেঝের টুল বা টেবিলের সাথে লাগাতে হয় না। বাটালী এবং হাতুড়ীর আঘাতে যে ঝাকুনি হয় তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বড় কাঠের ওজনের কারণেই হয়। বড় ধরনের কাঠ পরীক্ষামূলকভাবে এবং মহড়ার জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রাথমিকভাবে একটি কাঠের খন্ডকে অবলম্বন করে যদি একটি কারুপণ্য তৈরি করতে যায় তবে প্রথমেই কাঠটিকে কুড়াল বা বাটালি দ্বারা ভাল করে ছেটে নিতে হয়। তার পর ঐ আকার অনুযায়ী বাটালী দ্বারা খোদাই শুরু করি। তবে-প্রাথমিকভাবে বড় বাটালী এবং পরিসর অনুযায়ী ক্রমশ ছোট বা চিকন পরিসর বা সার্ফেস অনুযায়ী ক্রমশ ছোট বা চিকন বাটালী ব্যবহার করতে হয় এবং সব সময়ই লক্ষ রাখতে হয় যে কাঠের আঁশ যেদিকের নির্দেশে থাকে কারুশিল্পীকে ঠিক সেই নির্দেশ রক্ষা করে বাটালী চালাতে হয়, নতুবা ভাষ্কর্যের গাত্রের স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা যন্ত্রপাতির ক্ষতি হতে পারে। এমনকি কাজের ক্ষেত্রেও স্বাচ্ছন্দতা বিঘ্নিত হতে পারে। মোটামুটি এভাবেই কাজ করে যেতে হবে, তবে অবশ্যই ভুলে গেলে চলবেনা কাঠটি ছেটে নেয়ার পর সুন্দর এবং সুবিধমত উচ্চতার ভারি টুলের উপর ভাল করে কাটা বা বাইস দ্বারা লাগিয়ে নিতে হবে যাতে করে কারুপণ্যটি তৈরি এবং চাহিদা অনুযায়ী খোদাই করার সময় কাঠ খন্ডটি নড়ে বা সরে যায় এমন কি পরে না যায়। টুলস গুলোকে ভালোভাবে ধার ও টেম্পার করে নিতে হবে। কাজের শেষ পর্যায় উড ফাইল দিয়ে সার্ফেজ গুলো ভালোভাবে ঘষে নিতে হয়। ফাইলিং ছাড়াও গ্র্যান্ডিং মেশিন দিয়েও মসৃণ করা যায়। সবশেষে স্যান্ডিং বা শিরিষ দ্বারা ঘষে নিতে হয় এবং তারপর কাঠটিকে হালকা টেম্পার করতে হয় ভিতরের পানিকে বের করার জন্য। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনো প্রকার তাপের দরুণ কাঠটি ফেটে না যায়। এর পর কাঠটি পোকা বা আবহাওয়ার থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু ইমালসন লাগিয়ে নিতে হবে অথবা মোম পালিশ বা বার্নিশ করে নিতে হবে। তার পর বলা যায় চাহিদানুযায়ী কার্ভিং সম্বলিত একটি কাঠের তৈরি কারুশিল্প।

৪.২.৩ বাটালী

কাঠের কারুশিল্প তৈরির জন্য বাটালী টুলস হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগৃহীত কাঠ "সীজন" শেষে রোদে শুকিয়ে কাজ করার উপযুক্ত হবার পর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ কাঠ কেটে কাঠের কারুশিল্প তৈরির কাজ। এজন্য প্রয়োজন হয় বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাথরের ধারালো অস্ত্র ছিল যেগুলো দিয়ে মানুষ কাঠের অগ্রভাগ সরু করতো। মৌর্য যুগে কালের বিবর্তনে মানুষ কাঠের মতো নরম জিনিস কাটার জন্য মুষল, ষষ্টী, যুদগর, সলগ্নি ব্যবহার করত। পরবর্তীতে বৈদিক যুগে কাঠচেরাই এবং স্থাপত্য নির্মাণে ভাস্কর ও সূত্রধর সম্প্রদায় কুঠার, হাতুড়ী, করাত, আঁচাড়, বাটালী ইত্যাদি ব্যবহার শুরু করে। কাঠের উপর বিভিন্ন লাইন টেনে, কাঠকে সমতল রেখে তা থেকে কিছু অংশ কেটে বাদ দেয়া এবং কাঠ থেকে ছোট ছোট অংশ কেটে ফেলা এই ধরণের কাজের জন্য লোহার তৈরি $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, ১ ইঞ্চি, ২ ইঞ্চি চওড়া একধরণের চ্যাপ্টা ধারালো যন্ত্রকে বাটালী বলে। বর্তমান সময়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এই কাঠের

কাজে বিভিন্ন প্রকার বাটালী ও টুলস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঠের উপর নকশা কাটার জন্য অর্ধবৃত্তাকার, ঢালু, বিন্দু, সমকোনী, ছোট, বড় আকৃতির ইত্যাদিকে টুলস বলা হয়। পূর্বে কারুশিল্পীরা কর্মকার দ্বারা নিজের প্রয়োজন ও পছন্দ মতো এই বাটালী ও টুলস তৈরি করে নিতেন কিন্তু এখন বাজারে আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি বিভিন্ন কোম্পানির বাটালী ও টুলস পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ছিদ্র করার কাজে ব্যবাহৃত হয় ড্রিলিং মেশিন, ছেদক, প্যাচকী ইত্যাদি। এগুলো দিয়ে কারুশিল্পের প্রয়োজনে ছিদ্র করার সময় কাজে লাগে। কোন বড় কাঠকে নির্দিষ্ট মাপে কাটার জন্য করাত ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ইলেক্ট্রিক করাতের সাহায্যে কারুপণ্যের ড্রইং অনুযায়ী তক্তা থেকে এর মূল অংশ কেটে নেয়া হয়। কাঠ কাটার সময় বাটালীকে চাপ দেয়ার জন্য লোহার তৈরি হাতুড়ী ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কাঠের কারুশিল্প তৈরির ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম এই কাজে হাতুড়ীর পরিবর্তে কাঠের তৈরি হাতুড়ী ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও রয়েছে বাটালী ধার দেয়ার জন্য সান পাথর, সিরিষ পেপার সহ গৌজ, বাইশ, বাশলি, ছেনি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি। যার প্রতিটিই কোন না কোন কাজে ব্যবহার করা হয়।

কারু সামগ্রী তৈরির কাজ শুরু করার পূর্বে সবধরণের টুলস ও বাটালীগুলো সান পাথরে ভাল করে ধার দিয়ে নেয়া হয়। প্রতিদিন কাজ শেষে বাটালী, হাতুড়ী সহ সকল প্রকার যন্ত্রপাতি একটি কাঠের বাক্সে অথবা চটের ব্যাগে গুছিয়ে রাখা হয়, যেন কোন অসতর্কতার জন্য কারো হাত-পা না কাটে এবং ছোট এসব যন্ত্রপাতি হারিয়ে না যায়। এভাবে প্রতিদিন কাজ শুরুর পূর্বে বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলো ধার দিয়ে নেয়া হয় এবং সন্ধ্যায় সেগুলোকে যত্নসহকারে গুছিয়ে রাখা হয়।

৪.২.৪ নিরাপত্তা ও সাবধানতা

কাঠের কারখানা যথোপযুক্ত নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। নিরাপত্তা (Safety) বিধি-বিধান মেনে চলা ও অপরকেও চলতে উদ্বুদ্ধ করা সকলের কর্তব্য। সাবধানতা অবলম্বন না করার কারণে দূর্ঘটনা ঘটে। অপরদিকে, নিরাপত্তা বিধান মেনে চললে ছোট-বড় প্রায় সব ধরনের দূর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। নিম্নে এ বিষয়ে কতকগুলি পদক্ষেপ ও সতর্কতা উল্লেখ করা হলো। একজন কারুশিল্পীকে প্রথম থেকেই কিছু সাবধানতা রেখে চলতে হয়। কারণ একটু অসাবধানতার কারণে শ্রম সাধ্য কাজটি বিগড়ে বসতে পারে। যখনই একটি কাঠের কারুপণ্যের পরিকল্পনা করা হয় ঠিক তখন থেকেই চিন্তা করতে হবে কারণ কি আকৃতির কাজ করতে হবে এবং সেটা কোন ধরনের কাঠে করতে হবে। চাহিদামত আকার যাতে কাঠের পরিসরে স্থান হয়। সর্বপরি কোন ধরনের কাঠ দিয়ে কাজ করা যায় তা নির্ণয় করা। তাতে করে সুন্দর কাজের স্বচ্ছলতা নতুন মাত্রার দিক পাওয়া যাবে।

- যে কাঠটিকে কাজের জন্য বেছে নেয়া হবে তা ঠিক মত সিজন করা হয়েছে কিনা তা পরখ করে নেয়া। তাতে করে ভবিষ্যতে কাঠটি হতে তৈরিকৃত কারুপণ্যটির অতি সহজেই নষ্ট হওয়ার বা বেকে যাওয়ার সম্ভাবনামুক্ত হয়।

- কাঠের কোন অংশ বা কোন স্থান ভেঙ্গে যেতে পারে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তা পরীক্ষা বা পরখ করে নেয়া। তাতে কাজ করার সময়ই ঐ অংশকে সুন্দরভাবে আয়ত্বে আনা যাবে। কাঠের ভিতরের ছিদ্র বা পচে গিয়ে ফাঁকা হয়ে যায় তা অবশ্যই অনুমান করে নিতে হবে এবং কাজ করার সময় তা দেখা গেলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- কাঠ খোদাই এর যন্ত্রপাতি (টুলস) বা হাতিয়ার ব্যাবহারে অবশ্যই কিছু সাবধানতা মেনে চলা ভালো। সাধারণত খোদাই করার সময় ৬০° থেকে ৩০° কোনাকোনি রেখে কাঠ খোদাই করা হয়ে থাকে। কখনই খাড়া বা ৯০° কোনাকোনি বাটালী চালানো যাবে না কারণ এতে বাটালী কাঠের গভীরে সরাসরি প্রবেশ করে যায় এবং অবশেষে কাঠের পাত্র থেকে ছড়িয়ে নেয়া বেশ কষ্টকর হয়ে উঠে এমন কি শক্তি প্রয়োগের ফলে বাটালী ভেঙ্গেও যেতে পারে।

- হাতুড়ী ব্যবহারেও বেশ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ অনেক সময় বাটালীর উপরে ঠিকমত আঘাত না হয়ে হাতের উপর পড়তে পারে তাতে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে হাতুড়ীর আঘাত স্থান বেশ বড় আকারের নিতে হবে এতে করে সহজেই বাটালীর বাটের অংশ কোনো ক্রমেই হতুড়ীর আঘাতের অংশের বাইরে পড়বে না। বাটালী এবং হাতুড়ী এমন কি উড ফাইল এবং কুড়াল দিয়ে কাজ করার সময় হাতে ভালো হাতমোজা (glove) পরে নিতে হবে। তাতে হাতে ফোসকা পড়া এবং দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

- কারখানায় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল মেশিন ও যন্ত্রপাতি বসাতে হবে। মেশিন, যন্ত্রপাতি, ওয়ার্কটেবিল, কাঠ ও যাবতীয় মালামাল সর্বদা পরিষ্কার ও গুছানো থাকবে।

- হাতুড়ীর বাট সুবিধে মত ছোট বড় করে নিতে হবে তাতে করে যে হাত দ্বারা হাতুড়ী ধরে রেখে কাজ করা হয় সেই বাহু বাটের আঘাত থেকে মুক্ত থাকে।

- কাজ করার সময় অবশ্যই মুখোশ (মাস্ক), অ্যাপ্রোন ব্যবহার করা ভালো। চোখে গ্লাস বা ট্রান্সপারেট চোখ বন্ধনি ব্যবহার করা উচিৎ।

- যে সব বাটালী (চিজেল) ব্যবহার করতে হবে তা কাঠের পরিসর বুঝে বিভিন্ন প্রকার মাপের বাটালী ব্যবহার করতে হবে। এতে করে কাজের পরিসরটি স্বচ্ছ থাকে।
- ঢিলা হাতুড়ি, বাটালি বা অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক।
- কোনো ক্রমেই আঁশ এর দানার বিপরীত দিকে বাটালী চালনা করা যাবে না।
- যন্ত্রগুলির মধ্যে যে সব যন্ত্র ধার করে নিতে হয় সে গুলোর প্রতি সব সময়ই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ধার নষ্ট হয়ে গেলে তা পরখ করে পূনরায় ধার করে নিতে হবে। সঠিক কাজের জন্য সঠিক টুল ব্যবহার করা।
- খোদাই প্রক্রিয়া বা মূল কাজ করার গতি এবং ধারার উপর বিষয় গতভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখা।
- কাজ শেষে বা খোদাইয়ের শেষের দিকে ফাইলিং করার সময় যাতে আশানুরূপ সার্ফেজ, লাইন বা প্রফাইল নষ্ট না হয়ে যায়।
- শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘষে নেয়ার সময় সজাগ থাকা কারণ বিভিন্ন রকমের কাগজ আছে বিভিন্ন মাপের। তাকে সঠিক ভাবে বেছে নিতে হবে।
- পুটিং, প্লাষ্টিক উড, কোমল ব্লিচিং, স্যেল্যুশন, মোমপালিশ, ডেনিস তেল ইত্যাদি এবং তারপিন ও লিনশিড লাগানোর সময় আনুপাতিক হার এবং আনুপাতিকভাবে গরম করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে অবশ্যই সাবধানতা আবশ্যক।
- কাঠকে শুকিয়ে নিয়ে জলীয় আবহাওয়া মুক্ত করতে হবে। কি পরিমাণ শুকালে মোটামুটিভাবে চলবে তার উপর দৃষ্টি এবং অনুমানে সাবধান থাকতে হবে।
- কখনো খালি পায়ে হাটাহাটি না করা।
- হাতার লম্বা আস্তিন বা নেকটাই পরে মেশিনে কাজ করা উচিত নয়।
- অতিরিক্ত ভারি কাঠ বা মালামাল একা তুলতে যাওয়া উচিত নয়। ভারি ওজন হঠাৎ উঠাতে গেলে মেরুদণ্ডে বা পেটে ক্ষতিকর আঘাত লাগতে পারে। আবার নামাবার সময়ও দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রয়োজনমত অন্যের সাহায্য নেয়া উচিত।

- প্রত্যেক কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর সুন্দর জায়গায় রাখা ও প্যাকেট করার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে কারণ দৃষ্টিগত কারণে কজের সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

- এদেশে আধুনিক প্রয়োজনীয় মেশিনে সিজিনিং ট্রীটমেন্ট করে কাঠকে উন্নত ও দীর্ঘ জীবন দেয়া যেতে পারে। আধুনিক সিজিনিং ও ট্রীট মেন্টের মাধ্যমে প্রচলিত আয়ষ্কালের ১০/১২ গুণ সময়কাল কাঠের জীবন শক্তি পাওয়া যাবে।

- যথোপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা(first aid) হাতের কাছেই রাখতে হবে।

- কাঠের কুঁদা (ব্লক) কাঠের গুড়ি বা স্থুল কাষ্ঠখণ্ড এবং কাটা প্রশস্ত কাঠের তক্তা (প্লাঙ্ক) কাঠের কারুশিল্পের জন্য গ্রহণ করার পূর্বে তা সঠিক ভাবে বুঝে নিতে হবে এবং সম্ভাব্য যে সকল দোষ-ক্রটি কাঠের ভিতরের বস্তুপুঞ্জে আছে তা থেকে কাঠকে মুক্ত করে নিতে হবে। কাঠের ভিতর দোষ এবং ক্রটিপূর্ণ থেকে যায় সে ক্ষেত্রে দোষ ও ক্রটিপূর্ণ অংশ অবশ্যই কেটে ফেলে দিতে হবে সব সময়ই। অনেক সময় পূর্ব থেকে কিছু কাঠের ভিতরের ব্যাপার জানা অসম্ভব কাঠের নির্দিষ্ট অংশে ক্রটিপূর্ণ ফাটল বা ছিদ্র (ফ্লু) হয়ে থাকে, তখন অনেকে তা প্রদর্শন করে থাকে বা সেটাকে সৃষ্টিশীল কারুপণ্যের অংশ হিসেবেই উপস্থাপিত করে থাকে। যদি কাঠের জোর, শক্তদানা অথবা রঙ-এ স্বতন্ত্রই দুইটি স্তর থাকে তবে এগুলিকে কারুশিল্পে প্রাকৃতিক ফর্ম হিসেবে কাজে লাগানো যায় এবং ফল হিসেবে কারুশিল্পীকে স্বভাবতই সাহায্য করে। সাধারণ পরিকল্পনার জন্য কাঠে কিছু কিছু দানা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে চিহ্ন বা মার্কিং এর ক্ষেত্রে কাজে লেগে যায়।

- কাঠে রঙ করবার জন্য অনেক সময় যে মেথিলিন ক্লোরাইড সলভেন্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা শরীরের জন্য খুবই মারাত্মক ক্রিয়া করে থাকে।

- কাঠের কাজে ব্যবহৃত আঠাও অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ংকর ক্ষতিকর। এপকসি গ্লু বা আঠার সংস্পর্শে শরীরের চামড়ায় এ্যালার্জি হতে পারে। নিঃশ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশের কারণে এ্যাজমা এবং ফুসফুসের নানাবিধ অসুবিধা হতে পারে। ফরমালডিহাইড রেজিন গ্লু বা আঠা চামড়া ও শ্বাসযন্ত্রের ক্ষতি ও এ্যালার্জির কারণ হয়ে থাকে। সাদা গ্লু বা আঠা এবং ওয়াটার বেজ গ্লুই হচ্ছে অন্যান্য গ্লু বা আঠার চাইতে ঝুঁকিমুক্ত।

৪.৩ রঙের ব্যবহার ও নকশাচয়ন

৪.৩.১ রঙ

রঙ এক ধরণের অনুভূতি। প্রতিটি রঙ এর আলাদা আলাদা আবেদন আছে। সূর্যের আলো এর উৎস। ''রঙ প্রধানত ঃ হৃদয়াবেগব্যঞ্জক''[১২] "রঙ ছবিতে ভাবাবেগের ব্যঞ্জনা দেয় শুধু।"[১৩] অর্থাৎ রংয়ের সঙ্গে মানুষের অনুভূতি ও ভাবাবেগের একটা নিবিড় সংযোগ তৈরি হয়। নানারকম রঙ ভিন্ন ভিন্ন মানষিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে কাঠের উপর কারুশিল্পী যখন নির্বাচিত রঙ এর মাধ্যমে তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন, তেমনি দর্শক ক্রেতার মনেও সেই ভাবটি কারুশিল্পের মাধ্যমে রঞ্জিত হয়। যদিও কাঠের কারুশিল্পে বিভিন্ন রঙ এর ব্যবহার কম।

৪.৩.২ রঙ প্রস্তুত

অনেক বছর ধরে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পে রঙ দেয়ার যে প্রচলিত রীতি তা এখন অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন এসেছে। অবশ্য পরিবর্তনের কারণে সহজ হয়েছে। আরও পূর্বে কারুশিল্পীরা নিজেদের হাতে তৈরি রঙ ব্যবহার করতেন। আমাদের অতি পরিচিত লোকশিল্পের প্রাথমিক রঙগুলো যেমন - লাল, নীল, হলুদ এছাড়াও সবুজ এবং সাদা, কালো ইত্যাদি সেই প্রথম থেকেই কারুশিল্পীরা ব্যবহার করে আসছে। তারা আগে নিজেদের হাতে তৈরিকৃত রঙ ব্যবহার করতেন। তেঁতুলের বিচির গুড়া সিদ্ধ করে আঠা বা লেই প্রস্তুত করে। এই লেই এর সাথে সহজ লভ্য হরিতক, গিরিমাটি, হিঙ্গল, প্রভৃতি খনিজ ও জৈব পদার্থগুলো মিশিয়ে তারা বিভিন্ন রঙ তৈরি করতেন। এছাড়াও সাবুদানা, বার্লিগুড়া পানির সাথে মিশিয়ে ভাল করে সিদ্ধ করে লেই তৈরি করে তার সঙ্গে বিভিন্ন গাছের ছাল, পাতা, বিচি ও শিকড় ছেকে এর রস ও প্রাকৃতিক ভেষজ রঙ মিশিয়ে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো ও সাদা রঙ তৈরি করতেন।[১৪]

রঙ আমরা দুই উপায়ে পেয়ে থাকি (১) প্রকৃতি থেকে এবং (২) রাসায়নিক উপায়ে ''প্রকৃতি থেকে যে রঙ পাওয়া যায় তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয খনিজ, উদ্ভিজ ও প্রাণীজ।''[১৫]

খনিজ, উদ্ভিজ ও প্রাণীজ রঙ এর বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো। 'খনিজ খড়িমাটি থেকে সাদা রঙ। এলে মাটি থেকে উজ্জ্বল ও মেটে দুরকম হলুদই পাওয়া যায়। গেরিমাটি থেকে গেরুয়া লাল পাওয়া যায়। সবুজ টেরাভার্ট গ্রীণ রাজাবর্ত পাথর থেকে নীল এছাড়া গন্ধক হরিতাল প্রভৃতি পাওয়া যায়।

উদ্ভিজ বা জৈব ঃ ত্রিফলা থেকে কালো, তুঁত থেকে নীল, হিঙ্গল থেকে লাল মেহেদি তাছাড়াও বিভিন্ন গাছের রস ও আঠা থেকে রঙ পাওয়া যায়।

প্রাণীজ ঃ সমুদ্রের লাক্ষা পোকা থেকে লাল। শঙ্খ ও শামুক থেকে সাদা ইত্যাদি রঙ পাওয়া যায়।[১৬] প্রাচীন কাল থেকে কাঠে রং দিয়ে নকশা ও চিত্র অংকনের সূচনা হয়। দরজা, আসবাব এবং নানা রকম কাঠের কারুশিল্পে বাটালি দিয়ে খোদাই করা নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য রং করা হয। কখনও কাঠে সরাসরি তুলি দিয়ে রং করে চিত্র অংকন করে। বাংলাদেশে কাঠের পুতুল, খেলনা বিভিন্ন কারুশিল্পে রং দিয়ে নকশা ও চিত্র অংকনের রীতি আছে। তেঁতুল বিচির গুড়া পানিতে সিদ্ধ করে লেই বানিয়ে এর সাথে গিরিমাটি, হরিতকী, নীল, হিঙ্গল, চকখড়ি ও ভূসাকালি মিশিয়ে সাদা-কালো, লাল, হলুদ, নীল ইত্যাদি তৈরিকৃত রঙ কাঠে ব্যবহার করে। অনেকেই কাঠের উপর সরাসরি পেন্সিল একে বা ট্রেসিং করে অথবা বাটালী খুঁদে রিলিফ নকশার উপর রঙ করে থাকে। বাংলাদেশে চৈত্য রথ, ঐতিহ্যবাহী কাঠের পুতুল, ঘোড়া, হাতি, বাঘ বেড়ায় রঙের চিত্রাঙ্কন পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ধারার এই রঙ পদ্ধতি বাংলাদেশের কারুশিল্পীদের মধ্যে বংশপরম্পরায় দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে। এই অলিখিত ভেষজ জ্ঞানের পদ্ধতিটি তারা তাদের জীবন ও প্রকৃতি থেকে নিয়েছেন। এই শিক্ষা যুগ-যুগ ধরে ব্যবহারিক জ্ঞানের অভিজ্ঞতায় এবং দক্ষাতার পরিসীমায় একটি লোকজ ধারায় পরিণত হয়েছিল। তাই এই পদ্ধতিটি অলিখিত হলেও শত-শত বছর ধরে বহুল প্রচলিত। কালের বিবর্তনে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় কাঠের কারুশিল্পে রঙ করার পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। তারই ধারাবহিকতায় তাদের বংশপরম্পরায় চলে আসা কাঠের কারুশিল্পে রঙ করার প্রাচীন পদ্ধতিতে ঘরে তৈরি রঙের পাশাপাশি বর্তমানে তারা বাজারে আসা রাসায়নিক রঙ ব্যবহার করছেন। কারুশিল্পীদের স্বকীয় রঙ তৈরির প্রক্রিয়াটি বাদ দেয়ার কারণ হলো, আবাসন ও অন্যান্য কারণে বন ধ্বংস হচ্ছে, গাছ ধ্বংস হচ্ছে এই ধ্বংস হওয়া মানে গাছের অভাবনীয় হ্রাস পাওয়া। এ প্রেক্ষিতে দেশের প্রাকৃতিক ঔষধি গাছের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। এককথায় অতি

সহজে রঙ তৈরি করার মতো প্রয়োজনীয় গাছ এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। অতি কষ্টে পাওয়া গেলেও সময়ের অপচয় হয়। সেদিকথেকে সহজে বাজার থেকে সব ধরণের রঙ একত্রে পাওয়া যায় বিধায়, এখন ভেষজ প্রক্রিয়ার চেয়ে বাজারী রঙের দিকে বেশি আগ্রহী হয়েছেন। এই যে সব রঙ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় তাকে রাসায়নিক রঙ বলে।[১৭]

এখন যে সমস্ত রঙ আমরা বাজার থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য কিনে আনি তা সবই রাসায়নিক বা সিনথেটিক এনামেল রঙ। "রঙ বস্তুর অস্তিত্ব বহন করে। রঙ বস্তু বা ছবির অবিচ্ছেদ্য অংশ।"[১৮] রঙের উৎপত্তির কারণ হলো আলো। আলো ও রঙ না থাকলে এই পৃথিবী বর্ণহীন জগতে পরিণত হতো। আমাদের চারিদিকের সকল বস্তুই রূপ ও রঙের জন্য দৃশ্যমান তাই রঙ ছাড়া কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ লাগে না। কাঠে কোন অবয়ব বা ডিজাইনকে বাটালী দ্বারা খোদাই করে অথবা রেকি বা ভি- বাটালী দ্বারা রেখার সাহায্যে প্রস্ফুটিত করে পরবর্তীতে রঙের জন্য প্রস্তুত করা হয। কারুশিল্পের গড়ন এক্ষেত্রে আলোছায়া ছাড়াই সরাসরি রঙের মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর হয়।

রেখার সাহায্যে গড়ন আঁকার পর ঘের দেওয়া অংশে রঙ দিলে বস্তু আরো স্পষ্ট ও সুন্দর হয়। ''রঙ যখন সমৃদ্ধ ও বৈভবশালী, গড়ন তখন পরিপূর্ণ ও প্রাচুর্যময়।"[১৯] কাঠের কারুশিল্প ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়। দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখার জন্য কাঠের কাজ শেষ হয়ে গেলে তাতে রঙ অথবা বার্নিশ লাগিয়ে দেওয়া আবশ্যক। পানি, রোদ, উষ্ম-আর্দ্রতায় কারুপণ্য যেন নষ্ট না হয এবং পোকা বা ঘুণের হাত থেকে রক্ষার জন্য রঙ বা বার্নিশ লাগানো হয়। অন্যকে আকর্ষণ করার জন্য এই রঙ বা বার্নিশ ব্যবহার করে কাঠের কারুশিল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।

যে সমস্ত রঙের মধ্য দিয়ে কাঠের নিজস্ব রঙ বা আশ কিছুই দেখা যায় না। ''রঙ বা পেইন্টের একাধিক আস্তরণ দিতে হয়। প্রথম আস্তরণের ফলে পেইন্টের কোন ঔজ্জ্বল্য থাকে না। একে বেস বা ফ্ল্যাট পেইন্ট বলে।"[২০] পছন্দনীয় রঙটি নির্বাচন করে প্রথমবার দিলে ঔজ্জ্বল্য আসে না। এমনি ভাবে দ্বিতীয় ধাপ এবং সর্বশেষ ধাপে রঙটি ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয। বাজারে সীল করা টিনের পাত্রে এনামেল পেইন্ট সহজেই পাওয়া যায়। ঝামেলাহীন এই নির্বাচিত রঙ সংগ্রহ করে সরাসরি ব্রাশের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। ঘন হয়ে, গেলে পাতলা করার জন্য থিনার মিশানো হয়। এতে প্রয়োগে কাঠের কারুশিল্পের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।

৪.৩.৩ রঙ করার পদ্ধতি

রঙ বা পেইন্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ প্রয়োজন। ব্রাশ দিয়ে প্রথমে খাড়াভাবে অতঃপর আড়ে রঙ করতে হয়। প্রথম রঙ দেওয়ার পর ভালভাবে শুকানোর পর দ্বিতীয় কোট (coat) বা আস্তরণ দিতে হয়। ফলে কাঠের উপর দেওয়া রঙ এর চাকচিক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম রঙ দেওয়ার আস্তরকে ফার্স্ট কোট বা প্রাইমিং (priming) বলে। কখনও কখনও চাকচিক্য ভাব দুর করার জন্য চাহিদা অনুযায়ী শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষতে হয়। ঘষার পরে ম্যাটমেটে সুন্দর বৈশিষ্টের রং তৈরি হয়। পেইন্টিং করার জন্য ব্রাশের

পরিবর্তে স্প্রে মেশিন ব্যবহার করা হয় পেইন্টিং-এর ভালো ফিনিশিং দেয়া যায় বলে বর্তমানে স্প্রে গান ব্যবহার বেড়েছে। এই পদ্ধতি স্বভাবতই সহজতর। বড় ও অনেক বেশি পণ্য পেইন্ট করার ক্ষেত্রে স্প্রে পেইন্টিং নিঃসন্দেহে ভালো। এতে সময় এবং খরচ দুই বাচবে। স্প্রে করার সময় প্রথম কোট ভালোভাবে শুকানোর পর, পরের কোট দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও কাঠের জমিন খুব ভালভাবে প্রস্তুত করে প্রয়োজনমত স্প্রে করলে রঙের মসৃণতা ভালো হবে।

১. তুলি

রঙের সঙ্গে তুলির সম্পর্ক নিবিড়। রঙের মাধ্যম অনুযায়ী তুলির প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। তুলি সাধারণত দুই প্রকার হয়। (১) ফ্লাট ব্রাশ (২) রাউন্ড ব্রাশ। কারুশিল্পীদের এই দুই প্রকার তুলি রঙ করার জন্য প্রয়োজন হয়। কাঠের তৈরি কারুশিল্পকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলার জন্য সেই প্রাচীন কাল থেকেই রঙ ব্যবহার করা হয়। আর এই রঙ ব্যবহারের সামগ্রী তুলি, শিল্পীরা নিজ হাতেই তৈরি করেন। যুগ-যুগ ধরে কারুশিল্পীরা বাঁশের কঞ্চির সাথে সুতি কাপড় ভাজ করে কোণা তৈরি করে বেঁধে একপ্রকার বিশেষ ধরণের তুলি তৈরি করেন, এছাড়া ছাগলে লোম দিয়ে সূক্ষ্ম এবং ঘোড়া ও মহিষের লোম দিয়ে মোটা তুলি তৈরি করেন। সুতি নরম কাপড় কঞ্চির সাথে বিশেষভাবে পেচিয়ে শিল্পীরা তা মোটা তুলির মতো ব্যবহার করেন। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ায় পুরানো ধাঁচের তুলি বাদ দিয়ে আজ অনেকেই বাজারের আধুনিক তুলি ব্যবহার করছেন। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম লাইন ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাদের হাতে ছাগলের লোম দ্বারা তৈরি চিকন তুলিই ব্যবহার করেন। কারণ, বাজারে তৈরি তুলিগুলো দিয়ে বেশি সময় ধরে অতি সূক্ষ্ম লাইন ও ডিজাইন করা যায় না। বাজারের তুলিগুলো অতি সহজে ছিড়ে যায় এবং তুলির অগ্রভাগ ফেটে যায়, যা সূক্ষ্ম কাজের পরিপন্থী। কিন্তু তাদের হাতে ছাগলের লোম দ্বারা তৈরি বিশেষ ধরণের তুলিগুলোর অগ্রভাগের সূক্ষ্মতা কোন অবস্থাতেই নষ্ট হয় না। যে কারণে একটি তুলি দিয়েই তারা দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করতে পারেন। কারুশিল্পীরা এসমস্ত তুলি ব্যবহার শেষে প্রতিদিন কেরোসিন দিয়ে ভাল করে ধুয়েমুছে বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে রেখে কাঠের খিল দিয়ে চোঙ্গার মুখ বন্ধ করে করে ঘরের এক কোণে সূতা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখেন। মেলার কাজ শেষে এগুলো একইভাবে পরিষ্কার করে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে চোঙ্গার রেখে হাতুর, বাটালের সঙ্গে একত্রে কাঠের বাক্সে অথবা চটের ব্যাগে যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করেন।

২. বার্নিশ

বার্নিশের মধ্য দিয়ে তার পিছনের বস্তু বা অন্য রঙটিকে দেখা যায়। স্বচ্ছ এই আস্তরণ কাঠকে সম্পূর্ণ ঢাকে না বরং কাঠের পৃষ্ঠ ও আঁশ বিন্যাসকে আরও সুন্দর ও মসৃণ ভাবে ফুটিয়ে তোলে। যেহেতু বার্নিশ স্বচ্ছ সেহেতু কাঠের কারুশিল্পের জমিন শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে মসৃণ করতে হয। লক্ষ্য রাখতে হবে ভার্নিশের প্রলেপ যেন পুরু না হয়। সাবধানে বার্নিশ দিলে কাঠের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য আকর্ষণীয়, যা সবাইকে আকৃষ্ট করবে। সাধারণত তিন প্রকার বার্নিশ প্রচলিত।[২১] যেমন -

ক. তেল বার্নিশ (Oil Varnish)
খ. স্পিরিট বার্নিশ (Spririt Varnish)
গ. পানি বার্নিশ (Water Varnish)

আমাদের দেশেরে কারুশিল্পীরা তিন ধরনের বার্নিশের মধ্যে স্পিরিট বার্নিশের ব্যবহার সর্বাধিক ভাবে করে থাকেন। কাঠে দেওয়ার জন্য স্পিরিট বার্নিশ প্রস্তুত প্রণালী অনুপাতানুযায়ী উপাদান নিম্নে দেওয়া হলো-

উপাদান	অনুপাত
মেথিলেটেড স্পিরিট	১০
চাঁচ	৫
করি লোবান	১
রুবি মাস্তকি	১
রঙ গুড়া (Pigment)	$\frac{১}{২}$

উপরেল্লিখিত উপাদানগুলিকে নির্দিষ্ট অনুপাতে একটি পাত্রে ভালোভাবে মিশাতে হয়। কয়েক ঘন্টা পর এ মিশ্রিত বার্নিশ কাঠে প্রথম অস্তরণ হিসেবে দেওয়া হয়। শুধু মাত্র চাঁচের পরিমাণ কম করে (অর্ধেক অর্থাৎ $২\frac{১}{২}$ ভাগ) দ্বিতীয় প্রলেপ দেওয়া হয়। এই উপাদানগুলির মধ্যে স্পিরিট সবগুলিকে গলিয়ে মিশাতে সাহায্য করে লাক্ষ্য পোকা থেকে উৎপন্ন এই চাঁচ কাঠের উপরের অংশে একটি শক্ত আবরণ সৃষ্টি করে। করি লোবান আঠার কাজটি করে আর কাঠের চাকচিক্য বৃদ্ধির জন্য রুবি মাস্তকি অত্যন্ত কার্যকর।

৩. কার্ফা

বাজারে স্বচ্ছ তরল হিসেবে পাওয়া যায়। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সৌন্দর্য্য বর্ধনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। তৈরিকৃত কারুপণ্যের একদম শেষে কার্ফা দিলে, কারুপণ্যটি চকচকে ও সুন্দর রঙ ধারণ করে। টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্যেও এর প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. বার্নিশ করার পদ্ধতি

কাঠের জোড়া, ফাটা, গর্ত ইত্যাদি পুটিং দ্বারা বন্ধ করে জমিন ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। পুটি শুকানোর পর কাঠ ঘষা জিরো (Zero) নং শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে কাঠের জমিন মসৃণ করতে হয়। অতঃপর ফ্রেঞ্চচক বা চক পাউডার এবং মেথিলেটেড স্পিরিট সমান সমান পরিমানে একসঙ্গে মিশিয়ে একটি আস্তর দিতে হবে। এই আস্তর সম্পূর্ণ শুকানোর পর পুনরায় শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে মসৃণ ও প্রস্তুত করতে হবে। এরপর বার্নিশ লাগাতে হবে। বার্নিশ লাগানোর জন্য ব্রাশ অথবা গজ কাপড় ব্যবহার করা হয়। বার্নিশ দ্রুত টেনে দিতে হয়। প্রথমে উপর-নিচ ও পরে পাশে ব্রাশ চালালে বার্নিশ দেওয়া ভাল হয়। যত্নসহকারে ও নিখুতভাবে বার্নিশের আস্তর দিতে হবে। কোথাও যেন বাদ বা প্রলেপের কোন অংশে তুলির আচড়ের দাগ না পড়ে। এইজন্য কমপক্ষে বার্নিশের তিনটি আস্তর দিলে ভাল হয়। তিন আস্তর বার্নিশ করতে ২০০ বর্গফুট কাঠের জন্য এক কেজি বার্নিশ প্রয়োজন। এইভাবে বার্নিশের কাজ শেষ করতে হয়। অনেকে আবার কাঠে বার্নিশ দিয়ে শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে খাটি সরিষার তেল ঘষে দেয় ফলে বার্নিশ এবং কাঠ উভয়েরই আরও সৌন্দর্য চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।

৫. ভলো বার্নিশ চেনার উপায়

কারুশিল্পী ও সূত্রধরদের কাছ থেকে বার্নিশ চেনার উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো-[২২]

১. স্বচ্ছ হতে হবে যেন বার্নিশ করার পরে কাঠের আশ বিন্যাসকে সহজেই দেখা যায়।
২. কাঠের উপর শক্ত আবরণ তৈরি করতে পারে।
৩. কাঠে লাগানোর পর দ্রুত শুকাবে।
৪. টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী হবে। কাঠের উপর বার্নিশ আলো বাতাস এবং শুষ্ক বা আর্দ্র আবহাওয়াতেও টিকবে।

৬. পলিশিং

বাজার থেকে কেনা ভালো মানের মোমের পলিশ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অধিকাংশ কারুশিল্পী নিজেই তার পলিশটি তৈরি করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা বিশুদ্ধ তারপিন, তিসির তেল ও মোম ব্যবহার করেন।

- প্রথমে মোমগুলোকে পাতলা খন্ডে কেটে নিতে হবে। কারণ ক্ষুদ্র আকৃতির মোম তাড়াতাড়ি গলে।
- এবার এ মোমকে চুলায় নিয়ে তাকে গলাতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে তাতে পরিশুদ্ধ তিসির তেলযুক্ত করতে হবে। এ সময় খুব ভালোভাবে নাড়তে হবে মিশ্রণটিকে যাতে মোম ও তেল মিশে যায় ভালো করে।
- এবার সাবধানতার সঙ্গে তারপিন যোগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে তারপিন অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ।
- পুরোপুরি মেশা পর্যন্ত মিশ্রণটিকে কয়েক মিনিট ধরে নাড়তে হবে।
- এবার তৈরি হওয়া পলিশটিকে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। এর রঙ হবে ফ্যাকাশে হলুদ।
- একটি পাতলা কাপড়ের টুকরা দিয়ে পলিশটিকে কাঠের তলে লাগাতে হবে। মোমের এ পলিশ কাঠের টেক্সচারকে সামনে আনবে এবং একে উজ্জ্বল করে তুলবে।
- পলিশ করার পর তা কিছুক্ষণ খোলা রেখে দিতে হবে যাতে করে তারপিন উড়ে যেতে পারে।
- আরেকটি পাতলা ও মোলায়েম কাপড়ের টুকরা দিয়ে পলিশকৃত কাঠের উপর থেকে স্পঞ্জ করে নিতে হবে।

৭. রঙ এর কাজ

আজকাল কারুশিল্পীরা বাজারের রঙ ব্যবহার করছে কিন্তু কিছুদিন আগেও গাছ গাছড়ার বিচি ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের তৈরি রঙে তারা রঙ করত। কয়েকটি প্রাথমিক রঙ মিশিয়ে মিশিয়ে বর্ণের বৈচিত্র আনত।[২৩] কাঠের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তাতে রঙ দেওয়া হয়। রঙ কাঠকে বাইরের গরম ও ভিজা হতে রক্ষা করে এবং কাঠ বেশি দিন টেকসই হয়। রঙ অনেক রকমের হয়, যথা- সাদা, নীল, সবুজ, গাঢ় সবুজ, হলদে, বেগুনী, গ্রে, কাল ইত্যাদি। যেখানে যে রঙ লাগান উচিত সেখানে তা দেওয়া হয়। বাজারে তৈরি রঙ ড্রামে $\frac{১}{৪}$ গ্যালন, $\frac{১}{২}$ গ্যালন, ১ গ্যালন-এই পরিমাণে পাওয়া যায়। এই রঙ কিনে দরকার মত তিসি তেল,

তারপিন তেল ভাল করে মিশিয়ে নিতে হয় ও ব্রাশ দ্বারা কাঠে লাগান হয়। বিভিন্ন গুণাবলী বিশিষ্ট রঙ এর দাম বিভিন্ন রকম। তৈরি রঙ না কিনে রঙ-এর

মশলাদি কিনে রঙ প্রস্তুত করা যায়। এতে খরচ কম পড়ে। বিভিন্ন রকমের রঙ-এর গুড়া বাজারে কিনতে পাওয়া যায় যেমন - হোয়াইট লেড, রেড লেড, হোয়াইট জিংক, সবুজ, নীল, ক্রীম, হলদে, কাল, টিটানকস, লিথপন প্রভৃতি।

৮. রঙ-এর জমিন প্রস্তুত

কাঠের ফাটা, ফাঁকা ছিদ্রাদি পুটি দ্বারা বন্ধ করে শিরিষ কাগজ উত্তমরূপে ঘষে ময়লা তুলে ফেলতে হয়। তারপর

এই জমিনের উপর ব্রাশ দ্বারা রঙ লাগাতে হবে। $\frac{১}{২}$ হইতে ৪ পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের ব্রাশ বাজারে পাওয়া যায়। প্রতি গ্যালনের জন্য নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি প্রয়োজন ঃ

১.	রঙ-এর গুড়া	১৬ পাউণ্ড
২.	তিসির তেল	৮ পাউণ্ড
৩.	তারপিন	$১\frac{১}{২}$ পাউণ্ড
৪.	লেড অক্সাইড	$২\frac{১}{২}$ পাউণ্ড

বাজারে যে রঙ কিনতে পাওয়া যায় দাম কমাবার জন্য কাঠ-কয়লার গুড়া, বালি ইত্যাদি ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়ে থাকে। "যে রঙ কাঠকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে তাকে অস্বচ্ছ রঙ বলে। যে রঙ কাঠে কোনরূপ উজ্জ্বল্য সৃষ্টি করে না তাহাকে ফ্ল্যাট পেইন্ট বলে।"[২৪] রঙ ও বার্নিশ প্রতি গ্যালনে ১৪০ থেকে ১৫০ বর্গফুট পর্যন্ত প্রথম প্রলেপে ও ২০০ বর্গফুটের পরিমাণ জায়গা দ্বিতীয় বা পরবর্তী প্রলেপে আবৃত করা যায়। রঙ বা বার্নিশ করিবার পূর্বে পুটি লাগানোর পর কাঠকে শিরিষ কাগজ (প্রথমে ২নং তারপর যথাক্রমে সূক্ষ্মতর ১নং $\frac{১}{২}$ নং ও জিরো (০) নং ভালভাবে ঘষে কাঠের উপরের সমস্ত ময়লা, অমসৃণতা দূর করতে হয়।

৯. রঙ-এর উপাদান

রঙ-এ যেসব উপাদান থাকে তাদের কার্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে ঃ

১. আস্তরণ- হোয়াইট লেড, রেড অক্সাইড, হেভক জিংক-অথবা জিংক হোয়াইট।
২. বাহক তিসির তেল, সয়াবিনের তেল।
৩. বিশুষ্ক জিংক, রেডলেড, তার্পিন তেল, লেড অক্সাইড, কোবাল্ট ও ম্যাংগানিজ অক্সাইড।
৪. দ্রাবক তার্পিন, ইহা রঙ-কে পাতলা করে।
৫. রঙ-এর গুড়া কাল, নীল, হলদে ইত্যাদি।

১০. প্রয়োজনীয় ওজনে রঙ

প্রতি ১০০ বর্গফুট রঙ করতে নিম্নলিখিত পরিমান দ্রব্য প্রয়োজন। রঙ-এর গাঢ়তা বা উজ্জ্বল্যের জন্য কিছু ব্যতিক্রম হতে পারে , তবে নিম্নোক্ত তালিকা হতে মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাবে ঃ

১. রঙ-এর গুড়া	১$\frac{১}{২}$ পাউন্ড
২. তিসির তেল	১ পাউন্ড
৩. তারপিন	$\frac{১}{৪}$ পাউন্ড
৪. হেভক জিংক	১ পাউন্ড

১১. এনামেল রঙ

বাজারে যে কয় রকম রং পাওয়া যায় এনামেল রঙ বা এনামেল পেইন্ট তাদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। $\frac{১}{৪}$ গ্যালন, $\frac{১}{২}$ গ্যালন, ১ গ্যালন রঙ এর ড্রাম বাজারে পাওয়া যায় এবং এর চেয়ে কম পরিমাণের এনামেল রঙ এর পাত্র বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ইহা কাঠে উজ্জ্বল্য প্রদান করে। কাঠ ব্যতীত গ্লাস, টিন ইত্যাদিতেও এই রঙ ব্যবহার করা হয়।

৪.৪ পুটি

কাঠের কারুশিল্প তৈরি করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কাঠ জোড়া দিতে হয়। এই জোড়ায় কখনও ফাকা থাকলে সেই ফাকে পুটি ব্যবহার করা হয়। এই ছাড়াও ফাটল, ছোট-খাটো গর্ত, চিড়, অসাবধানতাবসত

কোথাও কেটে তুলেফেলা ইত্যাদি ত্রুটি রঙ বা বার্নিশ দেওয়ার আগেই ভরে দেয়ার জন্য পুটি ব্যবহার করা হয়। ভাল পুটি ব্যাবহার করা হলে এসব দোষ ত্রুটি সম্পূর্ণ ঢেকে যায় এবং রঙ করার পর এসবের কোন চিহ্ন থাকে না। বিভিন্ন পদ্ধতিতে পুটি করার প্রচলন আছে।

পাকা পুটি ঃ এর উপকরণ মোম, চক পাউডার, ধূপ ও গোপীমাটি। এগুলির মিশ্রন অনুপাত যথাক্রমে ১:৩: $\frac{১}{৪}$:$\frac{১}{৪}$ । এগুলি একটি পাত্রে ভালভাবে মিশিয়ে চুল্লির তাপে ফুটাতে হয় এবং মোটামুটি গরম অবস্থাতেই কাঠে লাগাতে হয়। লাগানের ১০-১৫ মিনিট সময়ের মধ্যেই শুকিয়ে শক্ত হয়। এটিকে মোম পুটিও বলে।

কাঁচা পুটি বা তেল পুটি ঃ চক পাউডার, তিসির তেল, ধূপ ও হ্যাভক জিঙ্কের মিশ্রণে এ পুটি তৈরি হয়। মিশ্রণ অনুপাত যথাক্রমে ৩:১: $\frac{১}{৪}$:$\frac{১}{২}$ এগুলির সমন্বয়ে খুব ভালভাবে মিশিয়ে সরাসরি কাঠে লাগাতে হয়। অন্য পুটির তুলনায় এ পুটি শুকাতে কয়েকদিন সময় লাগে। এটা তেল পুটি হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও খুব, শিং ইত্যাদি শক্ত পদার্থের গুড়াকে প্রথমে ভাল আঠার সাথে মিশিয়ে কাঠি বা স্টিকের আকারে প্রস্তুত করা হয়। একে ফুটন্ত পানিতে লাগিয়ে আঠার মত করে কাঠের ফাটা বা চিড়ে লাগানো হয়। পুটি লাগানোর জন্য ইস্পাতের তৈরি বার্নি ব্যবহার করা হয়। আবার কেউ কেউ অব্যবহৃত বাটালি এবং কাঠের তৈরি বস্তু দিয়ে পুটি লাগানোর জন্য ব্যবহার করেন। প্রয়োজন অনুযায়ী পুটি লাগানোর পরে শুকিয়ে গেলে সুন্দর মসৃণ করার জন্য (Sanding) করে অর্থাৎ শিরিষ কাগজ দিয়ে খুব ভাল করে ঘষতে হয়।

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কারুশিল্প পণ্য তৈরির পর এগুলোকে ৩-৪ দিন রোদে ভাল করে শুকাতে হয়। রোদে বেশিক্ষন শুকালে যেন এগুলো ফেটে না যায় সেদিকে সতর্কতার সহিত খেয়াল রাখতে হবে। পরিমিত শুকানোর পর শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে প্রতিটি কারুশিল্প পণ্যকে মসৃণ করে এর প্রতিটি সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলে পুটিং ব্যবহার করা হয়।

কোন মিহি পাউডার আটা জাতীয় দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে তৈরি করা লেই-কে পুটিং বলে। কাঠের জোড়া অথবা কাঠের ক্ষতস্থান পূরণ করে লেপে দেয়ার জন্য পুটিং ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন কালে সূত্রধরেরা তেঁতুলের বিচির গুড়া সিদ্ধ করে আঠা তৈরি করে এর সঙ্গে গিরিমাটি মিশিয়ে লেই তৈরি করে তা পুটিং করে পুটিং বানাতেন, পরবর্তী সময় সাবুদানার গুড়া অথবা বার্লির আঠার সঙ্গে চকখড়ি মিশিয়ে লেই তৈরি করে পুটিং বানাতেন, বর্তমানে আইকা গামের সাথে চক পাউডার একত্রে মিশিয়ে তা পুটিং হিসেবে ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের কারুশিল্পীরা এক সঙ্গে অনেক কাঠে কারুশিল্প পুটিং ব্যবহারের জন্য আর্থিক দিকটি বিবেচনা করে ভাতের মাড়ের সাথে চকখড়ি মিশিয়ে পুটিং তৈরি করেন। বিশেষ প্রক্রিয়ায় পাতিলে

মোম গলিয়ে এর সাথে মাটি বা বালি মিশিয়ে ও পুটিং তৈরি করে তা বড় আকারের কাঠের কারুশিল্প গুলোতে ব্যবহার করেন। কারুশিল্পীরা উল্লেখিত যে কোন মাধ্যমে তৈরি পুটিং কাঠের কারুশিল্পের গায়ে জোড়া এবং ক্ষত অংশগুলোতে ব্যবহার করেন। এই পুটিং যথেষ্ট পরিমাণ পাতলা করে কখনো কারুশিল্পের সম্পূর্ণ অংশে তা লেপে দেন। এই অবস্থায় পুটিং ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে নেয়ার পর পুনরায় শিরিষ পেপার দিয়ে পুটিং ব্যবহৃত অংশগুলো ঘষে মসৃণ করে চূড়ান্তভাবে রঙ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়।

৪.৫ নকশা

কারুশিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন প্রকৃতি ও পরিবেশ নির্ভর তেমনি এর আকার, গড়ন, নকশা এবং উপরিতলের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে অনুসৃত হয়েছে প্রকৃতির অবাধ অফুরন্ত উপকরণের গড়ন, বৈশিষ্ট্য ও নকশাকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতি ও পরিবেশ হচ্ছে মৌলিক গড়ন ও নকশার রূপকার, সুতিকাগার-ভাণ্ডার। প্রকৃতির উপকরণ ও উপকরণের নকশার চয়ন এবং কারুশিল্প তৈরিতে এর অনিবার্য প্রয়োজন, ব্যবহারের তাগিদ, পরিবেশে মানুষের জীবন যাপন-সংস্কৃতি ধারায় নিহিত। আমাদের দেশের কারুশিল্পীগণও অনুরূপভাবে প্রতিনিয়ত ঐতিহ্যের অনুশীলনে কৌশল ও দক্ষতার সাহায্যে নানা উদ্ভাবনীর মধ্য দিয়ে উপকরণের বিচিত্র গড়ন, আকার, রঙ এবং উপকরণের বহিপৃষ্টের, উপরের স্তরের, তলের চেহারা, চরিত্র ও বুনটের বৈশিষ্ট্যকে তাদের তৈরি কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত। এবং প্রকৃতির উপকরণ, উপাদানের অনিবার্য নকশা গুণকে কারুশিল্পে ব্যবহার করে ধারণ করতে সক্ষম হয় শৈল্পিক নমনীয়তা। লোকমনের সমাজ পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চাহিদা মেটাতে কারুশিল্পী তার সৃষ্ট কারুশিল্পে চিরায়ত প্রাকৃতিক উপকরণ, কৌশল, দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবনীগুণের প্রকাশ হিসেবে ঐতিহ্যের লোকজ গড়নে নতুন সাজে, রঙ এ বৈচিত্র আনেন। পৃথিবীর শিল্প উন্নত দেশগুলোতে লোক ও কারুশিল্পের রূপান্তর প্রক্রিয়ার আধুনিক শিল্প পণ্যের গড়নে, নকশায়, রঙ এ প্রত্যক্ষ করা যায়। "রেখা ও ছায়াতপ দিয়ে আঁকার পর। রঙ দিলে বস্তু আরো স্পষ্ট ও নয়ন রঞ্জক হয়।"[২৫]

তবে বিশ্বের নানা অঞ্চলের সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্যে, গড়নে, নকশায়, বর্ণাঢ্য রং এর ব্যবহারে, চিত্রে এবং ব্যবহার ও উপযোগিতায় স্থানিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সহজলভ্য কাঁচামালে প্রয়োজনের অনিবার্যতার পরিচয়। সাধারণ মানুষের কারিগরি জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতার পরিচয়। কারুশিল্পে এত বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যময় সাংস্কৃতিক উপাদান জড়িত।

আবহমান বাংলার লোকসাংস্কৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্য নকশী কাঁথা, নকশী পাটি এবং কাঠের তৈরি কারুশিল্পের

প্রত্যাক্ষ প্রমাণ মেলে। কাঠের তৈরি কারুশিল্প বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ যা কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত। সাংস্কৃতিক কারুশিল্প। এই কাঠের তৈরি কারুশিল্পের আকারে, ব্যবহারে, নকশা প্রতিস্থাপনে, কখনও কখনও ইসলামী শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করেছে, বরণ করেছে। কখনো লোকজ নকশার সঙ্গে ইসলামী শিল্পকলার প্রভাব মিলে মিশে সহাবস্থান করেছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পে একসাথে বাংলাদেশের চিরায়ত অষ্ট, ষোল, শত ও সহস্রদল পদ্ম ও মহররমের তাজিয়া, মসজিদের মিনার, গম্বুজ, মোটিফ ইত্যাদি নকশা শোভা পাচ্ছে। অপর দিকে ইসলামী শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে এই শিল্প রূপান্তরিত হয়েছে মসজিদের মিম্বরে। বাংলাদেশের কাঠের কারুশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। আমাদের কারুশিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে।

ফলে বাংলার কারুশিল্প বহু মাত্রিকতার গুণে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়েছে। বাংলার কারুশিল্পে তিনটি ধারার প্রভাব রয়েছে বলা যেতে যাবে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলার প্রাচীন লোকজ ধারা, ইসলামী ধারা এবং প্রাচীন লোকজ ও ইসলামী ধারার মিশ্রণে মিশ্রধারার কারুশিল্প। তবে উল্লিখিত তিনটি ধারার কারুশিল্প একে অন্যের পরিপূরক। বিশেষ করে প্রাকৃতিক উপাদান কাঁচামালে ব্যবহার, কৌশল ও দক্ষতার প্রয়োগ তিনটি ধাঁরায় অভিন্নভাবে, একই নিয়মে অনুসৃত হয়েছে। লোকজ ও ইসলামী দুই প্রধান ধারাই একে অন্যের কাছ থেকে নকশা ও মোটিফ গ্রহণ করেছে। সম্মিলন সমন্বয়ে ঘটিয়েছে। মিশ্রধারার কারুশিল্প এর প্রতিফলণ সবচেয়ে বেশি।

মানুষের সৌন্দর্যবোধ থেকে কাঠের তৈরি কারুশিল্পে নকশার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। আর এটা ঘটেছে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের মাধ্যমে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত সামগ্রীকে নকশা করে আকর্ষনীয় ও সুন্দর রূপ দেন। "কোন জিনিসের সুস্থ চিন্তাধারার গঠনমূলক বিন্যাসকেই নকশা বলে।"[২৬] মূলত ভাল নকশার ক্ষেত্রে যুক্তি ছাড়া

কোন কিছুই এমনকি বিন্দুও ব্যবহার করা যায় না। যে কোনো ডিজাইনে বা অলংকাররে দুটি দিক আছে প্রথমত ঃ তার বাইরের আকৃতি। দ্বিতীয়ত ঃ তার ভিতরের শৃঙ্খলা বা বিভাগ। প্রত্যেক রূপ বাইরের দিকেও যেমন নির্দিষ্ট সীমায় বাঁধা, ভিতরের দিকেও তার নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে।[২৭]

কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা ইচ্ছানুযায়ী একটি রূপের বাইরের আকৃতির সঙ্গে অন্য একটি রূপের ভিতরের শৃঙ্খলা যোগ করতে সচেষ্ট হোন। অনেক দিন ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ছন্দ বাঁধাধরা ছকে ধরা পরায় ক্রমশ বৈচিত্র্য হারায়। একদম চেনা রূপ ও ছন্দ নিয়েই কারুশিল্পীর সৃষ্টিকার্য ও বৈচিত্রময় আলংকারিক বোধ তৈরি হয়। চেনা রূপ যেমন একটি পানের পাতা ও একটি অশ্বত্থপাতা প্রায় একই। কিন্তু লক্ষ্য করলে

দেখা যায় প্রত্যেকটির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কারুশিল্পী এইসব সূক্ষ্ম জ্ঞান থেকেই নতুন ডিজাইন সৃষ্টির ধারণা পান।

"ডিজাইন বা নকশা-কে অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, এটি plan শব্দের দ্যোতনা আনে। প্ল্যান হয় বাস্তব থেকে ছোট, রঙ থাকে আবশ্যিক ক্ষেত্রে। বাস্তবকে পুরোপুরি ধরে নিয়েও এটি হবে তার নিখুঁত মিনিয়েচার নকশাও তা-ই।"[২৮] মূল আরবি শব্দ নক্স। যার অর্থ কারুকাজ, ছবি, রেখাঙ্কন। নক্স থেকে উৎপন্ন নক্সা বা নক্শার শিষ্ট অর্থও একই।[২৯] "নক্সাতে জ্যামিতিক ও গাণিতিক পরিমাপ কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। নক্সায় একই বস্তুর রূপ একাধিকবার ব্যবহৃত হলে প্রতিটির পরিমাপ সমান হয়।"[৩০]

নকশা শব্দটি ব্যবহৃত হয় একাধিক অর্থে। যেমন, নকশা কোনো স্থান বিশেষ বা জিনিসের শোভা বর্ধনের জন্য কৃত কারুকার্যকে, কোনো কিছুর সাধারণ পরিকল্পনা (plan)-কে, চিত্রের কাঠামো, রেখাচিত্র এবং বাংলায় নকশা বলতে মানচিত্রকেও বোঝায়। মানুষ যখন কোন কিছুকে সুন্দর করে গড়তে যায়, তখন তার লক্ষ্য হলো মানুষের শিল্পবোধকেই পরিতৃপ্ত করা অন্য কিছু নয়। শরীরে স্থুল ও সূক্ষ্ম যে কটা ইন্দ্রিয় আছে সেগুলিকে আশ্রয় করে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সংগীত, কাব্য, নৃত্য, অভিনয়, কারুশিল্প যাবতীয় চৌষট্টি কলার সৃষ্টি হয়েছে।[৩১] নকশায় পুনরাবৃত্তি, পুসরাবৃত্তি-অপুনরাবৃত্তি, দৃষ্টি বিভ্রম বা দৃষ্টি মেঘাচ্ছন্ন ইত্যাদি গুণকে ব্যবহার করেও নকশা তৈরি হয়ে যাকে "Harmony is the satisfaction of our sense of beauty."[৩২] একটা নকশা কেবল এক জিনিস নিয়ে হয় না।

অনেক জিনিসের রূপ একত্রে করে তৈরি হয় একটা নকশা। মানুষ ভারসাম্য পছন্দ করে। মানুষের দেহের বাম পাশ ও ডানপাশ সমান ভাবে গঠিত হওয়ায় কোন কিছুর আকৃতি বাম ও ডান পাশ সমান হলে সে আকৃতি মানুষের কাছে ভাল লাগে। অলংকরণ হচ্ছে শিল্পীমনের অভিক্ষেপ (projection) pattern এবং design -এর দুই হচ্ছে অলংকরণ শিল্পের আঙ্গিক।[৩৩]

ডিজাইনের ক্ষেত্রে বাহিরের আকৃতিটি পাওয়া গেলে সহজে ভিতরের বিভাগ করা সহজ। কারুশিল্পে নকশা অনেকটা সরল ও অবচ্ছিন্ন করা হয়। এই কাজে শিল্প উপাদানের বিশেষ পৃকৃতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, উপাদানের স্বকীয়তাই কারুশিল্পীর স্বকীয়তার সীমানা বাধতে সক্ষম হয়। মনে রাখা উচিৎ কাজের জন্য সম্মুখে রাখা বস্তুটির মূল চরিত্র কি ; গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন খুটিনাটি বিষয় না ফুটিয়ে মূল বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা উচিৎ।

বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পীদের মনে বিভিন্ন রূপের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রত্যেক অঞ্চলের কারুশিল্পীদের অবয়ব ও ডিজাইনের আঞ্চলিক একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি পশু-পাখি, ফুল-ফল, চন্দ্র-সূর্য, প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফর্ম থেকে নেওয়া হয়।

বাংলাদেশে কারুশিল্পের বহু ক্ষেত্রে পদ্ম ময়ূরের প্রয়োগ হয়েছে। তারপর আমের ফল ও পাতা, অশ্বত্থপাতা, পানপাতা, শাপলা ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

একটি কাঠ খন্ডই কাঠের কারুশিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আর তাতে কোন আকার বা আকৃতি দিলে তো কথাই নেই, তৈরি হয় নান্দনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্প। দাড়িপাল্লার বাট, কাচি, দা-এর হাতল, গাছা, রুটি তৈরির বেলনা, পিড়ি, জলচৌকি, আসবাবপত্র ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যবহৃত কাঠের তৈরি কারুশিল্প।

মানুষ তার কারুশিল্প চেতনার প্রকাশ পিঁড়ি, নৌকা, চুরির আলনা, দা-কাচি ও বটি-দার আছারি, দরজা, পালঙ্ক, প্রসাধনী বাক্স, ফুলদানি, সিন্দুক, ঢেঁকি, নারকেল কুরানী, চামচ, পিঠা ও সন্দেশের ছাঁচ, জলচৌকি, পালকি, বিভিন্ন আসবাবপত্র, রেহাল, পিলসুজ বা গাছা, খড়ম, ইত্যাদি কাঠ মাধ্যমে তৈরি করেছে। এগুলো শুধু প্রয়োজন মেটাতে তৈরি করেনি, কাঠ মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ তার শিল্পরুচির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছে। এ শিল্পরুচির বিকাশের কারণে বিভিন্ন নকশার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের কাঠের কারুশিল্পে প্রাচীনকালে যে অলঙ্কৃত নকশা ক্ষোদিত করেছিল বর্তমান তার বৈচিত্র ও রূপ অনেক বদলে গেছে।

প্রাচীনকালে আসবাব এবং অন্যান্য দারুশিল্পকার্মে নকশার সৃষ্টি হতো শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী, সেখানে সূত্রধর বা ব্যবহারকারীর পছন্দের কোন অবকাশ ছিল না।[৩৪] কাঠ দিয়ে বাড়িঘর ও মূর্তি তৈরি করা হয়। পাথরের ব্যবহার অনেক কম। কাঠের তৈরি বাসগুলির গড়ণ ও নকশা উচ্চ স্তরের শিল্পবোধের পরিচায়ক।[৩৫]

গৃহস্থের ঘরের আসবাব প্রায় সমস্তই তাহার নিজের অথবা মেয়েদের হাতের তৈরি। বড় মানুষের বাড়িতে খাট-পালঙ্কের উপর গ্রাম্য ছুতোর মিস্ত্রীরা নানারূপ মূর্তি ও ফুলপল্লব উৎকীর্ণ করিত।[৩৬] বিবাহের এক বৎসর পূর্ব হইতে "পীড়িচিত্র" আরম্ভ হইত, সেই চিত্রিত পীড়ির উপর পাতিকর জন্য নানা কারুকার্য্য মন্ডিত কাগজের ফুল-লতা অঙ্কিত হইত।[৩৭] ছরওয়ার জান মিঞার খড়ো ঘর, পোঃ মধুখালি, গ্রামঃ বনমালদিয়া, জেলা-ফরিদপুর। এই ঘরখানি প্রথমে ওস্তাদ রাজলোচন ঘরামী প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়া শেষে ভয় পাইয়া মিঞার নিকট অস্বীকার করে। নানা কারুকার্য্য মন্ডিত খুঁটির সঙ্গে কাঠের 'ডাফ' দিয়া চাল আঁটা হয়। এই ডাফগুলির কোনটি নরাকৃতি কোনটি হাতীর শুঁড়ের মত, কোনটিতে পরী বা অন্য কোন জীবজন্তুর মূর্তি গড়া থাকে।[৩৮]

গ্রামের শিল্পী ও কারিগর তার চার পাশের চেনা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশজাত উপকরণ দিয়ে বা কাঠের তৈরি কারুশিল্প সৃষ্টি করে থাকে। কারুশিল্পীর সৃষ্টি রূপ পরিগ্রহ করে নানা আকারে, গড়নে ও নকশায়। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রত্যক্ষ অবদান কাঠের তৈরি কারুশিল্প। এভাবেও বলা যায় কাঠের তৈরি কারুশিল্পের রূপ ও নকশা নির্মাণের চিত্রকল্প, গ্রহণ করে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতির সকল উপকরণ থেকে। ফলে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনযাপনকারী মানুষ অনিবার্যভাবে কারুশিল্প সৃষ্টিতে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল উপকরণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, গুণ, নমনীয়তা, বর্ণাঢ্যতা, উপরিতলের বুনট বা টেক্সচার, স্বচ্ছতা, পিচ্ছিলগুণ ইত্যাদিকে প্রত্যক্ষ করেছে। এর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কাঠের কারুশিল্প তৈরির কারণ সবই জীবনের সংগ্রামে বেঁচে থাকার তাগিদে, প্রয়োজনে। হাত ও হাতিয়ারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক কাঠের উপকরণকে ব্যবহার করে জীবনের প্রয়োজনে উপযোগিতার নিরীখে মানুষ নানা আকার, গড়ণের বস্তু সৃষ্টি করেছে। বস্তুতে নকশা, গড়ণে বৈশিষ্ট্য, রূপ এনেছে। সৃষ্টি হয়েছে কাঠের তৈরি কারুশিল্প।

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সৃষ্টিতে, রূপান্তরে, পুনরুজ্জীবনে এদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের কাঁচামাল, উপকরণ কারুশিল্পীকে সৃষ্টির প্রেরণা দেয়, উদ্বুদ্ধ করেছে। বৈচিত্রময় কারুশিল্প, কারুশিল্পীর সৃষ্টিতে রূপ লাভ করেছে।

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পে অনাদিকাল ধরে মানুষ তার শৈল্পিক চেতনা ধারণ করে আসছে নকশার মাধ্যমে। মানুষের পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তার চিন্তা, চেতনা ও উপলব্ধিতে পরিবর্তন এসেছে এবং তার শিল্পকর্মেও এসেছে বৈচিত্র্য। ভৌগলিক ও সামাজিক কারণেও মানুষের শিল্পকর্ম ও শৈল্পিক মাধ্যম বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। মানুষ যেসব মাধ্যমে তার শিল্প প্রতিভা প্রকাশ করেছে কাঠ তার অন্যতম।[৩৯]

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প দেখা যায়, সাধারণ ছাদের কারুকার্যে, গৃহস্থ ঘরের কার্নিসের গায়, চৌকাঠে, কাঠের খুটি বা থাম ও দরজাতে। এসবে মোটিফ হিসেবে থাকে মানুষ, পশু-পাখি, লোকজ ধ্যান ধারণা, গাছ-গাছালীর জীবন থেকে নেয়া। আর এসব মোটিফ হয়ে থাকে একান্তই ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের। কারুশিল্পী সেইসব প্রাকৃতিক উপাদানকে গ্রহণ করেন যা তার কাজের সাথে মেলে। এর পাশাপাশি তিনি অন্য উপাদানগুলোকে বদলে নেন। আর এভাবে বদলে সম্পূর্ণ নতুন কোনো ফর্মের সৃষ্টি হয়, যার নিজস্বতা রয়েছে।

ছাঁচের উদার ব্যবহারের মাধ্যমে ধরন ও নকশা নির্মাণ করা হয়। একদিকে এতে যেকোনো ধরনের প্রথার অনুপস্থিতি থাকে। অন্যদিকে এতে জাঁকালো ও অতি আলঙ্কারিকতাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ফর্মের কোনো ধরনের ক্রম ও ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত থাকে। একটি স্থির মানের উপাদান ব্যবহৃত হয়। আর নকশা বা নির্মাণ উপাদানের যেকোনো ধরনের আধিক্য এড়িয়ে চলা হয়। "বাংলার কাঠ খোদাই শিল্পকে দুটি প্রধান শৈলীতে ভাগ করা যায়। একটি শৈলীতে কাজটি নিজের মতো করে সমাপ্ত (এখানে স্বাধীন অর্থে) এবং বৃত্তাকার। অন্যটির জন্য প্রয়োজন হয় একটি স্থাপ্যতিক পটভূমির, যার মূল ভিত্তি উৎকীর্ণ (রিলিফ ওয়ার্ক) করার মধ্যে।"[৪০]

নকশা আলঙ্করিক আসবাব বা কারুশিল্পের জন্য সাধারণত নিচের গাছগুলোর কাঠ বিশেষভাবে ব্যবহার করা হতো-[৪১] কৃষ্ণশিরিষ (albizzia amara, boivin), শিরিষ (albizzia lebbek, benth), পূর্ব ভারতীয় ওয়ালনাট বা আখরোট গাছ চাপলাশ (artocarpus chaplasha-rxb), চিলা (casearia tomentosa - roxb), বমচিলা বা পাপড়ি (holoptelea Intgri olia-planch), অর্চা (sonneralia), ক্যাসিওলারিস (linn engler), সিসাম (dalbergia latifolia-black wood), দেওদার (himalayan cedar, cedrus deodara), মেহগনি (toona ciliata), করম বা হলদ (adina cordipolia), চিটাগাং উড (chukrassia tabularis), ওয়ালনাট বা আখরোট (jugulans regia) এবং এবনি (diospyros ebenum)

কোনো নকশা কেন কাঠের তৈরি কারুশিল্পে স্থান পেলো, তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়, নকশাগুলো ব্যবহারের পেছনে অনেক ধরনের প্রভাব কাজ করে। অধিক ব্যবহৃত মোটিফগুলো সম্পর্কে বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ময়ূরঃ একসময় এদেশে প্রচুর ময়ূর ছিল। এখন আর আগের মত দেখা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ময়ূর সৌন্দর্যের অলংকৃত প্রতীক হিসেবে খোদিত হয়েছে। এই ময়ূর নকশা কাঠের গড়ণে লো ও হাই-রিলিফে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কারুকাজ করা হয়েছে। বাদ্যযন্ত্র দোতারাতে ময়ূর ছাড়া কল্পনা করা যায় না। কোনটা বাস্তব কোনটা লোকজ মোটিফ আকারে নকশায় ফুটে ওঠে। তাইতো ময়ূর পঙ্খি নৌকাও কাঠের তৈরি কারুশিল্পে মিথে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও কার্তিকের বাহন হিসেবে ময়ূরের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থান করছে।

টিয়াপাখিঃ বাংলা সাহিত্যে, লোককাহিনীতে, রূপকথায় টিয়া পাখি শুভ প্রতিক হিসেবে স্থান দখল করে আছে। এই শুভ যেখানে সুখ ও সৌন্দর্য্য থাকে এমন ধারণা থেকে টিয়াপাখি কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ব্যাপকভাবে ক্ষোদিত হয়েছে। কারুশিল্পী বা সূত্রধররা কাঠের তৈরি কারুশিল্পে কত যে জোড়া টিয়াপাখি

তৈরি করেছে এর সংখ্যা নিরুপন করা কঠিন। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক ঘরেই এর দেখা পাওয়া যেত এখনও যায়।

বাঘঃ লোককাহিনী, রূপকথায় বাঘের উপস্থিত হালুম শব্দের মাধ্যমে। এতে বাঘের বলিষ্ঠতা ও সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সরব উপস্থিতি যার পরিচিতি পৃথিবীময়। এসব ধারনা থেকেই সূত্রধর সম্প্রদায় কাঠের তৈরি কারুশিল্পে বাঘকে উপস্থাপন করে চলেছে। কোথাও বাস্তব আবার কোথাও লোকায়ত বাঘ বা বাঘের মুখের ভাবমূর্তি কাঠে খোদাই করা হয়েছে। নৌকার গলইয়ে কাঠের তৈরি বাঘ ও কুমিরের লড়াই দেখা যায়। সিন্দুক, দরজা, বেড়া, বাদ্যযন্ত্র, চামচ ইত্যাদি কাঠের কারুশিল্পে বাঘ উৎকীর্ণ করা হয়। এছাড়া কাঠের তৈরি কারুশিল্পে একই পদ্ধতিতে সিংহ, হরিণ, ঘোড়া, হাতি, সাপ, হাঁস ইত্যাদি নানান দৃশ্যের সাথে খোদাই করা হয়েছে। সিংহের সাথে মিল রেখেই সিংহাসন তৈরি হয়। সিংহ ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে এসব কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ফুটিয়ে তুলেছে।

তরঙ্গায়িত পুষ্পলতাঃ বাংলাদেশের প্রতিটি শিল্পকর্মে তরঙ্গায়িত পুষ্পলতা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অন্যান্য মাধ্যমের ন্যায় কাঠ মাধ্যমেও এই নকশার ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। লোকায়ত আঙ্গিকে এই তরঙ্গায়িত লতা কাঠের কারুশিল্পে কলমিলতা, শঙ্খলতা ইত্যাদি ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। "চীন ও ইরানের প্রাচীন চীনামাটির তৈজসপত্রে তরঙ্গায়িত লতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে ইসলামি শিল্পকলায়, ক্ষুদ্র চিত্রে (miniature painting) ও পটি বা বর্ডার নকশায়ও তরঙ্গায়িত পুষ্পলতা চিত্রিত আছে। মোগল স্থাপত্যকলায় আরবি স্থাপত্যের অনুকরণেও তরঙ্গায়িত লতা নকশা ব্যবহৃত হয়েছে।"[৪২]

বাইরের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে সেই প্রাচীনকাল থেকেই দেশের তরঙ্গায়িত লতা বা পুষ্পলতা বাংলাদেশের শিল্পকর্মে আসে। তার প্রভাব ফেললেও খোদাই কাজের আঙ্গিকে স্বতন্ত্রতা রয়েছে এবং তৈরি হয়েছে দেশজ শৈলী। কখনও কখন এই নকশার সাথে পশুপাখি সম্বলিত নকশার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

সূর্যঃ পৃথিবীকে সচল রাখার জন্য সূর্যের ভূমিকা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই মানুষ শক্তির প্রতীক হিসেবে সূর্যের পূজো করে আসছে। এটা অনেক সহজেই বোঝা যায় সূর্যের তেজ মানুষের চারপাশের সব তেজকে হার মানায়। শিল্প যেহেতু জীবনবোধের প্রতিফলন, তাই কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নকশায় বিষয়বস্তুর মধ্যে সূর্য থাকবে, এ আর আশ্চর্য কি!

পদ্মঃ পদ্মের মূল থাকে মাটিতে, ভাসে পানিতে এবং চেয়ে থাকে আকাশপানে। প্রাচীন লোকজ বিশ্বাসে তাই পদ্ম হলো স্বর্গ-মর্ত-পাতালে এক মেলবন্ধন। পদ্মকে যেকোনো ব্যাস বরাবর কেটে সমান দুই ভাগে ভাগ করা যায় বলে এটি প্রতিসাম্য তথা ভারসাম্যের প্রতীক। আবার, পদ্মফুল সৌন্দর্যের প্রতীক। সংস্কৃতির প্রাচীন বিশ্বাস মতে এটি সৃষ্টির প্রাথমিক চিহ্নও বটে। কেননা, সৃষ্টির দেবতা হিসেবে বিশ্বাস করা হয় ব্রহ্মাকে, যাকে বর্ণনা করা হয় পদ্মের উপর বসে থাকা মূর্তিরূপে। লোকজ ধর্মে সম্পদদাত্রী দেবী লক্ষ্মীর আসনও পদ্ম। বৌদ্ধধর্মে পদ্ম পবিত্রতার প্রতীক, হিন্দুধর্মে লক্ষ্মীর আসনরূপে কল্পিত। বুদ্ধের আসনভঙ্গির নাম পদ্মাসন। তাই লোকজ ধর্মীয় আচারে এবং কাঠের কারুশিল্পে পদ্মের নকশা আজও ব্যবহৃত হয়। পদ্ম যেমন সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতিক তেমনি সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে শিল্পকর্মে অঙ্কিত বা খোদিত হয়। বাংলাদেশের কারুশিল্পীরা পদ্মকে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের গায়ে নকশা হিসেবে স্বচ্ছন্দে ক্ষোদিত করেছে। প্রস্ফুটিত বা বিকশিত পদ্ম ও পদ্ম চক্র নকশিকাঁথা, পোড়ামাটির ফলক, কাঠের কারুশিল্পে স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক শিল্পকর্মে আকর্ষনীয় এই পদ্ম ফুল নকশা হিসেবে বিভিন্ন আঙ্গিকে উল্লেখিত হয়েছে।

কলকে/কল্কেঃ "কলকার আভিধানিক অর্থ মোরগফুল। তুর্কী 'কলগী' থেকে হিন্দিতে 'কলগা' এবং বাংলায় কলকা নামে পরিচিত।"[৪৩] কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ব্যবহৃত অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি প্রতীক হলো কলকা। একে ইরানি বা পারস্য প্রভাব বলে ধারণা করা হয়। কারণ পারস্যের শিল্পে অনুরূপ নকশা দেখা যায়। হয়তো পারস্য থেকে এ অঞ্চলে আসা মানুষেরা এই নকশাটি প্রথম এখানে আমদানি করেছিলেন। তবে এই নকশা এখন বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতহ্যের অংশ হয়ে গেছে।

এই কলকা নকশা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পকর্মের মত কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ব্যাপক ভাবে স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে ইহা 'তুর্কী কলগী' নকশা নামে পরিচিত ছিল। নকশিকাঁথা, শাড়ি, বস্ত্রে, চিত্রে এই নকশা মধ্যযুগ থেকে এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের এই নকশা নিজস্বতা ও সতন্ত্র্য শৈলী রূপে স্থান করে নিয়েছে। বিভিন্ন রূপে, কলকা নকশা কাঠের তৈরি কারুশিল্প প্রস্ফুটিত হয় কখনো আম আকৃতি, ফলপাতা, সজীব গাছ, অগ্নিশিখা হিসেবে কলকা নকশা কল্পিত হয়ে থাকে।

প্রজাপতিঃ প্রজাপতির নানা ধরণের ফর্ম দিয়ে নকশা অনেক প্রাচীন। শুভমিলন বা বিবাহের প্রতীক হিসেবে প্রজাপতির ব্যবহার বাংলাদেশে হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত। তাই নবদম্পতির জন্য শুভকামনা করে তৈরি কাঠের কারুশিল্পে এই নকশার ব্যবহার দেখা যায়।

জীবনবৃক্ষঃ প্রাণ ও উর্বরতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত প্রতীক জীবনবৃক্ষ শুধু এদেশের সংস্কৃতিতেই নয়, বিশ্বের নানা দেশের নানা জাতির নানা বিশ্বাসে নানা আঙ্গিকে দেখা যায়। হয়তো আকার-আকৃতি-উপস্থাপনায় কিছু উনিশ-বিশ থাকতে পারে, কিন্তু মোটের উপর বৃক্ষের চিহ্নটি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বৃক্ষ নকশায় খেজুর, তাল, আনারস, সুপারি, কদম বৃক্ষ ইত্যাদি উল্লেখিত।

নৌকাঃ বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। তাই নদী ও নৌকা বিভিন্নভাবে এদেশের শিল্প মাধ্যমে চলে আসে। আকার ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে নৌকার যে বাহারি প্রকারভেদ দেখা যায়, তাও নকশা হিসেবে ফুটে ওঠে কাঠ মাধ্যমে বা কাঠের তৈরি কারুশিল্পের গাঁয়ে।

এদের কাঠামোগত শক্তি তার ভল্যুমের মধ্যে পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাহিনীগুলো সাধারণত দরজার ওপরে করা হয়। আর এ নকশাগুলো সাধারণত রিলিফ হিসাবে খোদাই করা হয় উৎকীর্ণ এসব কাজের অধিকাংশই বর্ণনাধর্মী হয়ে থাকে। এর নিপুণতার মধ্য দিয়ে কর্মদক্ষতার ছাপকে ফুটিয়ে তোলা হয়। স্পেসসহ নকশার পুরো উপস্থাপনে স্পষ্টভাবে থাকে পরিকল্পনার ছাপ। এ ধরনের রিলিফের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রেখার বিশুদ্ধতা। অধিকাংশ ফিগার বা অবয়ব আর আলঙ্করিক মোটিফের সমন্বয়ে তুলে আনা হয় আভিজাত্যের স্বাদ।

এতক্ষণ যতগুলো প্রতীক নিয়ে কথা বলা হলো, তার বাইরেও কাঠের তৈরি কারুশিল্পে রয়েছে শত শত প্রতীক বা মোটিফ। যেমন : পৌরাণিক কাহিনী, চরিত্র ও অনুষঙ্গ (মন্দির, সরস্বতী, কার্তিক, রাম-রাবনের যুদ্ধ, রাম-সীতার বিয়ে, হনুমান ইত্যাদি), জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপকরণ (পালকি, ষাঁড়, লাঙল, তালগাছ, পান-সুপারি ইত্যাদি), পরী-রাক্ষস-দৈত্য এবং লোকাচারে বিশেষ তাৎপর্যবাহী পশুপাখি পেঁচা, ময়ূর, হাতি, বাঘ, সিংহ, কচ্ছপ, কাক ইত্যাদি)। ফুল-লতা-পাতার নকশা- তরঙ্গায়িত পুষ্পলতা, পদ্ম, কলকা, গোলাপ, মোচড়া ফুল, ফুলদানিতে ফুলসহ পত্রপল্লব ইত্যাদি মোটিফ যত্রতত্র নকশায় করতে দেখা যায়। বিদেশী নকশা হিসেবে বালবাস, অ্যাকান্থাস, ক্যাব্রিওল পায়া নকশা, থাবাপায়া টেবিল, ভিক্টোরিয়ান পায়া, ক্যাভিলাব্রা নকশা, পালঙ্কের সিরানা, প্যাটেরা নকশা, মশারির ছত্রী ইত্যাদি কাঠের তৈরি কারুশিল্পে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার হয়।

তাছাড়া বাংলায় ইসলাম ধর্মমতের প্রভাবে কাঠের তৈরি কারুশিল্পে বেশ কিছু প্রতীকের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন: মসজিদ-মিনার-গম্বুজ-তাজিয়া, আরবিতে আল্লাহু এবং নানা আয়াত, তরবারি ইত্যাদি। এমনকি জ্যামিতিক নকশাগুলোও (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত প্রভৃতি) সম্ভবত মুসলিমদের কল্যাণেই কাঠের তৈরি কারুশিল্পে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যদিও আরো আগে থেকে নানা লোকজ বিশ্বাস ঘিরে এ রকম নকশা চালু

ছিল। কেননা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটি বড় অংশের বিশ্বাস হলো, প্রাণির ছবি তৈরি করা একটি ধর্ম গর্হিত কাজ; তবে জ্যামিতিক নকশা নির্মাণে বাধা নেই। এই ধরনের নানাবিধ প্রভাব ছাড়াও ব্যক্তি জীবনের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা-অভিজ্ঞতার কথাও খোদিত হয় কাঠের তৈরি কারুশিল্পে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পে নকশার চরিত্র বা বৈচিত্র, ব্যক্তি চরিত্রের উপরেই গড়ে ওঠে। এজন্য প্রতিটি কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নকশার চরিত্র স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র

১. করুণাময় গোস্বামী, MZkZ‡K evsjvMvb, ঢাকা ঃ ভারত বিচিত্রা, ২০০১, পৃ. ৪৬
২. Sayamalkanti Chakravarti (Edited), Wood carvings of Bengal in Gurusaday Museum, Kolkata : Gurusaday Dutt Folk Art Society. 2001, P.7
৩. নুরউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), ‡ecYb we‡kølY, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ১৯৮৮-৮৯, পৃ. ২১
৪. আবুল ফজল আল্লামী, AvBb-B-AvKeix, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ৭২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৬. অরুন কুমার লাহিড়ী, KvV msiÿY weÁvb, ১ম খন্ড, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ১
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৮. আব্দস সাত্তার, evsjv‡`‡ki b‡ZvbZ¡vi‡kí, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ৪১-৪২
৯. অরুন কুমার লাহিড়ী, KvV msiÿY weÁvb (1g LÛ), ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ২
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২
১১. বুলবন ওসমান, Pvi‡Kjv cwi‡fvl, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৬, পৃ. ৮৭
১২. নন্দলাল বসু, wkíPPv, কলিকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১৪ বাংলা, পৃ. ১৪৮
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১৪. আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধরের সাক্ষাৎকার
১৫. অরূপ চন্দ্র, wk‡íi e¨vKiY, পশ্চিমবঙ্গ ঃ সুজয় প্রকাশণী, ১৯৯০, পৃ. ১৩
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. হারবার্ট রিড, wk‡íi mvi_, সন্দীপন ভট্টাচার্য (ভাষান্তর), কলকাতা ঃ দীপায়ন, পৃ. ৩৩
২০. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, Kv‡Vi KvR, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ১০৭
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
২২. আশুতোষ সূত্রধরের সাক্ষাৎকার থেকে
২৩. সৈয়দ মাহবুব আলম, Kvi‡kí wk‡íi cwi‡cÖÿZ, ÔKvi‡kíÕ, ঢাকা ঃ কারুশিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, জাবীন মাহবুব (সম্পাদিত), ১৯৯৩, পৃ. ১৯
২৪. নুরউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), ‡ecYb we‡kølY-5, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ১৯৮৮-১৯৮৯, পৃ. ২৮
২৫. নন্দলাল বসু, wkíPPv, কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৪বাং, পৃ. ১৬১
২৬. মো ঃ মোস্তাফিজুর রহমান, bKkvKjv, দিনাজপুর ঃ প্রকাশক মোঃ হাবিবুর রহমান, ২০০৮, পৃ. ৩৮
২৭. নন্দলাল বসু, wkíPPv, কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১৪ বাং, পৃ. ১৪৬
২৮. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ewׄRxexi †bvUeB, কলকাতা ঃ পুস্তক বিপণি, ২০০৫, পৃ. ২২৮
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
৩০. অরূপ চন্দ্র, wk‡íi e¨vKiY, পশ্চিমবঙ্গ ঃ সুজয়া প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ১৯
৩১. নন্দলাল বসু, ‘wó I mwó, শ্রী অম্লান দত্ত সম্পাদিত, কোলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১৯০৭, পৃ. ৩৭
৩২. Herbert Read, The meaning of art, great Britain: Penguin Books Ltd, 1931, P. 27-28.
৩৩. নির্মলকুমার ঘোষ, fviZwkí, কলিকাতা ঃ ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃ. ১৮৬
৩৪. জিনাত মাহরুখ বানু, evsjv‡`‡ki ‘vi‡kí, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ. ২৪০
৩৫. আলোক মুখোপাধ্যায়, wekwk‡íi i¦c‡iLv, কলকাতা ঃ বাকুলিয়া হাউস, ১৩৮৫ বাং, পৃ. ১১
৩৬. দীনেশচন্দ্র সেন, enr e½, 1g LÛ, কলকাতা ঃ দে’জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ৫৬৫
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০
৩৯. জিনাত মাহরুখ বানু, evsjv‡`‡ki ‘vi‡kí, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ. ২৪০
৪০. Shyamalkanti Chakravarti (Edited), *wood Carvings of Bengal in Gurusaday Museum,* Kolkata: Gurusaday Museum, 2001, P P 11.
৪১. প্রাগুক্ত
৪২. জিনাত মাহরুখ বানু, evsjv‡`‡ki ‘vi‡kí, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ. ২৪৩
৪৩. ওয়াকিল আহমদ, evsjvi †jvK ms¯‹wZ, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ. ৪২

পঞ্চম অধ্যায়

৫. বাংলাদেশের কতিপয় বিখ্যাত কারুশিল্পীর পরিচিতি ও শিল্পকৃতির নমুনা

শহুরে সভ্যতার বাইরে গ্রামে-গঞ্জের সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি কাঠের সামগ্রীর কারিগর বা কাঠের কারুশিল্পীরা কোন একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পী নয়। এরা বংশপরম্পরার শিল্পী। এই সব শিল্পী কিছু নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা যুগ-যুগ ধরে এ ধরনের কাজ করে আসছে। আমাদের দেশে মূলত এরা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এ ছাড়াও কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের ও পরিবার আছে যারা কাঠের তৈরি কারুশিল্প করেন।

বাংলাদেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কারুশিল্পীরা আছে যারা অনেকেই যুগ যুগ ধরে কাঠের তৈরি কারুশিল্প করে আসছে। কেউ কেউ স্থানীয়ভাবে এদেরকে 'সুতার' বলে। ফুলদানি, রেহাল, জলচৌকি, চেয়ার-টেবিল, চামচ, চুরির আলনা, পুতুল, খেলনা, লাঠি, কর্ণার ইত্যাদি তৈরি করে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পও কম ছিল না। সূত্রধরের উল্লেখ কয়েকটি লিপিতে পাওয়া যায়। "সূত্রধর যে শুধু কাঠ মিস্ত্রী, তাহাই নয়, আমাদের প্রাচীন বাস্তু-শাস্ত্রে (যেমন, মানসারে) সূত্রধর বলিতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠ-মিস্ত্রী সকলকেই বুঝাইত।"[১]

সাক্ষাৎকার নং ঃ ০১
তারিখ ঃ ২০/০৪/২০১৫
সময় ঃ ৫.৩৫
নাম ঃ শেখ মো ঃ আমিরুল ইসলাম
বাবার নাম ঃ শেখ সামাদ আলী মিস্ত্রী
মাতার নাম ঃ ফাতেমা বেগম
ঠিকানা ঃ দাদাপর রোড, জুগিয়া (শেখপাড়া), কুষ্টিয়া।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
বয়স ঃ ৫৭ বছর
মাসিক আয় ঃ বর্তমান আয়ে সব কিছুর পরেও ভালভাবে সংসার চলে।
পেশা ঃ কারুশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

প্রতিষ্ঠানের নাম- লালন শাহ্ কুটির শিল্প। ৪০ বছর ধরে এই কাজ করছে। বাবা ফার্নিচার মিস্ত্রী ছিলেন। বাবার সঙ্গে কাজ করতেন। কাজের ফাকে এগুলো করার চেষ্টা করতেন। ৭২-৭৩ থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ফার্নিচার করতেন যেদিন কাজ থাকত না সেদিন প্রশিক্ষণমূলক এই কাজ করতেন। পাখি,

পুতুল বানানোর চেষ্টা করেছেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বানিয়েছিলেন কঠিন হলেও মনে হয়েছিল আমি পারব। মনের মধ্যে একটা আর্ট এসে গেল। সবাই বলে ছিল ভালো হয়নি। নাক আঁকা নিয়ে অনেকের মন্তব্য তিনি শিক্ষনীয় ভাবে নিয়েছিল। পরবর্তীতে ঠিকঠাক ভাবে রূপ দেওয়ার জন্য আরো রবীন্দ্রনাথ বানিয়েছিলেন তিনটার পরে তার হাত এসেছিল। হাটস হরিপুর ইউনিয়ন বাসিন্দা তিনি সেখানে একজন কবি আজিজুর রহমানের জন্মদিনে জেলা প্রশাসক (১৯৯০ ১৮ই অক্টোবর) বিসিকের পরিচালক কাওসার আলী শেখ, পৌর চেয়ারম্যান বদরুদ্দোজা গামা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এর জন্য জেলা প্রশাসক তাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেন ঐ কবির পোর্ট্রেট করার জন্য এই তিনজন তার বিকাশের জন্য সহায়ক। ফুলদানি, ওয়াল র‍্যাক, টেবিল ল্যাম্প, ফ্লোর ল্যাম্প ট্রে, রেহেল, কোরআন বক্স। ফিগারের কাজ করতে ভাল লাগে। মেহগনি কাঠে বেশি করেন। কাঠ শোধন করেন। বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে কীটনাশক, তুত। ইউরিয়া, সোডা পানি দিয়ে কাঠ ভিজিয়ে সোহগা দিয়ে রাখেন ১৫ দিন। শোধনের পর তিনি কাঠ শুকিয়ে এগুলো তৈরি করেন। রঙ হিসেবে স্পিরিট পলিশ দেন।

মেহগনি কালার ব্ল্যাক অক্সাইড দিয়ে রঙ করেন। এই কালার সবাই পছন্দ করেন কাঠের জোড়া ভাঙ্গা থাকলে এই গাঢ় রঙ দেওয়ার কারণে ঢেকে যায়। ভালো কাঠ কুষ্টিয়ায় পাওয়া যায় না। তিনি লালনের গান গাইতে পারে। দশজনের ফ্যামিলি নিয়ে এই কাজ করে ভালোই চলছে।

তিনি নিজেই ডিজাইন করেন। পাখি করতে অরজিনাল পাখি দেখে অনুসরণ করে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক তৈরি করতে হয়। আরবিতে অনেক ক্যালিগ্রাফি করেছেন। আইডিয়া ক্রাফট, লীমা হ্যান্ডিক্রাফট এইগুলো পাইকারী বিক্রি করেন। তিনি বহুকালারের কাজ করেন না। খোদাইয়ের মাধ্যমে বোঝাতে চান। দেশীয় বাটালীর সাহায্যে কাজ করেন। তার এলাকার আশেপাশে এই কাজ আর কেউ বানায় না। ২ মেয়ে ১ ছেলে চেষ্টা করছেন বাবার মত কাঠের কারুশিল্প তৈরি করবে।

বিভিন্ন মেলায় বিশেষ করে চায়না মাল কম টাকায় বিক্রি করে। তাদের পারিশ্রমিক অনুযায়ী মাল বিক্রি করতে পারে না।

কাজ শুরু করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করেন। তিনি বলেন আল্লাহর কাছে আমার সহযোগিতা চাওয়া প্রয়োজন। তার সংগ্রহে অনেক ধরনের কাজ আছে। ওর্ডার অনুযায়ী কাজই বেশি করেন। সময় পেলে প্রাচীন কালচার যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলো করতে চান। নতুন প্রজন্মকে জানানোর জন্য পদক্ষেপ নিবেন। বৈশাখী, পৌষ মেলা রংপুর বসন্ত মেলা খুলনা বিসিক আয়োজিত মেলায় তার পণ্য বিক্রি করেন। জসীম উদ্দীন পল্লী মেলায় জসীম পদক পেয়েছেন।

১৪০২ সালে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে নির্বাচিত হন। 'ভেনার মার সংসার' শিরোনামে কাজ করে দক্ষ পুরস্কার পান। এছাড়াও কামরুল হাসান বৃত্তি পান। রবীন্দ সঙ্গীত শিল্পী সানজীদা খাতুন ও পাপিয়া সারোয়ার তাকে সংবর্ধনা দেন। কুষ্টিয়ায় পুলিশ সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজিত বই, পূষ্প ও মীনা বাজার কারুশিল্প দোকানের ১ম পুরস্কার লাভ করেন। এস.পি মানিক খসরু ইহা প্রদান করেন। গ্রামীণ ফোনের জন্য কাঠের কারুশিল্প বাবদ ১১,০০০০০ টাকা কাজ পান। তিনি দক্ষভাবে তা সম্পন্ন করেন।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ০২
তারিখ ঃ ২৩/০৪/২০১৫
সময় ঃ ২.৩৫
নাম ঃ মো ঃ হায়দার আলী
বাবার নাম ঃ মৌলভী কামরুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ জমিলা খাতুন
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ আমলাবো, থানা ঃ বেলাবো, নরসিংদি।
বয়স ঃ ৫৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ তৃতীয় শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ প্রতিদিন ৬,০০০ টাকা
পেশা ঃ ব্যবসায়ী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

এই অঞ্চলে এত কাঠের কাজ হচ্ছে কারণ কি? পাহাড়ী এলাকা গাছের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে এখানে পূর্বে থেকে কাঠের কাজ হয়। এখানে কাঠাল গাছের সংখ্যা বেশি। আর ওয়ারী বটেশ্বর এখানে হওয়ার কারণে এর চতুর্দিক ঘিরে এইসব শিল্প তৈরি হয়েছে। এক সময় অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে প্রচুর হিন্দুদের বসবাস ছিল। এদের মধ্যে সূত্রধর সম্প্রদায় ছিল এই অঞ্চলে বেশি। তারা আগে কাঠের নান্দনিক কাজ করতেন। আগেতো কাঠের জিনিসের চল ছিল ব্যবহার্য জিনেসের সবকিছুই তেরি হত কাঠ দিয়ে। এই কাজের সবটুকুই সূত্রধর সম্প্রদায় করত। তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা আস্তে আস্তে শিখেছে। এখনতো সবাই মুসলমান মিস্ত্রীরা এই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। আগে এসব কাঠ দিয়ে লাকরি বেশি হতো। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় লাকরি যেত। এখন ঐ সব কাঠ দিয়েই ফার্নিচারসহ বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্প করছে। স্থায়ী অর্থাৎ টেকসই কারুশিল্প এবং ওয়ান টাইম কারুশিল্প তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ বেশি দিন টিকবে না। আগে যারা করত তারা মারা গেছেন। এখন অনেকে এগুলো করছেন। তিনি আরেকটি কারণ উল্লেখ করলেন আশেপাশে কলকারখানা না থাকায় এই কাজটা এখানে গড়ে উঠেছে ব্যাপক আকারে। আগে ক্ষুদ্র আকারে ছিল এখন বৃহৎ আকারে হচ্ছে। বেশি হওয়ায় কারণে উদাহরণ দিলেন আগে ১০টা এখন ১০০টা হয়। এজন্য লাভ কম হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখান থেকে মাল যায়। নোয়াখালি, সিলেট, কুমিল্লা, চিটাগাং, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর এমনকি ঢাকাতেও যায়। বেশির ভাগ এই অঞ্চলে মেলা গুলোতে এইসব কারুপণ্য বিক্রি হয়। নোয়াখালি, কুমিল্লা, সিলেট, চিটাগাং ইত্যাদি অঞ্চলে বেশি চলে। কিন্তু মেলাতে বিক্রি হয় বেশি। মেলাতে যারা আসে তারা সারা বছর টাকা জমিয়ে রাখে এবং মেলাতে আসেন। মেলাতে এই কারুপণ্য ক্রেতারা ক্রয় করে। মূলত এইসব পণ্য খুব সস্তা। ৮০% রেন্ট্রি কড়ই, অন্যান্য ২০%, কাঠাল একাশি, জলপাই, ইপিলিপি ইত্যাদি কাঠে কারুশিল্প তৈরি হয়। মাঝে মাঝে মেহগনি দিয়ে তৈরি করেন। সেগুন কাঠ খুব কম ব্যবহার করেন। কাঠকে সিজন করা হয় না। রঙ পলিশ করা হয়। বাণিজ্যিক ভাবে হওয়াতে মহিলারা এই কাজ করেন না। কারণ এই কাজটা বাড়ির আঙ্গিনায় করেন না। আমলাবো বাজারে বড় জায়গা জুড়ে একাজ সম্পন্ন হয়। আলনা, খাট, চেয়ার, জলচৌকি, হিন্দুদের বিয়ের পিঁড়ি, টেবিল, চেয়ার, টি-টেবিল, পিড়ি, বাক্স, কর্ণার তাক, লাঙ্গল, ড্রেসিং টেবিল, ছোট ছোট আয়নার ফ্রেম, ছোট বড় বেঞ্চ ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য কারুশিল্প তৈরি করেন। এই কাজ করার জন্য সামাজিক মর্যাদা ঐরকম নেই। একেবারে অসম্মানজনক তা নয়। কেউ কেউ অনেক মর্যাদা দেন। এই বাজারে ১২০০/১৩০০ লোক এই ব্যবসার সাথে জড়িত। আল্লাহ্ যতদিন করায় এই কাজ করবেন তিনি।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ০৩
তারিখ ঃ ২৩/০৪/২০১৫
সময় ঃ ৩.০৬
নাম ঃ মো ঃ জাকির হোসেন
বাবার নাম ঃ মো ঃ সুলতান উদ্দীন
মাতার নাম ঃ মরিয়ম বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ কান্দুয়া, ইউনিয়ন ঃ আমলাবো, থানা ঃ বেলাবো, নরসিংদী।
বয়স ঃ ২৮ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ মেলার সিজনে ২০,০০০ টাকা
পেশা ঃ কারুশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

তার বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার পরে তার করা কাঠের তৈরি কারুশিল্পের কাজ গুলো দেখালেন এবং বর্ণনা করলেন। খুব সহজ ভাবে বলা শুরু করলেন। তিনি নিজেও সহজ-সরল একজন মানুষ। তিনি পারিবারিক সূত্রে একাজ পেয়েছেন। বাবা-দাদার আমল থেকে দেখে এসেছেন। বাবা দাদারাও করতেন। স্বাধীনতার পর পর দাদা ২০টা বেলনা বিক্রি করতেন ৫/৬ টাকায়। জাকির হোসেন বললেন আনুমানিক ১৫০/২০০ বছর আগে থেকে তাদের পরিবার এই কাজ চলছে। তিনি জানালেন মোটরের মেশিনও কুন্দানো নামেই

পরিচিত। জাকির হোসেন এই গ্রামে প্রথম এই মেশিন এনেছেন। তিনি শুনেছিলেন যে যশোরে ইলেকট্রিক মেশিন দিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে। পরে যোশর থেকে আনার ব্যবস্থা করেন। তার চেষ্টাতেই আনেন। ফলে তার উৎপাদন বেশি হয়। অনেক 'সময়' শাস্রয় হয়। বেলনা, গাছা, খুন্দরী (ডুগডুগী), ফার্নিচারের পায়া, রুটি বানানো বার্মিজ পিঁড়ি, লাটিম ইত্যাদি বানায়। গ্লেজের কারণে বার্মিজ নাম হয়েছে। পাউডারের মত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বলে, তা বাজার থেকে কিনে এনে আগুনে হিট দিয়ে চাকার মত বানায়। পরে মেশিনে ঘুড়িয়ে ঐ বার্নিশ ধরলে কাঠে গ্লেজ দেয়। চক বাজারে পাওয়া যায়। ২০০০ টাকা কেজি।

কাঠাল কাঠ, গাব, মেহগনি, ইত্যাদিতে এ কাজ করেন। কাঠাল কাঠের বেলনা ২০ টাকা, গাব ২৪ টাকা, কাঠালের সার কাঠে গড়ে ৫০/১০০ টাকা, রেন্ট্রি ১৪ টাকা, মেহগনি ২০ টাকা। প্রভৃতি দামে বিক্রি করেন। কুন্দরী (ডুগডুগী) অর্ডার পেলে তৈরি করেন। এছাড়া মেলা সামনে রেখে এগুলো তৈরি করেন। মেলা আসার আগে আগে এগুলো পরিমানে বেশি তৈরি করেন। এসব কাঠের তৈরি কারুশিল্প তৈরি করতে গিয়ে প্রথমে যে পণ্যটি তৈরি করবে তার আদলে কাঠ কেটে সাইজ করে নেয়। একাই করে পাশাপাশি বাবা-মা দুজন সহযোগিতা করেন। এটা করেই জীবন চলছে। এ কাজ করে আয় ভালই করে। তার ছোট ভাই মাস্টার্স পড়ছেন। সরিষা রংয়ের বার্নিশ দেন। রঙ করার পরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বার্নিশ দেন। বেলাবো এবং জোহর বাজারে হাটের দিনে এই পণ্য বিক্রি করেন। এখন বেশির ভাগ সময়ই বাড়ি থেকে কারুপণ্য নিয়ে যায়। এই ধরনের কাজ কান্দুয়া গ্রামের ২০/২৫ টা ফ্যামিলি করে থাকে। আমাদের গ্রাম এ কাজের জন্য আশে-পাশে পরিচিত।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ০৪
তারিখ ঃ ২৩/০৪/২০১৫
সময় ঃ ৪.৩১
নাম ঃ জয়নাল আবেদিন
বাবার নাম ঃ কদর আলী
মাতার নাম ঃ রাজুফা বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ রাজারবাগ, ইউনিয়ন ঃ আমলাবো, পোস্ট ঃ মৌলভীটেক থানা ঃ বেলাবো, নরসিংদি।
বয়স ঃ ৬৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠনিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ ১০,০০০ টাকা
পেশা ঃ কাঠমিস্ত্রী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

কাঠ মিস্ত্রী হিসেবে আমলাবো এলাকায় তার নাম সুপরিচিত। তিনি জাত মিস্ত্রী। তার বাবা-দাদা, বাবার দাদা সবাই মিস্ত্রী ছিলেন। তার ছেলে, নাতি তারাও এ কাজ করছে। তিনি কাঠাল কাঠে কাজ করতে ভালবাসেন। তার কাছে কাঠাল কাঠের রং সুন্দর লাগে। অনেক কিছু বানাতে পারেন। যা কিছু দেখেন তাই কাঠ দিয়ে তৈরি করতে পারেন। কেউ অপরিচিত একটা কিছুর যা কখনো দেখেননি তার একটা মডেল এনে দিলে হুবহু তা তৈরি করে দিতেন। গাছা, চাকা, বেলনা, পিড়ি, বাজনা বাজানো খুঞ্জরী, ডেউয়া, লাঠি ইত্যাদি সহজেই তৈরি করে করতেন। এখনও অর্ডার পেলে তৈরি করেন। তবে ফার্নিচার ক্রাফটের কাজ বর্তমান বেশি করেন। তার বড় ছেলের নাম - মঞ্জিল। তিনি ভাল নকশা করেন। আরো দুই ছেলে রতন মিয়া ও স্বপন মিয়া। নাতি ইমরান হোসেন সবাই নকশা মিস্ত্রী। তাদের কাজ দেখার সুযোগ হলো। সুন্দর সুন্দর নকশায় আসবাবপত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। জয়নাল আবেদিন বসন্ত রঙ, মেহগনি রঙ, সিদুর রঙ, সরিষা ফুল রঙ ইত্যাদি রঙ কাঠে ব্যবহার করেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো বাবা-দাদার মুখে মিস্ত্রী বা কাঠের উপর কোন ধরনের গান, শ্লোক, ছড়া শুনেছেন ? তিনি বললেন না। এরকম কিছু বলতে শুনিনি। কাঠের উপর কোন গানও নাই। এ কাজ করতে গিয়ে এত শব্দ হয়, অন্য কিছু করার সুযোগ নেই। হাসলেন হা হা হা করে আর বললেন সারাজীবন এই কাজ করে যাবেন। যতদিন ধৈর্য্য থাকে ততদিন এই কাজ করে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ০৫
তারিখ ঃ ২৩/০৪/২০১৫
সময় ঃ ৫.৩০
নাম ঃ মো ঃ হুমায়ুন ভূইয়া
বাবার নাম ঃ মো ঃ শহীদুল্লাহ ভূইয়া
মাতার নাম ঃ জায়েদ বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ কান্দুয়া, ইউনিয়ন ঃ আমলাবো, থানা ঃ বেলাবো, নরসিংদি।
বয়স ঃ ২৪ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ ৩০,০০০ টাকা
পেশা ঃ কারুশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

নিজেকে কারুশিল্পী হিসাবে পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করেন। যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো আপনার পেশা কি? এক কথায় বললেন কারুশিল্পী। এমনভাবেই পরিচয় দিলেন। তিনি যে শিল্প উৎপাদন করেন তার নাম সিহাইট বা সিয়া। অত্র এলাকায় পরিচিত সিহাইট নামেই। চাল কোটা, মরিচ কোটা, ধান কোটা, মাশের ডাল বানানো ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘাইলে ব্যবহার হয়। সৃষ্টিঘরের এলাকার লোক ৪০/৫০ বছর আগে সিহাইট বানাতো। রান্দা দিয়ে গোল করে করে তৈরি করত। প্রথম দিকে দড়ি টানা কুন

মেশিনে বানাতেন। পরে ইলেকট্রিক মোটরে ঘুরানো কুন্দার মেশিন তিনি এনেছে এই গ্রামে। সিয়াগুলো ৫.৫ ফুট থেকে ৬ ফুট লম্বা হয়। এটাতে বেশি নকশা হয় না। দুই মাথাতে রেখার মত নকশা হয়। এর একমাথা চোখা, এটাকে উচ্যা বলে। পিঠার আটা গোলানোর জন্য উচ্যা ব্যবহার হয়। আরেক প্রান্তে গোলা (লোহার রিং) থাকে। ধান বানা বা চাউল গুড়ার কাজে ব্যবস্থার করা হয়। এখন তিনি শুধু সিহাইট বানান। এগুলো কাঠ দিয়ে বানান, এছাড়া লোহা, কুন্দল, আর নিয়র কাঠ ব্যবহার করেন। এগুলোতে তিনি রঙ দেন। রঙ এর মধ্যে বেড আক্সাইড, খয়ের, এবং কাপড় কাঁচা সোডা একসাথে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা হওয়ার পরে সিহাইটে লাগান। শুকানোর পরে মোম পলিশ দেন। পরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে পলিশ দেন। রঙ ও পলিশ দেওয়ার আগে শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে ঘষে মসৃণ করেন। কাপড় কাঁচা সোডা কম দেন। খয়ের এবং সোডা দেন সুন্দর রঙ হওয়ার জন্য। কখনও কখনও পুড়িয়ে রঙ আনা হয়। ২০০ টাকায় একেকটা সিহাইট বিক্রি করেন। এখন প্রতিদিন ২৫-৩০ এর বেশি সিহাইট তৈরি করতে পারেন। তিনি সারি কাঠ দিয়ে এগুলো করে থাকেন। এই পণ্যগুলো মেলাতে বিক্রি হয়। এছাড়াও অর্ডারের কাজও করেন। কেউ অর্ডার দিলে তার কাজ দ্রুত করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বেলাবো এর হাটে তার পণ্য বিক্রির জন্য তোলেন। ঠিক সময়ে মেলা হলে এবং দেশের অবস্থা ভাল থাকলে, ভাল বিক্রি হয়। বিদ্যুতের রেট কম থাকলে তারা লাভবান হয়। লোডশেডিং এই কাজের জন্য বড় সমস্যা। এর কারণে টার্গেট ফিলাপ বা পূর্ণ হয় না। বাড়ির মহিলারা এই কাজে তাকে সাহায্য করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হলে এটা আরও ফলপ্রসু হত। এই গ্রামে এ কাজ ২০/২৫ টা ফ্যামিলি এখনও করে যাচ্ছে। তারা এই কাজের উপর নির্ভরশীল।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ০৬
তারিখ ঃ ২৪/০৪/২০১৫
সময় ঃ ৬.৩০
নাম ঃ মো ঃ আব্দুল আউয়াল
বাবার নাম ঃ মো ঃ আব্দুর রহমান মুন্সী
মাতার নাম ঃ ফিরোজা বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ হাড়ি সাংগান, পোস্ট ঃ চন্দনপুর, উপজেলা ঃ বেলাবো, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৫০ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ ১২,০০০ টাকা
পেশা ঃ কারুশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

আগে কাহাইল তৈরি করতেন বর্তমানে কাহাইল তৈরির প্রতিষ্ঠানের মালিক। এখনও তৈরি করেন তবে কম। এটা তৈরি করা কষ্টসাধ্য। অন্যান্য টেকনিক্যাল কাজগুলো তিনিই করেন। যেমন পোড়ানোর কাজটা। তার কারখানায় ৬ জন মিস্ত্রী কাজ করেন। প্রায় ২৫/৩০ বছর ধরে এই কাজ করেন। এটাকে 'ঘাইল' বলে। আঞ্চলিক শব্দ ' ঘাইল ' হিসাবে এই এলাকায় পরিচিত। কাঠ দিয়ে বানায়। চাউল গুড়া, ধান থেকে চাল করা, মরিচ গুড়া, হলুদ গুড়া ডাউল বানানো ইত্যাদি কাজে ব্যবহার হয়। বড়ইর ভর্তার কাজে বিশেষ করে আচার তৈরির কাজে ব্যবহার হয়। তার জীবনের ইতিহাস টেনে বললেন- তিনি বিড়ির ফ্যাক্টরি দেন। বিড়ির নাম ছিল আউয়াল বিড়ি। খুব চলত। এক সময় এই এলাকায় সর্বহারার খুব দাপট ছিল। সর্বহারারা সব লুটপাট করে নেয়। তারপর দিশেহারা। তখন কোন কিছু ঠিক না পেয়ে পেটের দায়ে শুরু করেছিলেন। সেই যে শুরু এখনও করে যাচ্ছি। এগুলা করতে ভাল লাগে। যখন এগুলা নিয়ে মেলায় যাই মেলাতে অনেক বিক্রি হয়। নিজেকে অন্য রকম মনে হয়। সবাই সম্মানও করে। একেকটা কাহাইল ৫০০-৭০০/= মধ্যে বিক্রি করেন। বিভিন্ন মেলায় বিক্রি হয়।তিনি মনে করেন এখন থেকেই সারা বাংলাদেশে সরবরাহ হয়। চাহিদাও বেড়েছে। তার কথায় আমার মনে হলো ঢেঁকির বিকল্প হিসেবে এর ব্যবহার হচ্ছে। মতলবের "সোলেমান ল্যাংটার মাজারের" মেলায় প্রায় ২০০০/= ঘাইল বিক্রি করেন। ব্রাক্ষণবাড়িয়ার আখাউড়া কেল্লার মেলায় ৪০০০-৫০০০ টাকা বিক্রি হয়। দেবিদ্দার কুমিল্লার মেলায় ১,৫০০ টাকা বিক্রি হয়। ধামরাই রথের মেলা গাজীপুরের রথের মেলা লাঙ্গল বন্দের মেলায় ১৫০০-২০০০/= ঘাইল বিক্রি হয়। আরও কিছু মেলায় ৫০০-১০০০/= ঘাইল বিক্রি হয়। ট্রাকে করে নেন। অনেক ওজন হয়, ট্রাকে ছাড়া সম্ভব নয়। এক সপ্তাহে ১০০০ ঘাইল ২০ জন মিস্ত্রী মিলে তৈরি করতে পারেন একদিনে একজন মিস্ত্রী ৫টা ঘাইল তৈরি করতে পারেন। এই এলাকায় ৬ জন মালিকের ৬টি কাঠের হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে তার ঘাইল বেশি বিক্রি হয়। হাড়ি সাংগান গ্রামের ৬ জন মালিকের ঘাইল বিক্রির হিসাব একসাথে বলেছেন। এই গ্রামে হিন্দু সূত্রধররাই প্রথমে 'ঘাইল' বানাতেন। অনেক আগের কথা তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা শিখেছে। হিন্দুরা সবাই ইন্ডিয়াতে চলে গিয়েছে। এখন একটাও হিন্দু পরিবার নেই। অশনি, মোহিনী, উমাসহ আরও কয়েকজন সূত্রধর সুন্দর ঘাইল তৈরি করতে পারতেন। কতদিন ধরে এই কাজ এখানে হয়ে আসছে তাতো সঠিক জানা নেই। তার দাদাও এই কাজ এই অঞ্চলে করতে দেখেছেন। তবে আনুমানিক ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই কাজ এখানে হচ্ছে। রহিন্যা, আম, কড়ই, গাব ইত্যাদি কাঠে করে থাকেন। এলাকায় কাঠ পাওয়া যায়। সব সময় চাহিদানুযায়ী পাওয়া যায় না। যশোর, খুলনা থেকে কাঠ আনেন। ধোয়া দেন। কালো কালো রঙ হয়। পোকা-মাকড় ধরে না। এরজন্য সিহাইট প্রয়োজন কিন্তু তারা বানায় না। কান্দুয়া গ্রামের কিছু লোক

বসবাস করে তারা বানায়। আব্দুল আউয়াল ধোয় দেয়ার করণ-কৌশল বললেন-প্রথমে মাটি গর্ত করেন। প্রায় ২ ফুট পরিমাণ গর্ত করেন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জায়গা অনুযায়ী করে থাকেন। সর্বনিম্ন প্রস্থ ৫ ফুট দৈর্ঘ্য ৬ ফুট করে থাকেন। গর্তের উপর লোহার বড় এমনভাবে বসিয়ে দেন যেন এর উপরে কাহাইলগুলো সাজাতে পারে। গর্তের ভিতরে কাহাইল তৈরির সময় কাটা কাঠের টুকরা অব্যবহৃত কাঠ দিয়ে ভরে আগুন জ্বালায় তখন ধোয়ার সৃষ্টির হয়। এই ধোয়া কাহাইল এর গায়ে লাগে। এই অবস্থায় প্রায় ১২ ঘন্টা রাখতে হয়। ফলে কাহাইলের গায়ে কালচে রঙ ধারণ করে। নেচারাল এই রঙ দেখতেও সুন্দর লাগে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ০৭
তারিখ ঃ ২৪/০৪/২০১৫
সময় ঃ ৭.০০
নাম ঃ রশিদ মিঞা
বাবার নাম ঃ মো ঃ আব্দুল রহমান মুন্সী
মাতার নাম ঃ ফিরোজা বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ হাড়ি সাংগান, পোস্ট ঃ চন্দনপুর, ইউনিয়ন ঃ বাজনাবো, থানা ঃ বেলাবো, নরসিংদি।
বয়স ঃ ৩৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ ১০,০০০ টাকা খরচ সহ
পেশা ঃ কাহাইল মিস্ত্রী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

কাহাইল তৈরির কাজ বড় ভাইয়ের কাছে শিখেছেন। এখনও বড় ভাইয়ের কারখানায় কাজ করেন। ঐ এলাকায় কাহাইলকে ঘাইল বলে। ঘাইল বানাতে তিনি করাত পরে কুড়াল, বাইশ, পরে হাতুড়ি বাটাল ব্যবহার করেন। এইসব টুলস কর্মকারের কাছ থেকে আনেন। কুড়াল দিয়ে গর্ত করেন। গর্তের ফিনিশিং বাঁকা বাটালী দিয়ে করেন। গর্তটা ঘাইলের সাইজ দেখে হয়। ৮"-১০" পর্যন্ত গর্ত হয়। কোন কোনটা ১২" পর্যন্তও গর্ত হয়। এই পণ্য গৃহস্থোরা বেশি কেনে। ওজন ওয়ালা কাঠে করে থাকেন। যাতে কাত হয়ে না পড়ে। প্রশ্ন করা হল এই ঘাইলের সাইজ এবং শেপ এমন কেন ? তার উত্তরে তিনি বলেন যে সেই ছোটবেলা থেকে এমন আকার আকৃতি দেখে আসছেন। উপরের অংশটা মোটা কারণ এখানে চাল, ধান বা অন্যান্য জিনিস রাখতে হয়। আর নীচের অংশটা বসে থাকতে পারে এজন্য ছড়ানো। অনেকটা মোড়ার মত। সম্পূর্ণ কাজ শেষ হলে ধোয়া দেওয়া হয়। "এই কারখানায় আমরা একেক কাজ একেকজন করি কেউ কুড়াল দিয়ে কাটেন, সে শুধু কুড়াল দিয়েই কাটছে। কেউ বাকা বাটালী দিয়ে কাটছে এবং ফিনিশিং দিচ্ছে। আমি বাইশের কাজ করি। একদিনে আমরা চার-পাঁচ জনে ১৫-২০টি ঘাইল তৈরি করে

থাকি।" তবে এই দলীয় পদ্ধতিতে কাজটা আগায়। এইজন্য এভাবে করা হয়। কাঠ কাঁচা বা ভেজা অবস্থাতেই কাজ করেন। কারণ কাটতে সুবিধা হয়। এই কাজের জন্য সুন্দর সাইজের কাঠের প্রয়োজন হয়।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ০৮
তারিখ ঃ ২৪/০৪/২০১৫
সময় ঃ ৮.০০
নাম ঃ আসমা বেগম
বাবার নাম ঃ আব্দুল কুদ্দুস
মাতার নাম ঃ জবেদা বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ হারি সাংগান, পোস্ট ঃ চন্দনপুর, থানা ঃ বেলাবো, নরসিংদী।
বয়স ঃ ২৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ ১২০০০ টাকা খরচসহ
পেশা ঃ কাহাইল বা ঘাইল মিস্ত্রী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

পেটের দায়ে ঘাইলের কাজ করেন। তারা তিন বোন। বোনের বিয়ে হয়েছে এই এলাকায়। এই কাজে টাকা বেশি। এই কাজ ছাড়া অন্য কাজও আগে ছিল না। তাই এই কাজই করেন। এখানে কলকারখানা নেই বললেই চলে, অন্য কাজ করার সুযোগ কম। এই কাজ করতেও ভাল লাগে। ১৪/১৫ বছর যাবৎ করছেন। সেই ১০ বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেন। বাবা দুই বিয়ে করায় তাদের ফেলে অন্যত্র থাকেন। তিনি তাঁর মায়ের সাথে থাকেন। দুই বোনও থাকেন। মা-বোন তাঁর ইনকামের উপর নির্ভরশীল। তাইতো কঠিন কাজ করছেন। ছোট বোনকে লেখা পড়া করাচ্ছেন। এটা যে একটা শিল্প তা তিনি জানেন না। এটা একটা কারুশিল্প, কাঠের তৈরি কারুশিল্প। শুনে হাসলেন, "তাইলেতো ভালা কাজ করতাছি।" পুরা কাজটাই তিনি করে থাকেন। প্রতিদিন ৪/৫টা তৈরি করেন। আব্দুল রশিদের ছোট কারখানায় কাজ করেন। বাড়ি থেকে খেয়ে যান। মালিক কোন বৈষম্য করেন না। পুরুষদের সাথে কাজ করেন, সমান টাকার পারিশ্রমিক পান। ভবিষ্যতে এই কাজ করার প্রতিশ্রুতি আছে। মেয়েদের মধ্যে একমাত্র তিনিই এই কাজ করে থাকেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘাইলের কাজ মেয়েরা করে কিনা জানা নেই। বিভিন্ন আকারের ঘাইল হয়ে থাকে। তবে ১২" ইঞ্চি উচ্চতার ঘাইল বেশি হয়ে থাকে। কাহাইলের সাইজটা এমন কেন ? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়ে তিনি বললেন, এমনটা সুন্দর দেখায়। আসলে সুন্দর দেখার জন্য। এর গায়ে কোন নকশা বা ডিজাইন করা হয় না। এটা করতে তার খুব পরিশ্রম হয়। সকাল ৬.০০-বিকাল

৪.০০ পর্যন্ত এই কাজ করেন। আগে রাত্রেও করতেন। মেলার চাপ থাকলে এখন ও রাত্রে ওভার টাইম হিসেবে করেন। বেশি কাজ করলে বেশি টাকা পান। একেকটা ঘাইল বানাতে একশ টাকা মজুরী পান। শুক্রবার ছুটি থাকে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ০৯
তারিখ ঃ ৪/৫/২০১৫
সময় ঃ ১২.০০
নাম ঃ অংক্যচৌ
বাবা ঃ উঈক্য
মা ঃ মাখয়সিং (মৃত)
বয়স ঃ ৪০ বছর
বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ ডলুপাড়া, ডাকঘর ঃ বান্দরবান, থানা ঃ বান্দরবান, জেলা ঃ বান্দরবান।
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ ডিপ্লোমা, বাহান চারুকলা, রেঙ্গুন।
ধর্ম ঃ বৌদ্ধ
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তবে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে পারিবারিক পর্যায়ে বাংলাদেশী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যার ফলে তিনি বাংলায় লিখতে ও পড়তে পারেন। তিনি মিয়ানমারে "basich education high shcool" পাশ করে রেঙ্গুনে "বাহান চারুকলা ডিপ্লোমা কলেজ" থেকে ভাস্কয্ ও পেইন্টিং বিষয়ে তিন বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। ডিপ্লোমা কোর্স শেষে বিভাগীয় শিক্ষকদের সাথে সহযোগী হিসেবে আরও চার বছর কাজ শেখেন।

তার কোনো বোন নেই। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দুরন্ত স্বভাবের। লেখা-পড়ায় মন ছিল না। শত চেষ্টা করেও প্রাথমিক স্কুলের গন্ডি পার হতে পারেননি। বার বছর বয়সে তিনি আত্মীয়দের সাথে মায়ানমারে চলে যান। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তিনি দেশে ফিরে এসে পৈত্রিক বাড়িতে থেকে কক্সবাজার, চট্রগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে বিভিন্ন বৌদ্ধমন্দিরে বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও অপরাপর মন্দিরে ধর্মীয় ভাস্কর্য নির্মাণসহ কাঠের তৈরি কারুশিল্পের কাজ করে চলেছেন।

২০০৫ সালে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তার পাঁচ বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তার বাবা ইচ্ছে ছিল তনি যেন সাংবাদিক হন। কিন্তু ছোটবেলায় বার্মা চলে যাওয়ায় তা আর হয়ে উঠেনি। পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসার পর আবারও তার বাবা তাকে সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করেছিলেন কিন্তু এবারও তা হয়নি। এতদিনে অংক্যচৌ মনে-প্রাণে একজন শিল্পী হয়ে উঠেছেন। তিনি বিদেশে চারুশিক্ষায় শিক্ষিত হোন এটা তার বাবা চাইতেন না। তাই অনেক অর্থকষ্টের মধ্যে তাকে শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়েছে।

তার মা ছেলের শিল্পচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। তার মা নিজের সঞ্চিত টাকা ছেলের জন্য পাঠাতেন। মায়ের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণাই তাকে শিল্পী করে তুলেছে।

২০০৮ সালে তিনি বান্দরবানের মধ্যপাড়ায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। বাসার পাশেই মায়ের নাম "মাখয়সিং চারুকলালয়" নামক একটি চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এখানে তিনি কাঠসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ভাস্কর্য, পেইন্টিং ও টেরাকোটা সহ কাঠের তৈরি কারুশিল্প নির্মাণ করেন এবং শিক্ষা দেন। তার প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন নবীন শিল্পী কাজ শিখছেন। তার কাঠের তৈরি কারুশিল্প পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীও তৈরি করেন। তার কাজে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য ও মায়ানমারের শিল্প বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটেছে। প্রতিদিন তার প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষ থেকে সমাজের উচ্চশেণীর মানুষ ভিড় করে শিল্পসৃষ্টি অবলোকন করে মুগ্ধ হন।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১০
তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০১৫
সময় ঃ ৫.০০
নাম ঃ সুবল দাস
বাবার নাম ঃ রসময় দাস
মাতার নাম ঃ চন্দন বালা দাস
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ ফতেহপুর পোস্ট ঃ মির্জাপুর, থানা ঃ মির্জাপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
বয়স ঃ ৫০ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ ২০,০০০ টাকা
পেশা ঃ বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

বংশগত পেশা। ছোটবেলা থেকে যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই এই কাজ করছেন। সাত পুরুষ পর্যন্ত তিনি জানেন তারও বেশী পুরুষ পর্যন্ত এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এই কাজ করার জন্য নিয়ম কানুন আছে।কাঠ কুন্দিয়ে হাতে টানা কুন্দানো মেশিন দিয়েই এখন কুন্দান। তবলার জন্য নিম কাঠ, ঢোলের জন্য আম কাঠ, রেন্ট্রি, ঢাকের জন্যও আম, রেন্ট্রি কাঠ ব্যবহার করেন। খুঞ্জরি, খমক, বঙ্গ, নাল ইত্যাদি তৈরী করেন। ঢাক ঢোল অনেক পুরাতন বাদ্যযন্ত্র। বঙ্গের বয়স সবচেয়ে কম তবুও একশত বছর হবে। এসব কাজের জন্য কাঠ সিজন করতে হয়। আম কাঠ পানিতে ভিজিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে মোটামুটি ১মাস রাখতে হয়। তুতে কেরোসিনের তেল মিশিয়ে শুকনা রেন্ট্রি কাঠে লাগান। ১-২ দিন লাগিয়ে রাখেন এতে ভালো কাজ হয়। পোকামাকড় ধরে না। তবলার জন্য গুটি প্রয়োজনীয় কাঠের কারুশিল্প। কিন্ত

যশোর থেকে এগুলো আসে রেডিমেট কিনে লাগিয়ে দেন সময়ের ব্যাপার তাই গুটি তৈরি করেন না। এ সব কাজের ভিষণ চাপ থাকায় গুটি তৈরি করতে পারেন না। তবলায় চামড়ার কাজ নিজেরাই করেন। তবে সুন্দর তবলার চামড়ার ছাউনি নাটোর থেকে আসে। তারা আবার শুধু চামড়ার কাজ করে থাকেন। সুন্দর করে অনেক সময় নিয়ে করেন। একদিনে ৫/৬ টা তবলার কাঠের কাজ করা যায়। হাতে বাটালি দিয়ে গর্ত করেন। ঢোল, ঢাক সব কিছুই খুদতে বাকা ঢেউ তোলা বাটালি দিয়ে গর্ত খোদেন। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করেন। তিনি বললেন টাঙ্গাইল এবং মানিকগঞ্জের নকশায় কোন পার্থক্য নাই। তবে সুবল দাস বললেন "আমরা ভালো বানাই ফিনিশিংটাও সুন্দর হয়।" কিভাবে কার কাছ থেকে শিখেছে তা জানা নেই। তবে এর উৎপত্তি বাংলাদেশেই। তার পূর্ব পুরুষরা একজনের কাছ থেকে আরেকজন শিখেছে। তিনি যেমন তার বাবার কাছ থেকে শিখেছেন। তার বাবা যেমন তার দাদার কাছ থেকে শিখেছেন বংশানুক্রমে কাজ ধারাবাহিকভাবে শিখে চলেছেন। পরবর্তী প্রজন্মকে এই কাজ শেখাবেন না। এত শত শত বছরের কাজের ইতি টানতে চান।

খোদাই করে তবলার গায়ে নকশা করেননি। কুন্দানো মেশিন দিয়েই নকশা করা হয়। মাঝে মাঝে বাটালি দিয়ে খাচ কাটার মত নকশা করতেন। তবলার সাইজ এরকমই হয়, আগে হয় হাতে করত এখন কুন্দিয়ে নকশা করেন।

ঢাক= দৈর্ঘ ২৪" x পেটে ৬০" x এক মুখে ২০" x আরেক মুখে ১৯"
ঢোল= দৈর্ঘ ২০" x পেটে ৪৮" x এক মুখে ১০" x আরেক মুখে ৯.৫"
তবলা= উচ্চতা ১১" x মুখে ৫"
বঙ্গ = ১০" x ৬" নিচে ৫"
খমক = দৈর্ঘ ৮" x ৪" মুখ

ফতেহপুরে ৩০০ জন দাসের মধ্যে প্রায় ২০০ জন এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত। আগুন (অগ্রাহায়ণ) ও পৌষ মাসে বাদ্যযন্ত্র বেশি বিক্রি হয়। এই সময় গান বাজনা বেশি হয়। এই কাজ করতে পেরে নিজের কাছে ভালো লাগে। এক ছেলে এক মেয়ে ও স্ত্রীসহ দিনকাল ভালোই কেটে যাচ্ছে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১১
তারিখ ঃ ১৬/০৬/২০১৫
সময় ঃ ১২.৫০
নাম ঃ আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর
বাবার নাম ঃ নরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর
মাতার নাম ঃ সুচিত্রা রাণী সূত্রধর
ঠিকানা - গ্রাম ঃ লঘু ভাঙ্গা, পোস্ট ঃ উদ্দমগঞ্জ, উপজেলা ঃ সোনারগাঁ, জেলা ঃ নারায়নগঞ্জ।
বয়স ঃ ৫৫ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ তৃতীয় শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ ৮,০০০ টাকা (মাসিক আয় সব খরচবাদে)
পেশা ঃ সূত্রধর
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

সেই ছোটবেলা থেকে যখন "আমার জ্ঞান হয়েছে তখন থেকে আমি কাজটা করছি। এবং আমার বাবার কাছ থেকে এ বিষয়ে অনেক গল্পও শুনেছি।" আগে তুশ বা কুড়া পুড়িয়ে কালো ছাই করা হতো। তেতুল বিচি বেটে ভিজিয়ে রাখলে আঠা হতো। আঠার সাথে ধানের কুড়া তুশ বা কুড়া পোড়ানো ছাই মিশিয়ে কালো রঙ তৈরি করতেন। পরে ডিজাইনের বিভিন্ন অংশ এই রঙ ব্যবহার করতেন। আঠালো মাটি দিয়ে আস্তর দিতেন এবং বালি দিয়ে কোট দিতেন চকচক করার জন্য। পরে কোপাল বার্নিশের ব্যবহার শুরু করেন। নীল দিয়ে নীল কালার করতেন। আবির দিয়ে লাল রঙ তৈরি করতেন। আবির দিতেন লাল রঙ-এর শাড়িতে। সাদা রঙ চক পাউডার দিয়ে বানিয়ে নিতেন। মাটির আস্তরের সাথে তেতুল বিচির আঠা মিশিয়ে নিতেন। তারপর হাতি, ঘোড়া, পুতুল ইত্যাদি কাঠের তৈরি জিনিসে আস্তর লাগিয়ে শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে রঙ করতেন তার বাবার সময়ে হাতি, ঘোড়া, পুতুল এগুলোই বানাতে দেখেছেন। এছাড়াও কাঠের অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রি তৈরি করতেন।

কলকাতায় গঙ্গা সাগরের মেলায় নৌকাযোগে যেতেন। নৌকায় যেতে প্রায় ২৪ ঘন্টা সময় লাগত । গুন টেনে টেনে যেতেন কখনও কখনও পাল তুলে যেতেন। এই জন্য সময় লাগত ।সারা বছরের কাজ নিয়ে গংগা সাগর এবং নারায়ণগঞ্জে লাঙ্গল বন্ধ স্মানে বিক্রি করতে নিতেন। প্রচুর টাকা আয় হত। সেসব মেলায় প্রচুর বিক্রি করতেন,টাকা গোনারও সময় হত না। মেলা শেষে বাড়িতে ফিরে তিন দিন ধরে টাকা গুনতেন। পাশে বসা আশুতোষ তাঁর সহধর্মিনী সন্ধ্যারাণী সুত্রধর এমন তথ্য দিলেন। এছাড়াও কাঠ দিয়ে কাহাইল, চাড়ি, খঞ্চা, ডেউয়া(চামচ) উৎপাদনের কথা জানালেন। ঐ সময়ে কাঠের চাড়ির মধ্যে কাপড় ধুতো এবং ভাতের মাড় গালত। মরিচ বাটা রাখার খঞ্চা। ছোট খঞ্চাতে মশলাও রাখত। খঞ্চার মধ্যে পূজার ভোগ সাজিয়ে বেদিতে পুজা দিত। খঞ্চার নানামূখী ব্যবহার ছিল। আগেতো এত কিছু পাওয়া যেত না। বিশেষ করে এখন প্লাস্টিকের বিপুল সমাহার। তার বাবা লাঙ্গলও বানাতেন। ছোট করে খেলনা লাঙ্গল বানিয়ে বিক্রি করতেন। খঞ্চা বানিয়ে আগুনে ধোয়া দিতো। এখনও যারা বানায় তারাও ধোয়া দেয়। রংটা গাঢ় বা খয়েরি করার জন্য এবং সহজে যেন নষ্ট না হয়। এতে নকশা করত না কখন কখন ভি বাটালি দিয়ে ২/১ টি রেখা টেনে দিতেন। নিজেরা করাত দিয়ে কেটে নিতেন। এ কাজটি নিজেরাই করতেন। মান্দার কাঠ, তুলা কাঠ, ডুমুর কাঠ, ইত্যাদি বানাতেন। যে ডুমুর গাছে ডুমুর ধরে না সেই ডুমুর

গাছের কাঠ খুব ভাল হয়। কখনও পোকামাকড় আক্রান্ত হয় না। এখন শুধু কদম, গামারি, রেইন্টি কড়ই কাঠ দিয়েও তৈরি করেন। আগের থেকে অনেক সহজে এখন রঙ করেন। বাজার থেকে এনামেল রঙ কিনে এনে রঙ করেন।

মূলত ইন্ডিয়া থেকে তারা এই কাজটা শেখে। ঐ সময়ে তার বাবা দাদারা ডিজাইন অংশ বাদ রেখে সব কাজ করতেন। শুধু মাত্র ডিজাইনটা ব্রাহ্মণ করতেন। ব্রাহ্মণরা নকশা করতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। ধরুন পালরা শুধু প্রতিমা গড়তেন নকশার কাজটি ব্রাহ্মণরা করতেন। পালরা চক্ষু আঁকতে পারলেও দিতেন না। ওটা ব্রাহ্মণরা আঁকতেন বা দিতেন। ডিজাইনটি ব্রাহ্মণরাই করতেন। ব্রাহ্মণরা আস্তে আস্তে এ পেশা থেকে সরে গেলে পরপর্তীতে শুধুমাত্র চোখ দিতেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া চক্ষুদান হত না। সময়ের বিবর্তনে এখন ব্রাহ্মণরা কোথাও করে কিনা তবে এখন পালরা ডিজাইনের সব কিছুই নিজেরাই শেষ করেন। পরবর্তীতে তারা এই ডিজাইন নিজেরাই করছেন এমনকি চোখও তারাই আঁকেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী ছিলেন এই ধরনের নক্শা করতেন। তারা ইন্ডিয়া থেকে শিখেছিল। কাঠের পুতুলে প্রতিমারই চোখ বলা যায়। কাঠ সিজন করেন। গাছ কেটে তক্তা পানিতে ফেলে রেখে আবার তুলে রৌদ্রে শুকিয়ে কাজ করেন। এখন এনডিন ও ফিনিশ বাজার থেকে কিনে এনে মিশিয়ে সরাসরি কাঠে দেন। দুই ছেলে তিন মেয়ের মধ্যে একটামাত্র ছেলে এই কাজ করেন ও কথা দিয়েছে এই কাজ করবে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১২
তারিখ ঃ ২৫/০৬/২০১৫
সময় ঃ ৩.০০
নাম ঃ নির্মল দাস
বাবার নাম ঃ রায়মোহন দাস
মাতার নাম ঃ বিন্দিবালা দাস
ঠিকানা ঃ গ্রাম+পোষ্ট ঃ গড় পাড়া, থানা+জেলা ঃ মানিকগঞ্জ।
বয়স ঃ ৪০ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাই
মাসিক আয় ঃ ৪০,০০০ টাকা
পেশা ঃ কাঠের বাদ্যযন্ত্র তৈরিকারক
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

চারিদিকে শুধু কাঠ। একদিকে, বাদ্যযন্ত্র যেমন ঢাক, ঢোল, তবলা, খমক, কঙ্গ ইত্যাদির মাপে গাছের গুড়ি কেটে রেখেছে। আরেকদিকে প্রায় কমপ্লিট বাদ্যযন্ত্র। দাস তাদের পদবি। বেশির ভাগ দাসেরা বাদ্যযন্ত্রের এবং চামড়া কাজ করে। তারা মানিকগঞ্জে বসবাস করেন। বাবা দাদারা সবাই এই কাজ করতেন। তিনিও করেন, ছেলেমেয়েরাও করছে। তার বাবা রায়মোহন দাস এর ওস্তাদ ছিলেন ইন্ডিয়ান এক ভদ্রলোক। তার নামটা মনে আসছে না তবে তিনিও দাস ছিলেন। তার কাছ থেকে তার বাবা

বাদ্যযন্ত্রের কাজ শেখেন। নির্মল দাসের জ্যাঠাও বাবার ওস্তাদ। তার জ্যাঠার নাম ছিল সোনাবারি। তিনি ইন্ডিয়া যেয়ে এই কাজ শেখেন। তার জ্যাঠা খুব ভাল বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতে পারতেন। ঢাক বাজানো ওস্তাদ ছিলেন দূর্গাপূজায় বাজাতেন। ঢাক, ঢোল, তবলা, কংগো, বঙ্গো, খমক, হাতবায়া তৈরি করেন। কয়েক পুরুষ বংশ পরম্পরায় এই কাজ করে চলেছে ২৫০-৩০০ বছরের বেশী সময় থেকে তারা এই বাদ্যযন্ত্র তৈরি করছেন। মানিকগঞ্জে এখনও ২০০ ঘর এই কাজের সাথে জড়িত। নারায়ণগঞ্জে আরও বেশি প্রায় ৩০০ ঘর এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত।

নিম গাছ, আম, কড়ই, মেহগনি ইত্যাদি গাছ দিয়ে এসব বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন। সবচেয়ে নিম গাছের কাঠ দিয়ে তবলায় সাউন্ড ভালো হয়, বেশি হয়। টেকসই হয়। সিজনের জন্য টেকসই করার জন্য কাঠকে জলে ভিজিয়ে রাখেন মাস দুয়েক। তারপর রৌদ্রে শুকান। প্রতিদিন ৮/১০ টি তবলা বানাতে পারে। আর প্রতিদিন ঢোল ৩/৪ টা তৈরি করতে পারে। ঢাক, ঢোল, খমক ইত্যাদি কুন্দানো মেশিন দিয়ে তৈরি করেন। তবলাও কুন্দানো মেশিন দিয়ে করে পরে বাটালি দিয়ে গর্ত করেন। কাঠের কাজের অংশটুকু ৮/১০ রকমের বাটাল ব্যবহার করে। এ বাটালগুলো বেশির ভাগ কুন্দানো মেশিনে ব্যবহার করেন মাঝে মাঝে দুই/একজন সৌখিন মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে হাতে নকশা করে দেন। তাছাড়া ঢাক, ঢোল, তবলার গায়ে হাতে খোদাই করা সম্ভব সেগুলো নির্বিঘ্নে করে। কৃষ্ণ কাঠিও তৈরি করেন। কোন কোনটার গায়ে চিকন বাটালির নকশা করেন। মন্দিরের কাছের গাছ সেগুলো বাদ্যযন্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহার করেন না। মহিলারা এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত এভাবে তারা শিরিষ ঘষেন, বার্নিশ করেন।

মানিকগঞ্জে বাদ্যযন্ত্রের কাঠের অংশটুকু বেশি হয়। তারা চামড়ার অংশটুকুও লাগান এবং পারদর্শী। তৈরিকৃত বাদ্যযন্ত্র তারা যে হারে বিক্রি করেন তা নিম্নে দেওয়া হলো। ভালো তবলা সেট ৬,০০০ টাকা, ৪,০০০-৩,০০০ টাকা, ঢাক ১০,০০০-১২,০০০ টাকা সর্বনিম্ন, ৭,০০০-৮,০০০ টাকা, কাটি ঢোল ৪,৫০০-৫,০০০ টাকা। দূর্গাপূজার মাসে বিক্রি ভালো হয়, এক মাসে প্রায় ১,০০০,০০-২,০০০,০০ টাকা বিক্রি হয়। সেই প্রাচীন কাল থেকেই একই ধরণের মাপ চলে আসছে। তবে তবলা দুই তিন ধরণের সাইজে তৈরি হয়। নির্মল দাস তিনি বললেন, "আমাদের একটু আধটু বাজাতে জানতে হয় তাছাড়া সুর ঠিক করা যাবেনা। তবে আমি ভাল বাজাতে পারি, ঢাকতো খুব ভালো বাজাই। আর এই কাজ করতে খুব আনন্দ লাগে। আর এই পেশা অনেক পুরাতন প্রায় ২০০-৩০০ বছরের এই কাজ আমরা বংশীয়ভাবে টিকিয়ে রেখেছি এটা আমাদের বড় পাওয়া।"

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১৩
তারিখ ঃ ১৫/৭/২০১৫
সময় ঃ ২.০০
নাম ঃ মো ঃ ফরিদ মিয়া
বাবার নাম ঃ জিনাত আলী
মাতার নাম ঃ শরীমন নেছা
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ হাটুভাঙ্গা কান্দাপাড়া, পোস্ট ঃ মীর্জানগর, থানা ঃ রায়পুরা, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৩৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাই
মাসিক আয় ঃ ৫,০০০ টাকা
পেশা ঃ মিস্ত্রী ও কুটিরশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

মিশ্র মাধ্যমের খেলনা তৈরি করেন। অনেকটা অংশ হিসেবে কাঠ থাকে। এই কাঠ সরাসরি 'স' মিল থেকে চিড়ে কাজের জন্য নিয়ে আসেন। এই কাঠের অংশটা হাতল হিসেবে ব্যবহার হয়। এর সম্মুখভাগে আরও ৩" থেকে ৪" মাপের ২টি কাঠের টুকরা লাগিয়ে তার মাঝামাঝি একটি প্লাস্টিকের চাকা উপরে প্লাস্টিকের পাখি লাগিয়ে দেন। দেখতেও সুন্দর লাগে। প্লাস্টিকে এইসব জিনিস বিভিন্ন রংয়ের হয় থাকে এর মধ্যে নীল, সবুজ, হলুদ, খয়েরি উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু এই ধরনের খেলনা তৈরি করে থাকেন। প্লাস্টিক কোম্পানি থেকে প্লাস্টিকের জিনিসগুলো পাইকারি মূল্যে কিনে আনেন। কাঠের অংশটুকু তিনি নিজেই তৈরি করেন। শিমুল কাঠেই এগুলো বেশি করেন। এই কাঠের উপর 'মীনা' রঙ ব্যবহার করেন। এর মধ্যে লাল, হলুদ, সবুজ তিনি ব্যবহার করেছেন। একদিনে গুড়া রঙ পানির মধ্যে দিয়ে কাঠ খন্ডগুলিকে ডুবিয়ে রঙ দেন। হলুদ রঙ পুরাটা জুড়ে দিয়ে দেন। হলুদের উপরে দুই পার্শ্বের একপার্শ্বে লাল অন্য পার্শ্বে সবুজ রঙ করেন। ৪০০-৫০০ খেলনা বানানো যায় প্রতিটা ১০ টাকায় বিক্রি হয়। দিনে ৪০০ বিক্রি করেন। কখনও কখনও ১০০, ২০০ এর বেশি /কম খেলনা বিক্রি করে। অনুষ্ঠানের সাইজ বুঝে বিক্রি হয়। দাম কম হওয়ায় ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় এই খেলনা। অন্য কাজ হিসেব কৃষি কাজ করেন। হাতুড়ি, কেচি, লোহা লাগে। কৃষি কাজ করতেও তার ভাল লাগে। কিন্তু এই কাজটাই তিনি করে থাকেন। তিনি বলেন এটাই তার মূল পেশা। নিজেই তৈরি করেন এবং বিভিন্ন মেলায় বা অনুষ্ঠানে নিজেই বিক্রি করেন। শিশুদের জন্য এমন খেলনা তৈরি করতে পেরে সত্যি তিনি খুশি।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১৪
তারিখ ঃ ২০/০৭/২০১৫
সময় ঃ ৩.০০
নাম ঃ মো ঃ ইব্রাহিম খলিল

Dhaka University Institutional Repository

বাবার নাম ঃ মৃত এমারত আলী
মাতার নাম ঃ শমফুল
ঠিকানা ঃ গ্রাম+পোস্ট ঃ মির্জাপুর, থানা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ বগুড়া
বয়স ঃ আনুমানিক ৬৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নবম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ
পেশা ঃ কারুশিল্পী (অবসর)
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

কাঠ খোদাই শিল্পের জীবন্ত কিংবদন্তী। একটা নমুনা- আজ হতে বছর পনেরো আগেও যে পালঙ্ক, খাট তিনি বৈশাখী মেলায় উঠাতেন তা দেখার জন্য দোকানে ভীর জমে যেত। বারো থেকে পনেরো হাজার টাকায় সে খাট গ্রামের মেলায় বিক্রি হতো-ভাবতে পারেন? খলিল ইব্রাহিম এক সময় যাত্রাপালা করতেন। আস্থা রাখতে পারেন নাই। প্রথমে সহজিয়া ইসলাম ঝোপগাড়ি পীরের মুরীদ, পরে অনেকটাই কট্টরপন্থী চরমোনাই পীরের মুরীদ হন। এখন মসজিদের মোয়াজ্জিন, পাশাপাশি নামাজ পড়ান। কত বছর- বলা মুশকিল। ইব্রাহিম খলিল ছোটবেলা থেকেই নানাবিধ সৃষ্টিশীল ও মননশীল কাজের কারিগর। বহুমাত্রিক কাজের পারদর্শিতা ধরা পড়ে শৈশবের দিনগুলোতে। তার বলা কথা সাজিয়ে লিখলে যা দাঁড়ায় " ছোটবেলা থেকেই যা দেখতাম, তাই করার চেষ্টা করতাম। এটা একটা দিক! তো ছোটবেলায় বাবার সাথে নৌকায় করে গেলাম সিরাজগঞ্জে। সিরাজগঞ্জ শহরে প্রথম দেখি রিকশা। আমিতো এর আগে রিকশা দেখি নাই। গ্রামে সকলেই সাইকেল দেখছেমাত্র। তো আমি চিন্তা করে এর নাম দিলাম- তিন চাকার সাইকেল। তো গ্রামে ফিরে এসে সবাইকে বললাম যে, শহরেতো আমি তিন চাকার সাইকেল দেখলাম। সবাই জিজ্ঞেস করল- ক্যাবারে ? আমি বললাম- রোস, দেখাই। তারপর বাবার তো অস্ত্রপাতি ছিল। তক্তা কেটে তিনটা চাকা বানিয়ে, ডলনা (শক্ত গোলাকার কাঠ বা বাঁশ বিশেষ) বানিয়ে তিনচাকার সাইকেল বানালাম। সবাইকে বললাম এই রে, এই হলো- তিন চাকার সাইকেল। তাতেতো আর উপরে বসে চালানো যায় না। কিছুদিন পরে বাবার সাথে গেলাম গোসাইবাড়ী হাঁটে। গিয়ে দেখলাম- রাইচ মিল। সেটি দেশীয় কাঁচামাল দিয়ে তৈরি করেছেন।

এরপর গেলাম গাইন্দাল হাঁটে। দেখি কুশাল (আখ) ভাঙ্গানোর মেশিন। তো ভালোভাবে দেখেন কিভাবে ভাঙ্গায়! বাড়িতে এসে সেটাও তৈরি করলেন। এরপর "একটু বড় হলেই গোসাইবাড়ি গেলাম সার্কেস দেখতে। তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। বাড়িতে এসে বাশের কঞ্চি কেটে ত্রিফলা বর্শা বানাইলাম। নগ (বাঁশ)

লাগিয়ে টেস্ট করলাম। দেখি হ্যা সার্কাস পারি। পরে সার্কেসের টিম গরলাম। সবাইকে ফ্রি খেলা দেখাতাম। একটা দূর্ঘটনায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়।"

তার প্রথম জীবনে যখন ক্লাস এইটে পড়েন তখন তার বাবার পা ভেঙ্গে যায়। বাবাও মিস্ত্রী ছিলেন। কমজুড়ি মিস্ত্রী ছিলেন। তেমন নকশার কাজ জানতেন না। মিস্ত্রী কাজের মধ্যে দরজা, জানালা, চৌকি বানাতেন। আর করাতের কাজ করতেন। করাতের কাজ করতে গিয়েই মূলত পা ভেঙ্গে যায়। বাবা নৌকার কাজ করতে। নৌকা বানাতো। মেলার কাজ করত বাক্স উঠাতো মেলায়। তো পা ভাঙ্গার পর সবাই বৈঠক দিয়ে আমার পড়ালেখা বন্ধ করলো। যেহুতু বাবা অচল হয়ে পড়ল। লেখাপড়ার করানোর মতো আর সামর্থ রইল না। বাবার জমিজমা ছিল কিছু। চাষাবাদ করতো আর টুকটাক ব্যবসা করতো। দুই বছরের বন্যায় ফসলের ব্যপক ক্ষতি হলো। বাবা অভাবে পড়ে গেল। অভাবের কারণেইতো করাতের কাজ করতে গেল। পা গেল ভেঙ্গে। আমাকে মিস্ত্রী কাজে ঢুকতে হলো।

"তার বাবা কাঠের কাজ শিখছে বাবার জেঠার (বড় চাচা) কাছ থেকে। কাঠ মিস্ত্রীদের জীবন এখনকারমতো এত সহজ না। অস্ত্রপাতি কাঁধে নিয়ে ফেরি করে বেড়াতো, তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে, হেঁটে বেড়াত কাজের সন্ধানে। কাজ কি এত সহজে ধরা দিতো ? না। খেয়ে না খেয়ে তারা কাজ খুজে বেড়াতো সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতো। অথচ সভ্যতা তাদের কতটুকু জায়গা দিয়েছে। নকশার যে বুনন ওঠে কাঠে সে কাঠ তারা তাদের গৃহে রাখার সামর্থ রাখে না। যেন এ শিল্পের জীবন তার না অন্য কারওবা হয়ত সভ্যতার।

কাঠের কাজে হাতেখড়ি অবশ্য বাবার কাছে। বাড়িতে কাজ করতেন দরজা, জানালা, বাক্সের কাজ করতেন। এসব মালামাল সোনামুখী কিংবা পোড়াদহ মেলার জন্য করতেন। নকশার কাজ শিখেন দিনাজপুর শহরে চৌধুরী ফার্নিচারে। দিনাজপুরের পচাগড়ে কাজ করতে গিয়ে খুব কষ্ট করতে হয়েছে। মাথায় অস্ত্রপাতি নিয়ে সারাদিন হাটতে হতো। পরের দিন সারাদিন হেটে পচাগড়ে কাজ ধরলেন। এর আগে তার বাবা তাকে দিনাজপুরে নিয়ে আসে করাতের কাজ করাতে। তো সেখানে কাজ করতে করতে বাবা তাকে রেখে আসে তিনি সেবারই প্রথম একটা বেঞ্চি বানায়। বাড়ির নাম 'মিস্ত্রীবাড়ি'। না মিস্ত্রী বাড়ি বলার মধ্যে কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিলনা বরং সহজেই তাচ্ছিল্য ধরা পড়ত চোখে। মির্জাপুরে তাদের সংগ্রাম শুরু হয়। মির্জাপুরে প্রথম প্রথম কারখানা চলে না। চেয়ার টেবিল বিক্রি করে সংসার চলে। আর ছিল চ্যালাটির ব্যবসা। তো এখানে এসে এক বাড়িতে কাজ ধরেন এক বুড়া লোক ছিল। লোকজন যখন থাকতো না তখন বলতো-

‘শক্ত কাঠ, দুর্বলা মিস্ত্রী
শক্ত কাঠ, দুর্বলা মিস্ত্রী।’

যখন লোকজন আসতো তখন বলতেন

‘হালের লাঙল, মইয়ের কাছি
যাতে লাগাও, তাতেই আছি।’

নকশার কাজের প্রথম অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বললেন এরপর এলো কেল্লাপুশির মেলা। সেখান থেকেই মূলত নকশার কাজ শুরু। কেল্লাপুশির মেলায় গিয়ে নকশার আলমারী দেখেন আর নকল করেন। পরের বছর নকশার খাট আর দুইটা আলমারী তৈরি করেন। একটা আলমারী বেচলেন ২২০ টাকা আর আরেকটা বেচলেন ২০০ টাকা। খাট বেচরেন ২৫০ টাকা। মাত্র ৪২ টাকার কাঠ দিয়ে মাল তিনটা বানান। তারপরে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন ডিজাইনের ২টা আলমারী তৈরি করেন। বাজারে যার চাহিদা ব্যাপক ছিল। বেকি কার্নিশ করা আলমারী সেটা প্রথম আবিস্কার করেন। তো এই আলমারী নিয়ে গেলেন সোনামুখি মেলায়। ভীর পরে গেল। তার বাবা লোকজনদের বাড়িয়ে বলা শুরু করলেন “আমার ট্যাকনিক্যালে পরা ছেলেটা আলমারী বানাইছে। বারে , লোকজন বিশ্বাসও করত।” সেবার আলমারী বেচলেন ৫৫০ টাকায় , যা মেলার সর্বোচ্চ। তার অনেক পরে শোকেজে চারকোনার নকশা দিয়ে দড়িপ্যাচ দিলেন। এই শোকেজে সেবার মেলায় বেচলেন ৫০০০ টাকা। যেখানে মেলার অন্যান্য শোকেজে মূল্য ৩০০০ টাকা মাত্র।

কাঠের কারুশিল্পের যে ছাপ ফেলেন। তাকে তাদের কোনদিন শিল্প বলে দাবি করে নাই। এতো তাদের টিকে থাকার লড়াই। তবে তাদের শিল্পের একটা বোধ আছে, তাড়না আছে। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে।

সে বার তিনি গেলেন বগুরা জেলার গুপিনাথপুর মেলায়। অনেক বড় মেলা। এর আগে ঐ মিস্ত্রী দাদার আলমারীই ছিল মেলার ফার্স্ট। তার আলমারী বিক্রি হলো ২৭০০ থেকে ২৮০০ টাকা দরে। আর দাদার আলমারীর দর ২০০০ টাকা। অন্য এক মিস্ত্রী বলেন দাদা আপনার আলমারী এইবার ফেল। ইব্রাহিম খলিলকে দেখিয়ে বলল এই দাদার আলমারীর কাছে আপনার আলমারীর পরাজয়। সেখানে বয়স্কমতো একদাদা কাজ করতে করতে বলল–শিল্পির কোন অহংকার নাই। এক শিল্পির উপরে আরেক শিল্পি আছে। এবার গেলেন সাতরি মেলায়। সেখানে প্রথম পালঙ্ক দেখলেন । তো এসে প্রথম পালঙ্ক খাট জুড়েন। অত্র এলাকার মধ্যে তিনি এটি প্রথম বানায়। আইডিয়া আসে তার দেখার মধ্যে দিয়ে। মনোযোগ দিয়ে

দেখেন আর মনের ভিতর ছবি আকার চেষ্টা করেন। সাতক্ষীরা মেলায় তো কাগজ দিয়ে নকল করার সুযোগ নাই। চারিদিক দিয়ে বাশ দিয়ে ঘেরা। লোকজন যেন ছুতে না পারে । যাতে রঙের গ্লেজ নষ্ট না হয়। তো তিনি মনোযোগ দিয়ে দেখেন আর তার দোকানে বসে বসে ছবি আঁকেন। এক ধরনের নকল আর কি ! সে বার প্রথম পালঙ্ক খাট বানিয়ে সোনামুখী মেলায় তোলেন। খাট দেখে মেলার সবচেয়ে বড় মিস্ত্রী, মিরমিস্ত্রী (তিনি তার মিস্ত্রী জীবনের গুরু ও ওস্তাদ বলতেন) বলল–পুতুরা, খাটতো ভালই বানাইছো। তো লোকজন দাম দিতে পারব ? সে বার সেই বাজারে খাট বেচলেন ১০,২০০ টাকা।

যে জীবন শিল্পের সে জীবনতো একার না – একটা জীবনেরও না। বহু জীবন এসে ভীর জমায় সেখানে তিনি নাটক করতেন, যাত্রা করতেন। ক্লাস ফাইভে করলেন নাটক- মীর কাসিম। তারটা ছিল ইংরেজ চরিত্র। নাম সম্ভবত লেফটেনেন্ট জিলবার্গ। শেষে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ন কথা বললেন অভিনব সব ফার্নিচারে মেলায় যার দোকান ঝলমল করতো। অনেক টাকায় সে সব বিক্রি হতো। কেমন ছিল এই মিস্ত্রীদের জীবনযাপন। দামি দামি পালঙ্ক, খাট তারা ঠিকই তৈরী করত কিন্তু নিজেরা থাকতো সস্তা চৌকিতে। বিক্রি হওয়া মালে লভ্যাংশ চলে যেত মহাজনের কাছে। এছাড়াও তিনি চরকা, বাতির গাছা, ছোট ছোট বাক্স, জলচৌকি ইত্যাদি তৈরী করতেন। খাট, পালঙ্ক দরজা ইত্যাদি তৈরীর পর বেচে যাওয়া কাঠ দিয়ে নানা ধরনের নকশাদার ব্যবহারিক জিনিস তৈরী করতেন। সেগুলোও বিক্রি হতো।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১৫
তারিখ ঃ ২৪/০৮/২০১৫
সময় ঃ ১১.০০
নাম ঃ মো ঃ রেন্টু মিঞা
বাবার নাম ঃ আব্দুল জলিল
মাতার নাম ঃ চেনবানু
ঠিকানা ঃ ৪৫৮-ধরমপুর, মোল্লার স্কুল, বিনোদপুর, থানা ঃ মতিহার, জেলা ঃ রাজশাহী।
বয়স ঃ ৫৩ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শেণী
মাসিক আয় ঃ ৭,০০০ টাকা
পেশা ঃ মিস্ত্রী (কার্পেট)
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

মো ঃ রেন্টু মিঞা, ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রাজশাহীতেই তার জন্ম। ১৯৭৩ সাল থেকে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের কাজ শুরু করেছেন। অর্ডারী কাজ না থাকলে, অবসর সময় এই কাজ করছেন। ফার্নিচার ক্রাফটের কাজ বেশি করা হয়। এই কাজ অনেক শ্রমসাধ্য হওয়ায় দুই-তিন বছর আর হয়ত করতে পারবেন। ভবিষ্যতে ঐগুলো বাদ দিয়ে মূর্তি করা এবং সৌখিন কাঠের কারুশিল্প করার পরিকল্পনা আছে। মেহগনি, আকাশমনি, কড়ই টেকসই করার জন্য সার কাঠে কাজ করেন। শুকিয়ে নিয়ে কাজ

করেন। দেশি যন্ত্র দিয়ে কাজ করেন। মা-বাবাই চেয়েছিল যে কাঠের কাজ শিখি। সেই ছোট থেকে করছি। তিনি ওস্তাদ আলী হোসেনের কাছে কাজ শেখেন। বেশ কিছুদিন ওস্তাদের সাথে কাজ করার পর তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে এককভাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮০ সালে নিজে বাসায় কাজ শুরু করেন। আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে একসময় বেঙ্গল ফার্নিচারে কাজ দিওয়া শুরু করেন। বার্নিশ করার আগে বেঙ্গলের মালিক কাজ নিযে যেতেন। ওরা পরে বার্নিশ করে বিক্রি করতেন। কড়ই কাঠে করে দিতেন। এখন এই কাঠ পাওয়া যায় না। এখনও নিজের বাড়িতেই কাজ করে থাকেন।

মা চেন বানু তাকে পাশের বাড়ির কাঠমিস্ত্রি মো ঃ আলী হোসেন'র হাতে তুলে দেন কাজ শেখার জন্য। তার মায়ের ধারণা ছিল চারপাশে অভাব, কোনো কাজ নেই, হাতে পয়সা নেই, ছেলের পড়ালেখা হবে না, তাই ছোট-খাট কোনো কাজে লাগিয়ে দেয়াই ভালো। কাজে দেয়ার সময় মা তাঁকে বলেছিলেন কাঠের কাজ সারা বছর ধরে চলে এবং ঘরে বা ছায়ায় বসে, রোদে না পুড়ে, বৃষ্টিতে না ভিজে কাজ করা যায়। পরবর্তীতে সারাদিন কাজ শেষে বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার পর এককভাবে কাজ করতেন, এই সময় মা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে ধরে থাকতেন আর রেন্টু মিঞা অতিরিক্ত কোনো কাজ করে বাড়তি আয় করতেন। অল্প সময়ের মধ্যে ফার্নিচার, দরজা, শোকেস, চেয়ার-টেবিল, গাছা, খেলনা পুতুল, সুন্দর সুন্দর শোপিচ ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের নক্শা খোদাইকৃত কারুকাজে তার দক্ষতার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৪ সালে রাজশাহী শহরের কাদেরগঞ্জ (সিটি ভবনের পাশে) নাসিম আঞ্জু মুন্না'র বাসায় ফার্নিচার তৈরি করার সময় তাঁর কাজ দেখে নাসিম আঞ্জু মুন্না'র ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব ড. সারোয়ার জাহান মুগ্ধ হন। পরবর্তীতে রেন্টু মিঞা ড. সারোয়ার জাহানের বাসা এবং তার স্ত্রী সালিমা সারোয়ার এ.সি.ডি (এন. জি. ও) অফিসের জন্য ফার্নিচার তৈরি করছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কুষ্টিয়ায় লালন শাহ্র মাজারে মাসব্যাপী মেলায় অংশ গ্রহণ করে লালনভক্তিতে লালন শাহ্র ভাস্কর্য তৈরি করেন। এ থেকে বোঝা যায় কাঠের কাজে কতটুকু দক্ষ। তিনি বলেন আমি যা দেখি ও ভাবি তা যত কঠিন থেকে কাঠে ফুটিয়ে তুলতে পারব। কাঠ আমার ভক্তির একটা জায়গা। তিনি মূলত সমাজের মানবতাবাদী, মানবসেবক ও সমাজসংস্কারক মানুষদের নিয়ে কাজ করছেন। এই পর্যন্ত তার তৈরি শিল্পকর্মের সংখ্যা প্রায় ৫০টি। অনেকের কাছে তা সংগ্রহে আছে। আর কিছু ভাস্কর্য ও কাঠের তৈরি কারুশিল্প রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলায় বিক্রি করেছেন। বর্তমানে এই কারুশিল্পীর সংগ্রহে ভাস্কর্যসহ কাঠের তৈরি কারুশিল্প আছে, তিনি সেগুলোর প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছেন।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১৬
তারিখ ঃ ৩০/০৯/২০১৫

সময় ঃ ১.০০
নাম ঃ মো ঃ মজনু মিঞা
বাবার নাম ঃ মৃত মো ঃ শাহজুদ্দী
মাতার নাম ঃ মৃত আছিয়া বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ সুজাতপুর, পোস্ট ঃ জয়নগর, থানা ঃ শিবপুর, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৫০ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ সংসার চলে যায়।
পেশা ঃ কাঠ মিস্ত্রী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

বিয়ের পিড়ি তৈরি করে স্বচ্ছল ভাবে তাঁর সংসার চলে যায়। আয় যে খুব একটা বেশি তা কিন্তু নয়। আগে আয়টা ভাল হত। এখন কাঁচামালের দাম বেশি হওয়ায় তেমন লাভ থাকে না। বাবা, দাদা সবাই এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তারা বংশীয় প্রায় ১৫০-২০০ বছর যাবৎ এই কাজ করে। কৃষি গেরোস্থ ছিল কিছু এখন আছে। পাশাপাশি কৃষিকাজও করি। কারা এই কাজ সর্বপ্রথম করত। "তাতো বলতে পারব না তবে ছোটবেলা থেকেই দাদাকে করতে দেখছি। এই অঞ্চলে সূত্রধর সম্প্রদায়ের বসবাস অনেক ছিল। হয়ত সূত্রধররা বানাতো। হিন্দু বসবাসের আধিক্য ছিল। পূর্বে হিন্দুদের কথায় মুসলমানরা চলত। হিন্দু দেওয়ান বাড়ি ছিল এই এলাকায়। বড় জমিদার ছিল। কেউ কেউ বললেন ভারতবর্ষের মন্ত্রি ছিলেন। অনেক আগের কথাতো মনে নেই। পরে তিনি বিয়ের পিড়ি তৈরির কাজ শুরু করছেন। পরবর্তী প্রজন্ম শিখছে। তারা করবে কিনা জানেন না, তাদের ব্যাপার। তারা শুধু বিদেশ যেতে চায়। হিন্দুদের বিয়ের পিড়ি বানাচ্ছেন মুসলমানরা, কর্ম করে খাওয়ার জন্য এই কাজ। এছাড়াও পিঁড়ি, রুটির পিঁড়ি, বসার পিঁড়ি, জলচৌকি তৈরি করেন। হাতে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে রুটি বানানো পিড়ি বানায়। পিড়ির কাজটাই বেশি করেন। কাঠাল কাঠ ও রেন্ট্রি কড়ই কাঠে দিয়ে বেশি বানান। অর্ডার পেলে রিলিফ নকশা করেন। যারা বিয়ের অনুষ্ঠান করে তারা কিনে নিয়ে যদি নকশা করতে চান তাহলে অন্যকে দিয়ে নকশা করেন বা রঙ করতে চাইলে রঙ করেন। সবচেয়ে কম দামের ৪০০-৫০০ টাকা একজোড়া রেন্ট্রি কাঠের পিড়ি থেকে শুরু করে কাঁঠাল কাঠের পিড়ি ৪,০০০-৫০০০ টকাপর্যন্ত বিক্রি করেন। মেলাতেও বিক্রি করেন। সারা বছর করেন। পেশাই এটি। ফিনিশিং দেওয়ার পরে লাল রঙ এবং মেহগনি রঙ দেন। রঙ ছাড়াও বিক্রি করেন। কোন বাধ্যবাধকতা নেই রঙ-এর ক্ষেত্রে। ১$\frac{১}{৪}$", ১$\frac{১}{২}$" পুরু কাঠে বানান। ছোট বড় নানা ধরনের হয়। ১৮" x ২২", ২০" x ২৪", ১৬" x ২০",১৪" x ১৮" ইত্যাদি মাপের হয়ে থাকে। কাঠের টেক্সচারসহ তৈরি করে থাকেন। ১টা পিড়িতে ১০-১২ বার হাত দিতে হয়। একবার দাগ দিতে হয়

তারপর সাইজ করে আড়ি করাত দিয়ে দুই মাথা সমান করে কাটতে হয়। কুড়াল দিয়ে সাইড কাটতে হয়। সূতা দিয়ে পায়া কাটার জন্য দাগ দেওয়ার পরে বাটালি দিয়ে কেটে বাইশ দিয়ে চাচতে হয়। বাইশ দেওয়ার পর বাটালি দিয়ে ছোবড়া ফেলেন। পরে উভয় পিঠে রান্দা করে ফিনিশিং দিতে হয়। ফিনিশিং দেওয়ার পরে রৌদ্রে শুকাতে হয়। পরে শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে রঙ লাগান। মেলায় বিক্রি করেন কিনা ? না সব বানানোর সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যায়। মেলায় নেওয়ার মত পিড়ি জমা হয় না। এমনকি ভারতেও যায়। মুসলমানরাও নেয় হোটেলে পরোটা বানানোর জন্য ব্যবহার করেন। হোটেলে নেওয়ার জন্য বিশেষ ওর্ডার দেন। তাদের টা বেশি বড় নেয়। মহিলারা রঙ লাগানোর কাজে সহযোগিতা করেন এবং রান্দাও টানে মাঝে মাঝে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১৭
তারিখ ঃ ৩০/০৯/২০১৫
সময় ঃ ২.৩০
নাম ঃ মফিজ
বাবার নাম ঃ মৃত আনছার আলী
মাতার নাম ঃ মৃত জমিনা খাতুন
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ সুজাতপুর, পোস্ট ঃ জয়নগর, থানা ঃ শিবপুর, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৬০ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অষ্টম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ
পেশা ঃ কাঠের কারুশিল্পী (অবসর)
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

তার ছেলে মেয়েরা অনেক শিক্ষিত একজন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে কলেজে চাকরি করছেন। আরেকজন সরকারি অর্থাৎ কিশোরগঞ্জ মেডিকেলের ছাত্রী। কিন্তু তার মধ্যে এসবের কোন অহংকার নেই, অহংকার হলো তিনি এই কাঠের কাজ জানেন। বিয়ের পিড়ি। ঐতিহ্য বাহী এই কাজ তিনি করতেন। এখন শারিরিক অসুবিধার কারণে আর করেন না তবে সুস্থ হলে আবার করবেন। বাবা-দাদা এই কাজ করত না। মামারা করত তাদের কাছে শিখেছেন। মামাদের বাড়ি আছকি তলা, জয়নগর। আগে মায়ের সাথে যেতেন মামাদের বাড়িতে এই কাজ অপলক দৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং শেখার চেষ্টা করতেন। এক সময় শিখে গেছেন। মামারা সবাই মারা গেছেন। আপনার মামারা কোথা থেকে বা কার কাছে এই কাজ শিখেছেন ? "তা সঠিক বলতে পারব না। তবে আমি যত দূর শুনেছি মামারা হিন্দু সূত্রধরদের কাছ থেকে শিখেছিলেন। মফিজ উদ্দিন ৮০ সাল থেকে এই কাজ শুরু করেন। প্রায় ৩০-৩৫ বছর বিয়ের পিড়ি তৈরি করেছেন। এখন আর করেন না। এখনও করার ইচ্ছা করে, কিন্তু শরীরে কুলায় না। বিয়ের পিড়ি তখন

খুব চলেছে। এই পিড়ি ছাড়া হিন্দুদের বিয়ে সম্ভব নয়। একটা বিয়েতে একজোড়া পিড়ির প্রয়োজন হয়। তবে এই বিয়ের পিড়িতে খোদাই করে কোন নকশা করা হত না, তবে তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে রঙ করত, রঙ দিয়ে নকশা করতেন, লিখতেন "শুভ বিবাহ।" জীবনে অনেক বিয়ের পিড়ি বিক্রি করেছেন। আশেপাশে অনেকেই তার পিড়ি দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। হোটেল ব্যবসায়ীরা এই পিড়িতে রুটি, সিংগারা, পুরি তৈরির জন্য বিয়ের পিড়ি কিনে নিতেন। বিয়ের পিড়ি ছাড়া কাঠের অন্য কোন সামগ্রি তৈরি করেন নাই। মাঝে মাঝে এগুলো নিয়ে মেলায় যেতেন। এখনও সুস্থ হলে আবারও এই কাজ করতে চান। এই কাজ করা সত্যিই নেশার মত। করতে ভালো লাগে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১৮
তারিখ ঃ ৩০/০৯/২০১৫
সময় ঃ ৫.৩০
নাম ঃ কামাল হোসেন
বাবার নাম ঃ মৃত মো ঃ শাহজুদ্দী
মাতার নাম ঃ মৃত আছিয়া বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ সুজাতপুর, পোস্ট ঃ জয়নগর, থানা ঃ শিবপুর, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৩৮ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ সমান সমান
পেশা ঃ কাঠ মিস্ত্রী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

কামাল হোসেনের এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে মেয়ে দুজনেই পড়ালেখা করে। তিনি তৈরি করেন 'হাউরি'। সুজাত পুবেই যাকে হাউরি। শাউরি বা হাতা বলে। সিরাজগঞ্জে অবশ্য একে বলে 'হারপাট'। অন্য এলাকায় হয়ত অন্য নাম। ধান টানার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। গ্রামে খুবই প্রয়োজনীয় কাঠের এই সামগ্রীটি। অধচন্দ্রাকার, দেখতে খুবই সুন্দর। এছাড়াও বিয়ের পিঁড়ি, রুটির পিড়ি বা গোল পিড়ি বানান। হাউরি লম্বা ৮"-১৬" মাপের বানায়। এমন মাপেরটা বেশি চলে। এর উপরের দিকে একটা ছিদ্র থাকে। কাঠ বা বাশের হাতল লাগানোর জন্য ছিদ্র করেন। বাটালি দিয়ে এর গায়ে একটা গোল ছিদ্র করে। অর্ধচন্দ্রকার আকৃতি বাটালি এবং করাত দিয়ে কেটে নেন। আম, জাম, কাঁঠাল, রেইন্ট্রি ইত্যাদি কাঠ দিয়ে 'হাউরি' তৈরি করা হয়। নিচের অংশটা বাইশ দিয়ে কেটে শ্লোপ করে। পরে রান্দা করে সমান করেন। ছোট গোল ছিদ্র এবং অর্ধচন্দ্রাকার কাটার আগে 'তারকাটা কাঠি' দিয়ে গোল করে ও চন্দ্রাকৃতির দাগ টেনে নেন। তারকাটা কাঠিতে দুটা পেরেক বা লোহা থাকে। একটা পেরেক বারি দিয়ে কাঠের সাথে আটকিয়ে নেন। তারপর ঘুরালে কাঠের গায়ে দাগ পড়ে। পরে এই দাগ অনুযায়ী কেটে কেটে 'হাউরি' বা

'শাউরি' তৈরি করেন। শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষার পর রঙ লাগানো হয়। এতে বসন্ত রঙ লাগান। রঙ লাগানোর এই কাজটি মেয়ারা 'বাধ্যতামূলক ভাবে' করে থাকেন। এই অঞ্চল থেকে এগুলো বাংলাদেশেরে অন্যান্য জায়গায় যায়। এই এলাকার প্রতিটি হাটে এগুলো বিক্রি করে থাকেন। মেলা সামনে এলে ওর্ডারে অনেক হাউরি তৈরি করতে হয়। পর্যাপ্ত কাঁচামাল না থাকায় এবং যার দাম বেশি হওয়ার কারণে একাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হবে বলে তিনি মনে করেন। গৃহস্থ সমাজে এর চাহিদা ব্যাপক।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ১৯
তারিখ ঃ ৪/১২/২০১৫
সময় ঃ ২.৪০
নাম ঃ আব্দুল আউয়াল মোল্লা
বাবার নাম ঃ মৃত রমিজ উদ্দিন মোল্লা
মাতার নাম ঃ মৃত শাহেরা খাতুন
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ চৌদানা, দত্ত পাড়া, উপজেলা ঃ সোনারগাঁ, জেলা ঃ নারায়ণগঞ্জ
বয়স ঃ ৬৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৪র্থ শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ বর্তমান আয়ে সব কিছুর পরেও ভালভাবে সংসার চলে।
পেশা ঃ কারুশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

তার বাবা লাঙ্গল, চরকা, জাপানি তাঁত, বাতির গাছা (বাতি স্ট্যান্ড), খরম, জলচৌকি, খাঁট, কখনও কখনও নকশাদার খাট বানাতেন। পাকিস্তান আমলে ঢাকায় চলে আসেন। এখানে কাঠের কাজের অনেক কিছু দেখেছেন। তিনি যেখানে যা দেখতেন তাই বানানোর চেষ্টা করতেন। একবার পানাম নগরে শাহজাহান সাহেবের বাসার জন্য অনেক যত্ন করে আসবাবপত্র তৈরি করেন। ১৯৮২ সালে দিকে খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল, আর ব্যবহার্য সামগ্রী ইত্যাদি তৈরি করেন। ঠিক এই সময় জাতীয় কারুশিল্প পরিষদের চেয়ারম্যান হামিদা হোসেন আপা পানাম সিটি পরিদর্শনে আসেন। একপর্যায়ে তার ঐসব কাজ তাকে আকর্ষণ করে। তৎক্ষনাত তার প্রসংশা করেন। ঢাকায় জাতীয় কারুশিল্প পরিষদে তার সাথে দেখা করতে বলেন। সেই থেকে যাত্রা, আর তাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। জনাব আব্দুল আউয়াল মোল্লা বলেন "এখনও এই কাজ করছি। কতবার এই কাজ ছাড়তে চেয়েছি কিন্তু এই কাজ আমাকে ছাড়েনা।" তিনি অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে আজ এই অবস্থানে এসেছেন। সেসব সমীকরণ না টেনে সরাসরি তিনি ছোটবেলার কথা দিয়ে শুরু করেন তার মা মারা যান। কখন থেকে এই কাঠের কাজ করেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সহজেই বললেন যে ক্লাস ফোর থেকেই তিনি এই কাজ শুরু করেন। স্কুলে যাওয়ার আগে করতো আবার স্কুল থেকে আসার পরেও এই কাজ করতো খুব ভাল লাগত। তার বাবা কাঠমিস্ত্রী

ছিলেন। বাবার উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া এই কাজ। তবে পার্থক্য তার বাবা নকশাদার কাজ করতেন না আর তিনি করেন। নকশাদার নিত্য ব্যবহার্য জিনিস যাকে বলে কারুশিল্প কাঠের তৈরি কারুশিল্প তাই এখনও করছেন। ডিজাইনের জন্য বার বার কাগজে ডিজাইন আঁকতেন। যেটা ভালো লাগতো তা ফেলে রাখতেন আবার নিজের কাছে ভালো লাগতো কিনা দেখার জন্য। "আমি দেখেছি আমার কাছে যেটা ভাল লাগত সেটা ক্রেতার কাছেও ভাল লাগছে।" নিখুত এবং হাতে কাজ করার সুবাদে কাঠের তৈরি এইসব কারুশিল্পের ব্যাপক চাহিদা। আড়ং এ সাপ্লাই দেয় যে জিনিস তা মেলা বা বাইরে দেওয়া নিষেধ। এজন্য কয়েকটি আইটেমের জিনিস তৈরি করেন নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী হাতি, ঘোড়ার গায়ে যে ডিজাইন,তার কাজে সেসবের কোন প্রভাব নেই। তিনি বললেন সবগুলো আমার নিজের ধারণা থেকে তৈরি করি। একদম নিজস্ব। তিনি একবার শুধু কুয়ালালামপুরে যাওয়ার সুযোগ পান। জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ, আন্তর্জাতিক কারুশিল্প থেকে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ ১০টি দেশ নিয়ে একটা সমিতি তৈরি করেছে।

কাঁচামাল হিসেবে কাঠ স'মিল অথবা কাটপট্রি থেকে সংগ্রহ করেন। কাঠও সহজে পাওয়া যায় না। কাঁচামালের একটা সংকট দেখা দিতে পারে। তিনি আকাশমনি (যাকে বাংলাদেশে ২য় সেগুন বলে), মেহগনি, রেইন্ট্রি, দেশি কড়ই কাঠেও তিনি এসব কাজ করেন।

দীর্ঘদিন কাঠকে শুকিয়ে একদম ফাইনাল কাজ করেন। আগুনের ধোয়া দিয়ে কাঠকে বিশেষভাবে শুকিয়ে নেন। ফলে অনেক দিন টিকবে। পোকামাকড়ও ধরবে না। তারপর কাজ শুরু করেন, পুরোটাই হাতে করেন। কাজ করার পরে কোয়ালিটি দেখার পরে সাপ্লাই দেন। তার আগে তৈরিকৃত কারুশিল্পগুলোকে ফিনিশিং টাচ দেন। তার নিজস্ব উদ্ভাবিত লোহার যন্ত্রটিকে আগুনে পুড়িয়ে লাল করে কাঠের তৈরি পণ্যে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নকশা করেন। কোনটা দিয়ে চিকন দাগ হয়, কোনটা দিয়ে মোটা দাগ দেওয়া হয়।

মৌচাকের মোম, সাথে সয়াবিন তেল মিশিয়ে ব্রাশ দিয়ে দেওয়ার পরে শুকনা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলেন। এতে কাঠের কালারটা অক্ষত থাকে। তার কাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো কাঠের নেচারাল কালার রেখে দেওয়া। এতে কোন ক্যামিকেল লাগানো হয় না। পণ্যগুলো পরিবেশ বান্ধব বলে জানালেন তিনি। যেহেতু কোন কেমিক্যাল না লাগায় খাদ্য গ্রহণ, খাবার রাখা, হোটেল ইত্যাদিতে অনায়াসে ব্যবহার করা হয়।

জনাব আব্দুল আউয়াল মোল্লা আড়ং-এ তার কাজ বিপণন করেন। একটা শর্ত মানতে হয় আড়ং-এ যে কাজ তিনি সরবরাহ করেন তা আবার তিনি প্রদর্শনী ও বিক্রয় মেলায় করতে পারবে না। তিনি জানালেন মেলাতেই কাঠের কারুশিল্প পণ্য বেশি বিক্রি করেন। কাপড়ের রঙ দিয়ে পানির সাথে মিশিয়ে কাঠে

প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষার ফলে উচু জায়গাগুলোতে কাঠের কালার বের হয়ে আসে, আর নিচু জায়গায় কালো কালার থেকে যায়। পরে গালা স্পিরিট বার্নিশ করেন। তিনি বলেন যে বর্তমানে তার কোন নতুন পরিকল্পনা নেই। কারণ যেগুলো বানাচ্ছিলেন সেগুলোরই প্রচুর চাহিদা সাপ্লাই দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। ১৯৯০-৯৫ সনের মধ্যে ৮৫টি ডিজাইনের পণ্য তিনি করেছেন। চাহিদা অনেক থাকায় আর নতুন কিছু করার নেই। হাতে করেন বলেই আমার পণ্যের চাহিদা বেশি। তার কারখানায় এখন ৪ জন কারিগর কাজ করেন। জীবনে এই একটাই মানুষের ফিগারেটিভ কাজ করেছিলেন।

তিনি কাশ্মিরি টেবিল তৈরি করেছেন বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রি একটা কিনেছেন। তাছাড়াও আরো অনেক মান্যগন্য ব্যাক্তি আমার পন্য কিনেন। পরবর্তী প্রজন্ম যদি এই পেশায় কাজ করতে চায় তাহলে তাদেরকে কি করাবেন উত্তরে তিনি বললেন ছেলেদের ইচ্ছা যদি তারা করতে চায় তাহলে তারা করবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা তাদের কামরুল হাসান জাতীয় কারুশিল্প পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি বলেন "সেই পরিষদে আমি ১নং সদস্য হই।" তিনি তিনবার জাতীয় কারুশিল্প পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিসিকের দেওয়া এই পুরস্কার। এছাড়াও শীলু আবেদ বাংলা ক্রাফট থেকেও পুরস্কার পেয়েছেন। সার্কের পুরস্কার পেয়েছেন। সরকারের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার ইচ্ছা তার আছে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২০
তারিখ ঃ ২৪/১২/২০১৫
সময় ঃ ১০.০০
নাম ঃ আবুল কাশেম শেখ
বাবার নাম ঃ ছিটু শেখ
মাতার নাম ঃ রবেদা খাতুন
ঠিকানা ঃ বজ্রযোগিনী, গ্রাম ঃ ভট্টাচার্য পাড়া, মুন্সিগঞ্জ
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাই
বয়স ঃ ৫৬ বছর
মাসিক আয় ঃ সমান সমান
পেশা ঃ কারুশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই কাঠের তৈরি কারুশিল্প করেন। সংসার চালানোর জন্য এই কাজে আসেন। অনেক ধরনের কাজ করার চেষ্টা করেছেন করতে পারেন নাই। তার বাবা ডেকোরেটোরের কাজ করতেন। ছোট বেলায় তিনি আইসক্রিম বিক্রি করতেন। একসময় লালবাগে এক বিহারির কাছে কাঠের কাজ করার জন্য নিয়োগ পান। এই নিয়োগ পাওয়ার ঘটনাটা মজা করে বললেন- প্রতিদিন লালবাগে আইসক্রিম বিক্রি করতেন। লালবাগ বিহারির কাঠের দোকানের কাছে আসলে ঐ বিহারি একজন ছেলেকে তার কাজে সহায়তা করার জন্য চাইত। কোথায় পাবে পরে তিনি নিজেই যোগ দেন।

আইসক্রিমের সব জিনিসপত্র মালিককে জমা দিয়ে দেন এবং সেই যে কাজ শুরু করেন এখন পর্যন্ত করছেন। বিহারিরা টেবিল ল্যাম্প, এ্যাসট্রে, পেন পট, খেলনা পাতিল, মোমদানি, ডিম ইত্যাদি বানাতেন। একসময় লালবাগ থেকে পরে নিজের এলাকায় এই কাঠের কাজ শুরু করেন। তিনিও এই সব কাঠের কাজ তৈরি করেন পনের-বিশ বছর ধরে। তিনি নানা ধরনের সামগ্রী যেমন- ফুলদানী, ডালগুটনি, চুরির আলনা, ল্যাম্প হোল্ডার, এ্যাসট্রে রুটি বানানোর বেলান-পিড়ি, খাট, চেয়ার ইত্যাদি জিনিস তৈরি করেছেন। টৌন করা এসব কাজে পরে কখন হাতে রিলিফ ডিজাইন করেন। শুধু চাচ দিয়েও কাঠের কারুশিল্পে লাগাতেন। বিহারিরা শিখিয়েছিলেন। এছাড়াও কাজের চাহিদা মোতবেক এগুলো করতেন। এখন ঐসব কাজ করা হয় না, কারণ ওগুলো তৈরি করে রেখে দিতে হয়। মেলা বা কোন অনুষ্ঠানে নিয়ে বিক্রি করার লোক নেই। এরকম ভাবে করতে গেলে অনেক টাকা আটকে লাগে এবং আটকে থাকে। তবে কেউ যদি অর্ডার দেন এখনও তা করে দেই।

কারুশিল্পের কাজ করতে টাকা লাগে। লোকজনের সংকট তিনি বললেন যে যখন বেশি কাজ পাওয়া যায় তখন অতিরিক্ত লোক প্রয়োজন। এছাড়াও কাজের সহায়তার জন্য কাউকে নিলে বা কাউকে শিখতে নিলে সে একটু শিখে নিজেই দোকান দেয়। ফার্নিচারের পায়া বানালে তিনি নগদ টাকা পান ফলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। প্রতিদিন এইকাজ থাকেই।

তিনি খুলনাতে কাজ করেছেন। গনকপাড়ায় এই কাজ অনেক হত। তার মালিক আবুল কাশেম শেখের করা পণ্য সামগ্রী যাত্রা অটোবি ইত্যাদি বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বিক্রির জন্য দিত। মালিক তাকে সঙ্গে নিয়ে কোন দোকানে পণ্যের সুন্দর ডিজাইন দেখানোর জন্য যেন পরে তা কাঠ দিয়ে বানাতে পারেন। বিহারীরা তাকে অনেক মেশিন দিয়ে গেলেও তিনি তা কোন কাজে লাগাতে পারেনি। এখন মেশিন বিক্রি করে ফেলার পর তাঁর একটু হতাশা জাগ্রত হচ্ছে। ছন্নছাড়ার কারণই নিজেকে দোষারোপ করলেন। আজকে মেশিনগুলো থাকলে ভালো হতো।

বরিশাল, খুলনা, মানিকগঞ্জ, ঢাকা এইসব জায়গায় কাজ করেন। প্রশ্ন করলাম এত জায়গায় কাজ করেছেন ? শেখার জন্য। একেক জায়গার কাজ একেক রকম। তার একটু নমুনা দেখালেন কাজ করে তার উপর টানিং অবস্থাতেই এক ধরণের পলিশ করে দেখালেন। ছেলে বলে বিদেশ যাব, কিন্তু এই কাজ করবে না।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২১
তারিখ ঃ ২৪/১২/২০১৫
সময় ঃ ১১.৫০

Dhaka University Institutional Repository

নাম ঃ মো ঃ সেলিম
বাবার নাম ঃ মৃত আফিজ উদ্দিন মাতবর
মাতার নাম ঃ রোকেয়া বেগম
ঠিকানা ঃ রামপাল ইউনিয়ন, গ্রাম ঃ পানহাটা, পোস্ট ঃ কালির হাটপাড়া, মুন্সিগঞ্জ।
বয়স ঃ ৩৯ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শেণী
মাসিক আয় ঃ ৮,০০০ টাকা
পেশা ঃ কাঠমিস্ত্রী (আসবাবপত্র)
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

বাবা কৃষি কাজ করতেন। বাবা কখনো এই কাঠের কাজ করেননি। তবে তিনি এই কাজের খুব ভক্ত ছিলেন। ছোটবেলা থেকে আঁকা-আঁকিতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন, বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। হালিম মিস্ত্রী ছিলেন তার ওস্তাদ। প্রথম থেকেই তার কাছে কাজ শেখেন। ওস্তাদ ফার্নিচার এর কাজ করতেন। তিন বছর ছিলেন ওস্তাদ মারা যাওয়ায় পরে বিশ্বনাথ বাবুর দোকানে আসেন এবং নিজে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার সাহস করেন, তার নিচে বিশ-ত্রিশ জন মিস্ত্রীর প্রধান হিসাবে কাজ করেন। একটানা নয় বছর তিনি এইখানে কাজ করেন। পরে নিজেই ফার্নিচারের দোকান দেন। সাত-আট জন মিস্ত্রী নিয়ে প্রথম শুরু করেন। পরে মেশিনের সাহায্যে কাজ করেন। যার জন্য কম মিস্ত্রীর প্রয়োজন হয়। বিশ্বনাথের দোকানের পর তিনি যখন নিজের দোকান দেন তখন তার করা ডিজাইন দিয়ে নতুন নতুন ডিজাইন দ্বারা কারুকাজ সম্বলিত আসবাবপত্র তৈরি করেন। তখন মুন্সিগঞ্জে কাঠের ফার্নিচারের চেহারা পাল্টে যায়। নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। সেলিম নামটি পরিচিতি পায়। সেলিমের হাত ধরে একটা নতুন পথের সূচনা হয়। তিনি অন্য ব্যবহারিক কাজ হিসেবে চুরির আলনা, ছোট খাট, ঘর, আনারস, নকশাদার পিড়ি ইত্যাদি সহ অনেক কিছু তৈরি করেছেন। এমন কোন জিনিস নেই যে বানাতে পারবেন না। কাঠের যে কোন কাজ করা তার জন্য সম্ভব পর বলে জানাল। পুরাতন কাঠ দিয়ে এখানে ফার্নিচার করার চল রয়েছে। এগুলো সিজন সমৃদ্ধ কাঠ। এবং ভাল মানের। তাঁর ভিতরে যে সৃষ্টিশীলতা আছে তা তিনি প্রকাশ করতে পারছেন না। আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে তিনি শোরুম করতে পারছেন না। এটা কেটে গেলে ভবিষ্যতে নতুন নতুন ডিজাইনের কাঠের আসবাবপত্রের নতুন মাত্রা সংযোজন করবেন। তাঁর নকশাকৃত এক ধরনের খাটকে এলাকার মানুষে নাম দিয়েছে ‘গাছ খাট’। এই খাট অনেক চলে। এমন পরিস্থিতি হয়েছে এই কারুকাজ সম্বলিত খাট ছাড়া বিয়ে হয় না। তারা খাট, মোগল খাট, ক্যাপসুল খাট ইত্যাদি তিনি তৈরি করেন। এখন তিনি অর্ডারের কাজ বেশি করেন। বাঘের হা করা হাতল সহ সোফা তৈরি করেছেন। এটা ধীরে ধীরে

করছেন। পাগুলো তৈরি হয়ে গেছে। "এই কাজ করতে আমার খুব আনন্দ লাগে। এই আনন্দ নিয়ে আজীবন কাজ করে যেতে পারেন, দোয়া করবেন।"

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২২
তারিখ ঃ ২৪/১২/২০১৫
সময় ঃ ২.০০
নাম ঃ হেমন্ত দাস
বাবার নাম ঃ তীলক চান দাস
মাতার নাম ঃ চীনুবালা রাণী দাস
ঠিকানা ঃ মীরকাদিম পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ।
বয়স ঃ ৩৮ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ মাসে ১০,০০০ টাকা
পেশা ঃ বার্নিশ মিস্ত্রী
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার পূর্বে তিনি মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলেন। প্রশ্ন করতেই তিনি হাসিমুখে কথা বলা শুরু করলেন। সেটা ছিল একটি কারুপণ্যের গায়ে বার্নিশ দেওয়ার একদম শেষ পর্যায়। সুন্দর। ঝকঝকে দেখাচ্ছে। ১৫ বছরের বেশি দিন হলো কাজ শুরু করেছেন। ছোট বেলা থেকেই এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তার বাবাও এই কাজ করতেন। দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ দেখা এবং করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি কাঠ দেখলেই বুঝতে পারেন কোন কাঠে কেমন পলিশ হবে। এই পলিশের কথা শুনে বললেন "আমরাতো একে বার্নিশ বলি, অনেকে অবশ্য পলিশ বলে। ঢাকায় এটার প্রচলন বেশি।" চাচ, স্পিরিট মিশিয়ে বার্নিশ করা হয়। রজন, কার্ফা ও থিনার এক সাথে মিশিয়ে ফিনিশিং টাচ দেওয়া হয় কাঠে শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষার পর ফাটা কিংবা ছিদ্রকে ঢাকার জন্য পুটিং লাগানো হয়। মোম+চকপাউডার মিলিয়ে গরম করে তৈরিকৃত পুটিং লাগানো হয়। কাঠের সাথে মিল রাখার জন্য এই পুটিং এর সঙ্গে কিছু রঙ ব্যবহার করা হয়। কাঠের কারুপণ্যের সব জায়গায় আস্তর দেওয়া হয়। আস্তর দেওয়ার জন্য ঝিনুক পাউডারের সাথে স্পিরিট মিশিয়ে দেন। যে কোন রঙ করার পূর্বে আস্তর দেওয়া হয়। আস্তর দেওয়ার পরে শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষার পরে রঙ দিলে সুন্দর লাগে। কাঠেও তেমন। এরপরে কোন কোন জায়গায় চাহিদা অনুযায়ী মোম পুটিং দিয়ে চাচ স্পিরিট লাগানো হয়। পোকামাকড় থেকে রক্ষা এবং সৌন্দর্য বর্ধনে বার্নিশের তুলনা হয় না। এই কাজে দক্ষতা ছাড়া করা কঠিন। দক্ষতার উপরে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২৩
তারিখ ঃ ২৪/১২/২০১৫
সময় ঃ ৩.৪৬
নাম ঃ মো ঃ বিল্লাল হোসেন
বাবার নাম ঃ মো ঃ আলী হোসেন
মাতার নাম ঃ সারা বেগম
ঠিকানা ঃ পুরান কাঠপট্রি, রেকাবি বাজার, গুদারাঘাট, মুন্সিগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ আউলিয়াপুর, পটুয়াখালি।
বয়স ঃ ২৬ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ তৃতীয় শেণী
মাসিক আয় ঃ ১০,০০০ টাকা
পেশা ঃ বার্নিশ মিস্ত্রী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

মো ঃ বিল্লাল হোসেনের বয়স ২৬ বছর। এই জগতে বেশিদিন ধরে কাজ না করলে, বার্নিশের কাজে খুব দক্ষ। ১০ বছর ধরে কাজ করেন। কাঠের আসবাবপত্রের উপর যে কোন ধরনের বার্নিশ করেন। অন্য জায়গায় চাহিদা অনুযায়ী কাজ করেন। রেকাবি বাজারে সব সময়ের জন্য করেন। এছাড়া মানুষের চাহিদা অনুসারে চলে যান এবং বার্নিশ করেন। তিনি প্রধাণত চাচ বার্নিশ করে থাকেন। ক্লায়েন্ট যে বার্নিশ চায় সেটা করে দেন। আসবাবপত্র তৈরি শেষ হলে তার ডাক পরে। সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষন শেষে শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষামাজা করেন। কাঠের কোথাও কোথাও ফাটা, ছিদ্র, ক্ষত ইত্যাদি থাকে, খুঁজে বের করে পুটিং দেন। মূলত তিনি মোম পুটিং করেন। চাক মোমের সাথে চক পাউডার, কাঠের সাথে মিল রেখে রঙ মিশিয়ে ফাঁকা, ফাটা ইত্যাদি অংশে পুটিং দেন। পুটিং দেওয়ার পরে বাড়তি অংশ গুলো কাঠের বাটাল জাতীয় অথবা বাটালি দিয়ে কেটে নেয়, তারপর আবার শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে বার্নিশ দেন। চাচ, স্পিরিট দিয়ে মিশিয়ে চাচ বার্নিশ করেন। নরম কাপড় দিয়ে কাঠের গায়ে বার্নিশ লাগান। আবার বার্নিশ দিলে প্রায় ১০/১২ বছর চলে। তাঁর বড় ভাইয়ের এই কাছ থেকেই এই বার্নিশের কাজ শিখেছেন। বড় ভাই বিশ বছর যাবৎ এই কাজ করেন। বাজারে রেডি বার্নিশ দিয়ে কখনো বার্নিশ করেছেন ? প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে বাজারে যে বার্নিশ পাওয়া যায় তা তিনি ব্যবহার করেন না। বার্নিশ করার আগে কাঠের উপরে আস্তর দিতে হয়। ঝিনুক পাউডার, স্পিরিট মিশিয়ে কাঠে আস্তর দেন কাঠের ফাইবার দেখানোর জন্য এই আস্তর ব্যবহার হয়। আস্তর দেওয়ার পরে শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে নেন। ভাল করে ঘষার পরে বার্নিশ দিতে হয়। তার নিজের ইচ্ছাই এই কাজ করেন। এই কাজ করে সারাজীবন সৎপথে বেঁচে থাকতে চান তিনি।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২৪
তারিখ ঃ ২৪/১২/২০১৫
সময় ঃ ৪.৩০
নাম ঃ ইব্রাহিম ব্যাপারী
বাবার নাম ঃ আব্দুল মান্নান ব্যাপারি
মাতার নাম ঃ জমিলা খাতুন
ঠিকানা ঃ মিরকিপাড়া, পোস্ট ঃ মীরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ।
বয়স ঃ ৫০ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ ২০,০০০ টাকা
পেশা ঃ কারুশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

তিনি খুব শান্ত স্বভাবের লোক। নিজস্ব কারখানায় সারাদিন যতটুকু ইচ্ছা যখন ইচ্ছা কাজ করেন। নিজে একাই কাজ করেন। বেশি চাপ থাকলে ২/১ জন নিজেদের লোক সহযোগিতা করেন। অন্যদের দিয়ে এসব কাজ হয় না। তিনি বেশির ভাগ টোন মেশিনে কাজ সম্পন্ন করেন বলে দ্রুত করতে পারেন শিরিষ ঘষার কাজটিও মেশিনের সাহায্যে করে থাকেন ফলে লোকের দরকার হয় না কতদিন ধরে এই কাজ করেন। প্রশ্ন করা হলে উত্তরে মুচকি হেসে বললেন ৩৮ বছর ধরে তিনি এই কাজের সাথে জড়িত। মামার কারখানা ইংলিশ রোডে চিত্রামহল (নাগর মহল নাম ছিল আগে) সিনেমার কাছে পাকিস্তান আমলের সময় থেকে ছিল। "আমার মামা বিহারিদের কাছ থেকে এই কাজ শেখে, খালাতো ভাইও ঐ মামার কারখানায় কাজ করতেন। তিনিই আমার ওস্তাদ। এই কাজ শেখানোর পিছনে তিনি অনেক বড় ভূমিকা রাখেন।" ঐখানে তিনি ছাতার বাট, সূতার বোবিন, নোলি, টিফিন কেরিয়ারের হ্যান্ডেল, খরমের গুটি, লাঠি, বিভিন্ন ধরনের খেলনা ইত্যাদি তৈরি করতেন। মামার কারখানা এখনও আছে কিনা জানতে চাইলে, তিনি বললেন মামার কারখানা, এখন আর নেই। মামার ওখান থেকে কাজ শিখে বের হয়ে এসে নিজেই যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যোগাড় করে একটি কারখানা চালু করলেন। সেই যে শুরু আজও কাজ করছি। ১৯৮৮ সালের দিকে মিরপুরে কো-অপারেটিভ মার্কেটে ছোট একটা রুম নিয়ে নিজেই কারখানা দেন। সেখানে একাই কাজ করতেন। ঐ সময় পর্দার মিনার, পর্দার রিং, রোলার, ফার্নিচারের পায়া ইত্যাদি ফার্নিচারে ডিজাইন তৈরি করতেন। ওগুলো ছিল টোন মেশিনে তৈরি।

২০০২ সালের পরে মিরকিপাড়া গ্রামে কাঠের অন্য ধরনের কাজ শুরু করলেন। ল্যাম্পশেড দিয়ে শুরু করেন। টেবিল ল্যাম্প, লম্বা স্ট্যান্ড ল্যাম্প তৈরি করেন। এখন এগুলো ছাড়াও রুটির পিড়ি, বেলনা, পাল্লার ডান্ডা ইত্যাদি বানান। খরাতি মেশিন বা কুন মেশিনে তিনি এই কাজ করেন। মেহগনি কাঠে

করেন। কাজ করার পর শিরিষ পেপারে ঘষে তেতুল বিচি অলনাইট কালার করেন। চাচ স্পিরিটের সাথে কালার মিশিয়ে কাঠে লাগান। নিজেই এসব কাঠের তৈরি কারুশিল্পে কালার করেন। এই কারুপণ্যগুলো বিক্রি করেন গুলশান, ধানমন্ডি (সোবহান বাগ) বেশি জায়গায় মাল দেন না, প্রচুর বিক্রি হয়, শীতের সময় মালের চাহিদা থাকে বেশি। তিনি বারোমাসই কাজ করেন। নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্র দিয়ে কাজ করেন। কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে যন্ত্রটা এই রকম হলে কাজটা করতে সুবিধা হত। সেই রকম যন্ত্র তিনি তার ধারনায় অর্ডার দিয়ে তৈরি করেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এই কাজ করবেন। সম্মানের দিক দিয়ে এ কাজটি কেমন ? "যারা এই কাজ বোঝে তারা আমাকে খুব সম্মান দেয়। আর এই সম্মান পেলে এসব কিছু করাইতো আনন্দ লাগে।"

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২৫
তারিখ ঃ ২৪/১২/২০১৫
সময় ঃ ৬.০০
নাম ঃ গোপাল সূত্রধর
বাবার নাম ঃ শ্রীচরণ সূত্রধর
মাতার নাম ঃ সুভাষী রাণী সূত্রধর
ঠিকানা ঃ গ্রাম+পোস্ট ঃ নৌকাঘাটা, থানা ঃ শিবপুর, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৫৮ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অষ্টম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ ২৫,০০০ টাকা
পেশা ঃ সূত্রধর
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জয়নগর হাই স্কুলে পড়েছেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। পরে আর পড়া সম্ভব হয়নি। সূত্রধর তাদের বংশীয় পেশা। আগে তার বাবা, দাদা, তার দাদা খড়ম, বড় বিয়ের পিঁড়ি, জলচৌকি, লাটিম, আসবাবপত্রসহ নানা ধরনের কাঠের তৈরি জিনিস বানাতেন। কিন্তু এগুলো এখন আর তৈরি করেন না। প্রায় ৩৫/৪০ বছর ধরে রেহেল তৈরি করছেন। তারা কাঠের জিনিসের পরিবর্তন করে এখন শুধু রেহেল তৈরি করেন। দাদা-বাবা ঐ কাজগুলো কারতেন। শিবপুর তেইলা গ্রাম (জাওয়াকান্দি) গ্রামের সূত্রধরেরা ২০০-২৫০ বছর আগে এই রেহেল তৈরি করতেন। ওখান থেকে তারা করা শিখেছেন। অবশ্য বংশ পরম্পরায় এই কাজগুলো হয়ে আসছে। ঐ গ্রামে যেয়ে রেহেলের কাজ শিখেছেন। বিয়ের পিড়ি, খড়ম, লাটিম, ডাব্বা (হুক্কা), লাঙ্গল ইত্যাদির চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে রেহেল তৈরি করা শুরু করেন। বেচে থাকার জন্য এটা তৈরি করছেন। "হিন্দু হয়েছি তাই কি এখন রেহেল মুসলিমরা ব্যবহার করে এবং এজন্য বেশি চলে তাই তৈরি করি।" নৌকাঘাটায় ৪০টি ফ্যামিলি এই রেহেল তৈরির কাজের

সাথে সম্পৃক্ত। শুধু রেইন্ট্রি, আম, কাঁঠাল কাঠ দিয়ে তৈরি করেন। ১" ইঞ্চি থেকে ১$\frac{১}{৪}$" ইঞ্চি পুরু। বড় আকারেরগুলো প্রস্থ ৮$\frac{১}{২}$" দৈর্ঘ্য ১৮" এবং ছোট আকারের মধ্যে প্রস্থ ৮$\frac{১}{২}$" থেকে দৈর্ঘ্য ১২$\frac{১}{২}$"মাপের দুই ধরনের রেহেল বেশি হয়ে থাকে। ডিজাইনটা বাটালি দিয়ে কাটেন। সোল বা কাউরি বাটালি দিয়ে কেটে নেন। বাটালির কাজই বেশি হয়। সাধারণ বাটালিই ব্যবহার করে থাকেন। রিলিফ নকশা করেন না। ডিজাইন সাপ্লাই বা অর্ডার দিলে নকশা সম্বলিত রেহেল তৈরি করেন। নকশাগুলো রিলিফ করে দেওয়াও সম্ভব। শেষে 'স' মিলে এনে পুরুত্বের দিকে মধ্য দিয়ে চিড়ে বা সাইজ করতে হয়। সাইজ করার পর টান দিয়ে ব্যবহার উপযোগী ফোল্ডার তৈরির পরে, আবার বাটালি দিয়ে অমসৃণ অংশ পরিষ্কার করেন। শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষা হয় না। বাটালি দিয়ে যতটা মসৃণ করা যায়। তারপর রঙ লাগানো হয়। মেহগনি রঙ দেন। গজ কাপড়ের সাহায্যে হাত দিয়ে রঙ লাগান। এগুলো তৈরির জন্য 'স' মিল থেকেই কাঠ সংগ্রহ করেন। বেশি যত্ন নিয়ে করলে পোষাবে না। সময় বিবেচনায় রেখে তৈরি করতে হয়। অল্প সময়ে বেশি রেহেল তৈরি করতে হয় কারণ দামের দিকটা সস্তা রাখতে হয়। একেকটা রেহেলে মূল্য ৬০-৭০ টাকা। বেপারিরা ক্রয় করেন এবং তারা বিক্রি করেন ১০০-১৫০ টাকা। তারা মেলায় বিক্রি করেন না। মেলায় বিক্রি করতে পারলে ভালো হত এজন্য দামটা ভালো পাওয়া যেত। হরদম তৈরি বিক্রিও প্রচুর। তাই রেহেল বা মাল থাকে না। ছেলেমেয়েরা বিদেশে চলে গেছে। গোপাল চন্দ্র সূত্রধররা এই কাজ ভবিষৎতেও করে যাবেন। বাব-দাদার পেশা একাজ ছাড়া আর করব কি ? হাসলেন হা হা হা হা ।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২৬
তারিখ ঃ ০১/০১/২০১৬
সময় ঃ ১২.৪৫
নাম ঃ ইদ্রিসুর রহমান
বাবার নাম ঃ মফিজুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ সাহেরা খাতুন
ঠিকানা ঃ বালুধুম, চকবাজার, কুমিল্লা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি
বয়স ঃ ৫৫ বছর
মাসিক আয় ঃ প্রতিদিন ৮০০ টাকা
পেশা ঃ প্রচারক ভাষ্যকর
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

শান্ত স্বভাবের লোক, সুন্দর ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেন। তিনি এগিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কাকে বা কি খুজছেন। ঘটনা শুনেই বুঝে ফেললেন। বললেন তিনিও বালুধুম এলাকায় বাস করেন। ওখানে কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিষয়ে জানতে পারবেন। তার দাদা-দাদীকে খুব কাছে থেকে করতে দেখেছেন। তারা সিদ্ধ হস্তে অনেক দিন এ কাজ করেছেন। একথা বলেই তারপর শুরু করলেন- দাদা-দাদীকে কাঠের কারুশিল্প তৈরি করতে দেখেছেন। বেলন-পিড়ি, পুতুল, ফুলদানি, হুক্কা, রাবার স্ট্যাম্পের গুটি অর্থাৎ কাঠের তৈরি অংশটা বানাতেন। ছোটদের খেলনাও তৈরি করতেন। সব কিছুই হাতে তৈরি করতেন। কুন্দানো মেশিনে এক হাত দিয়ে দড়ি ধরে ঘুরাতেন আরেক হাত দিয়ে বাটালি দিয়ে পণ্যের শেপ আনতেন। সুন্দর সুন্দর কারুপণ্য তৈরি করতেন। এখন ঐরকম কাজ হয় না কারণটা কি ? প্রশ্ন করতেই তিনি উত্তর দেন কত ধরনের জিনিস বেরিয়েছে দামও শস্তা, কিন্তু কাঠের জিনিসের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তা তৈরি করেন না কারণ বেশি দামে কিনতে চায়না। পোশায়না। তাই অনেক হ্রাস পেয়েছে। এখন হাতের পরিবর্তে অনেকটা মেশিনে করে। মটর লাগানো টানিং মেশিনেও কাজ করেন। বেশি পণ্য উৎপন্ন করলেও দামে পোশায়না প্লাস্টিকের পণ্য শস্তা পাওয়া যায়।

দাদীকে রঙ করতে দেখেছেন। গর্ত করে পচাকাদার মধ্যে হুক্কার নারকেলের হুক্কা অংশ ডুবিয়ে রাখতেন। তোলার পরে চুন দিয়ে শুকিয়ে, কাপড় দিয়ে মুছতেন এরকম কয়েকবার করার পরে কালো রঙ হয়ে যেত। এর জন্য দুইদিন ডুবিয়ে রাখতে হত। কাঠের অংশে কোন রঙ করতেন। কখনও কখনও কাঠের নলে রঙ করতেন না। একাজটা পুরুষরা করতেন না। কুন্দানোর পরে উৎপাদিত পণ্যের গায়ে দাদাকে রিলিফ করে নকশা কাটতে দেখেছি। মাঝে মাঝে অর্ডারের চাহিদা মোতাবেক বহু করে দিতেন। এই এলাকায় অনেক কারখানা ঐসময় গড়ে উঠেছিল। এখন অনেক বন্ধ হয়ে গেছে। তার বাবা করেছেন তবে বেশি দিন করেনি। মফিজুল ইসলাম এ কাজ কখনও করেননি।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২৭
তারিখ ঃ ০১/০১/২০১৬
সময় ঃ ২.৪৬
নাম ঃ মো ঃ জালাল
বাবার নাম ঃ আব্দুল মজিদ
মাতার নাম ঃ মরিয়ম বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম+পোস্ট ঃ জাফরগঞ্জ, থানা ঃ দেবিদ্ধার, কুমিল্লা।
বয়স ঃ ২৩ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অষ্টম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ প্রতিমাসে ২০,০০০ টাকা
পেশা ঃ নকশা মিস্ত্রী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

একাধারে ফার্নিচার দোকানের মালিক এবং নকশাকার। জাফরগঞ্জ এলাকায় নকশাকার হিসেবে বেশ সুনাম আছে। তার মামাদের কাছে থেকে সতের-আঠারো বছর ধরে নকশার কাজ শিখেছেন। তার মা তাকে ছোটবেলা মামাদের কাছে দিয়ে আসে নকশার কাজ শেখার জন্য। মামারা এ কাজে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। এই নকশার কাজ প্রায় ৭ বছর শিখতে লেগেছে। এখন নিজে নিজেই ডিজাইন সৃষ্টি করেন। আঁকা-আঁকি করতে অভ্যস্ত। অন্য জায়গা থেকে মিস্ত্রীরাও নকশা একে নিতে আসেন। একবার সিলেটের এক ভদ্র লোক তার কাজের প্রশংসা শুনে, কাঠের কাজ করানোর জন্য তার কাছে আসেন। তিনি ১৫ দিনের জন্য সিলেটে কাজ করতে যান এবং থাকেন। একবার জাফলং-এ ৬ দিনের জন্য যান এবং যেখানে থেকে দরজার গায়ে কারুকাজ করেন। খুব প্রশংসিত হন। মানুষের ছবিও কাঠে অনায়াসে করে দিতে পারবেন।

গামারি ও সেগুন কাঠে নকশা করতে ভালো লাগে। কলসি নকশা, দড়ি নকশা, গর্জিয়াস মডেলের নকশা এরকম বিভিন্ন নামের নকশা করেন। ঢাকায় থেকে নকশা বাটালি এনে নক্শা করেন। 'স' মিল অথবা গ্রাম থেকে কাঠ কিনে এনে প্রায় ছয় মাস শুকিয়ে তারপর তাতে কাজ করা হয়। শুকিয়ে নিলে সবচেয়ে ভাল সিজন হয়। কিন্তু পল কাঠ থাকলে সেইকাঠে সাধারনত এনড্রিন ও পানি মিশিয়ে কাঠে দেওয়া হয়। বেশ কিছু দিন রেখে কাজ করলে, ঘুন পোকসহ নানান পোকা মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কাঠে নকশা করার আগে কাগজে ফরমা করে নেন। চাহিদা খুব বেশি। একাশি, কড়ই, সেগুন, গামারি, বেলজিয়াম, জাম, সেগুরি, লোহা কাঠ দিয়ে কাঠ দিয়েও ফার্নিচার তৈরি করেন। কাঠের তৈরি কারুশিল্প নিয়ে আরও নতুন কিছু করার পরিকল্পনা আছে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২৮
তারিখ ঃ ০২/০১/২০১৬
সময় ঃ ২.৪৫
নাম ঃ মো ঃ মুরাদ হোসেন
বাবার নাম ঃ মো ঃ আব্দুর রহিম
মাতার নাম ঃ মাহেলা বেগম
ঠিকানা ঃ চকবাজার, বালুধুম, পশ্চিম পাড়া, কুমিল্লা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম শ্রেণি
বয়স ঃ ৫৭ বছর
মাসিক আয় ঃ দিন চলে যায়।
পেশা ঃ মুদি দোকান
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

কাঠের তৈরি কারুশিল্প তৈরি করতে মেশিন ব্যবহার করতেন না। পুরটাই হাতে করতে হত। এই কাজে হাত-পা চারটিই কাজে লাগত, একহাতে ঘোরানোর জন্য দড়ির সাহায্যে টানতেন। আরেক হাতে বাটালি ধরতেন। এ ভাবে করতেন। তার দাদারা এ কাজ করেন নাই। তার বাবার সময় থেকে এই কাজের শুরু হয়। তার বাবা একাজ প্রচুর করতেন। বাঙালিরাই এই কাজের উদ্ভাবক এবং বালুধুম থেকেই এই কাজের সৃষ্টি। এটাকে খরাদি কাজও বলে। যখন হাতে করা হতো তখন এটাকে খরাদি কাজ বলা হতো। মটরে যেটা করে সেটা হলো কুন্দানো কাজ। খাটের পায়া, চেয়ারের পায়া, নইচ্যা (হুক্কার নল) এর উৎপন্ন এখানেই। সীলের অর্থাৎ রাবার স্ট্যাম্পের সব জিনিস তারা বানাতেন। খরমের বল্যাটা মহিষের শিং দিয়ে হাতে বানাতেন। বেলন-পিড়ি, এ্যাস্ট্রে, পুতুল, খেলনা সমাগ্রী ফুলদানি ইত্যাদি বানাতেন। এনামেল পেইন্ট করতেন। আগরদানি, চুড়ির আলনা, মোমবাতির স্ট্যান্ড, ছোটদের হাড়িপাতিল ইত্যাদি বানাতেন। তাদের বংশের মেয়েরাই হুক্কার ডাবার কালো রঙ করত এটা কুমিল্লার ঐতিহ্যে পরিণত হয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে একই রঙ করার চেষ্টা করেও পারেনি। অক্সফামও আসছে। বিদেশী পর্যটক সহ অক্সফামের মানুষেরা এ সবের ছবি তুলে নেয়। জাপানিরা রঙ-টা শেখার জন্য চেষ্টা করেও তা শিখতে পারেনি, তবে তারা অনেক ছবি তুলে নিয়েছে। রঙ করার পদ্ধতি জানতে চাইলে তিনি বললেন পাহাড়িয়া অঞ্চলের টেরি গাছের ফল সিদ্ধ করতেন, সাথে নীল, মিশিয়ে তরল বানাতেন। হুক্কার রঙ-এর তরল দিয়ে শুকিয়ে কাদার মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দিতেন। রঙ আসার জন্য তিন চার দিন পরে তুলে শুকাতে হতো। পরে ওর উপরে চুনের প্রলেপ দিতেন। ২/৩ ঘন্টা রোদে রেখে শুকানোর পর সুতি কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতেন। পুনরায় টেরির তৈরি রঙয়ের প্রলেপ দিয়ে আবার রোদে শুকাতেন। আবার দিতেন। তিন দিনের মধ্যে প্রায় ১৫/১৬ বার দিতেন। মেয়েরা এই কাজটি করতেন কারণ কাজটি সাংঘাতিক জটিল। ধৈর্যশীলতো

অবশ্যই। রুটি বানানোর কাঠের বেলনে রঙ করার জন্য টেরির লিকুইডের প্রলেপ দিতেন কিন্তু কাঁদাতে চুবাতেন না। একই পদ্ধতিতে কাঠের অন্যান্য কারুপণ্যে রঙ করতেন। শুধু মাত্র পুতুলে এ্যানামেল রঙ ব্যবহার করা হতো। তখন ঘন ঘন এখানে অনেকে আসত। "আমরাও খুশি হতাম। নিজেদেরকেও অন্য রকম লাগত, মনে হতো দেশের জন্য আমরা কিছু করতে পারছি। দোকানের ব্যবসার মধ্যে এই আনন্দ খুজে পাইনা। পেট চালানোর জন্য এসব করে যাচ্ছি।" কোথাও এই রঙ করার পদ্ধতি জানত না। তিনি মনে করেন একমাত্র তারাই এই পদ্ধতিতে রঙ করতে পারতেন। ক্যাকরা, পিছলা, কুরছা, ছাইতানি, গামারি, পোয়াকাঠ রেন্ট্রি কড়ই, কদম ইত্যাদি। কুরছা কাঠে কখনও ঘুনে ধরত না। সেগুন কাঠের কাজ করতেন। এনড্রিন, ফিনিস পানিতে মিশিয়ে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পানিতে চুবিয়ে রাখতেন। পরে রৌদ্রে শুকিয়ে কাজ করতেন। দীর্ঘ মেয়াদি টেকসই হতো। ৩০/৪০ বছরেরও কিছু হয় না।

ঐ সময়ে বাজারে চাহিদা ব্যাপক ছিল। বিদেশী বাজারেও এই শিল্পের চাহিদা ছিল। এখন ঐ চাহিদা নাই। তিনি আরও বললেন গুনাহগার সিনেমায় "ববিতা আমাদের পুতুল নিয়ে গান করেন কুমিল্লার পুতুল কিনতে কইরনাভূল পাইবেনা এমন পুতুল এমন পুতুল।" ১৯৭৮/৭৯ সালে এই ছবি মুক্তি পায়। গানটিও ব্যাপক সারা ফেলে। এক ঝাকা পুতুল কিনেছিল। ববিতার হাতে এক ঝাকা পুতুলসহ শ্যুটিং হয় এবং ঝাকা থেকে পুতুল গুলো ঢেলে দেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মুরাদ হোসেন কাজ করেন। তারপর আর করেননি। প্রশিক্ষক হিসেবে কুমিল্লা বিসিকে ৫৯জন মেয়েদের মহিলা মন্ত্রণালয়ে একসাথে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দেন।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ২৯
তারিখ ঃ ০২/০১/২০১৬
সময় ঃ ৫.১০
নাম ঃ মো ঃ সেতু মিঞা
বাবার নাম ঃ গেদু মিঞা
মাতার নাম ঃ মইরোম বিবি
ঠিকানা ঃ কাঁটাবিল, চকবাজার, কুমিল্লা।
বয়স ঃ ৭৭ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ প্রতিদিন ৭০০ টাকা
পেশা ঃ কারুশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

তিনি তার বাবার কাছে থেকে শিখেছেন তার বাবা শিখেছেন তার দাদার কাছে। তার দাদা কলকাতা থেকে শিখেছেন, এ তথ্য বাবার কাছে থেকে শুনেছেন। দাদার কারখানা দেন এবং প্রচুর কাজ করেন। দাদার পরে তার বাবাও চকবাজারে কারখানা দেন। দাদা হুক্কা বানাতো, খরম, নলি (তাঁতের) ববিন, রাবার স্ট্যাম্পের কাঠের অংশ, এ্যাসট্রে, খেলনা ইত্যাদি বানাতেন। তিনি ফুলদানি করতেন, এবং তাতে হাতে নকশা করতেন। বংশ পরম্পরায় তারা এই কাজ করে যাচ্ছে। ব্যবহারিক জিনিস বানায় ওয়ান টাইম হিসাব করে তৈরি করেন এই সব জিনিস। রুটির পিড়ি, বেলন, ব্যাট, ডাল গুটুনি, কাঠি, ফুলদানি, লাটাই, হুক্কা ইত্যাদি তৈরি করেন। ভালো কাঠ পাওয়া যায় কিন্তু পোষায় না তাই ভালো কাঠ দিয়ে তৈরি করে না। আগে পাবনা থেকে, বাবুর হাট থেকে নলি, ববিন ইত্যাদি নেওয়ার জন্য ওর্ডার পেতেন। এখন প্লাষ্টিকের পণ্যের কারণে এজাতীয় কাজ আর হয় না্ যে কোন কাঠের কাজের ওর্ডার পেলে বা যেরকম ডিজাইন দেখায় সে অনুযায়ীই করে দেন। তার ছেলেকেও এ কাজ শিখিয়েছেন। তার ছেলে পাশে থেকে বলল পেটে-ভাতে চলে যায়। যতদিন পারবেন ততোদিন এ কাজ করবেন। সেই ছোটবেলা থেকে প্রায় ৭০ বছর যাবৎ এ কাজ করছেন। সংসারের প্রয়োজনে করে থাকেন। এই কাজের আগে খুব চাহিদা ছিল এখন ঐ রকম চাহিদা নাই। এ কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করেন। আর সাধনাতো আছে। কিভাবে সুন্দর করা যায় তার সাধনা। ব্যাট কদম কাঠ দিয়ে তৈরি করেন। ঢাকা থেকে স্ট্রিকার কিনে লাগিয়ে দেন। প্যাকিজিং এর কাজটাও সুন্দর ভাবে করেন। বিক্রির জন্য আকর্ষণ করার জন্য অতিরিক্ত এগুলো লাগানো হয়। এটাকে কাঠের কুটির শিল্প বলে। এই কাজগুলো এই অঞ্চলকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে। হুক্কাতো এই অঞ্চলে তৈরি হতো এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় এখান থেকে যেত। হুক্কাকেও নইচ্যা বলে। হুক্কার নাম এই অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় বলে ডাবা। কাঠের অংশকে ডাবা নল বলে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা হুক্কা ৫ টাকায় বিক্রি করতেন। এখন ১০০-১৫০-২০০ টাকার বেশি বিক্রি করে। পূর্বে তিনি খরমের বইল্যা মহিষের শিং থেকে তৈরি করতেন। তিন-চারটি পরিবারের মেয়েরা এই কাজ করত। এটা ধৈর্য্যশীল কাজ ছিল বলে মেয়েরা করত। এই রঙ কখনও উঠত না। কালো রঙ ধারন করত। তিনি বললেন হুক্কা নিয়ে গল্প আছে স্বাধীনের পর ইংরেজরা দেখত এটা কি ? আশ্চর্য্য হতেন। এবং বলত কারণটা সিগারেট খেলে সরাসরি ধোয়া ভিতরে ঢুকতো যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু হুক্কায় পানির ভিতর দিয়ে ধোয়া ভিতরে ঢুকতো যার জন্য ঝুকি কম থাকতো। ইংরেজরা তাদের দোকানে হুক্কা কেনার জন্য আসতেন। স্বভাবতই ইংরেজিতে দাম জিজ্ঞেস করতেন। সেতু ইংরেজদের কথা না বুঝে হাতের ৫ টাকার পরিবর্তে পাঁচ আঙ্গুল দেখাতেন। তার ফলে ইংরেজরা ৫০০ টাকা দিয়ে কিনে নিতেন। তখন চকবাজারে দোকান ছিল। খরমেরও চাহিদা ছিল। কোথায় গেল সেই সময়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

দিলেন যোগী মারা গেলে বসিয়ে মাটি দেয় এবং হাতে হুক্কা ধরিয়ে দেয়। এটা যোগীদের ধর্মীয় আচার। মরা ব্যাক্তির হাতে হুক্কা দিয়ে দিতে হবে। এই জন্য হুক্কার বিক্রি এখনও আছে।

হুক্কার রঙ করত মেয়েরা। যে মেয়েরা এটা করত তাদের চাহিদা ছিল সমাজে। প্রচলিত ছিল বিয়ে করতে উল্টো তাদের টাকা পয়সা দিয়ে বিয়ে করতে হতো। 'টেরি' গাছের ফলে তৈরিকৃত লিকুইড ডাবাতে লাগিয়ে কাদার সাথে মিশিয়ে হুক্কাটি কাদার গর্তে ডুবিয়ে রাখতেন। বেশ কয়েকবার করার পরে কালো হয়ে যেত। রংটা শুধু মেয়েরাই করত। কারণটা কি ? এমন প্রশ্নে তিনি বললেন কাজটা করতে খুব ভেজাল ছিল। ধৈর্য্যেরও বিষয় ছিল। আমার মাও করত। এই রঙ এর কাজটা আমার করা। বাবা মাকে শিখিয়েছিলেন।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ৩০
তারিখ ঃ ০৯/০১/২০১৬
সময় ঃ ২.৫০
নাম ঃ কার্তিক চন্দ্র সূত্রধর
বাবার নাম ঃ রাখাল চন্দ্র সূত্রধর
মাতার নাম ঃ ভাষানী রানী সূত্রধর
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ খোশকান্দি, পোস্ট ঃ দ্বারিয়ারচর, থানা ঃ বাঞ্ছারামপর, ব্রাক্ষনবাড়িয়া।
বয়স ঃ ৫৩ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ সমান সমান
পেশা ঃ কাঠের কারুশিল্পী
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

সবার মূর্তিকেই আবার বিগ্রহ বলা যাবে না। দেব-দেবী, ধর্ম-গুরু, ধর্ম প্রচারক তাদেরকেই নিয়ে গড়া মূর্তিকে বিগ্রহ বলে। কথা বলাটা বিগ্রহ দিয়ে শুরু করলেন। খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করলেন। কাঠের তৈরি যে মূর্তি তাকে বিগ্রহ বলে। যেমন কাঠের তৈরি ঘোড়া বা আপনার মূর্তি বিগ্রহ হবে না। এই বিগ্রহ কার কাছে থেকে শিখেছেন ? তখন তিনি বললেন বিগ্রহ মূর্তি নিজে নিজেই শিখেছেন। ওস্তাদ নেই। এটা শেখার আগে ফার্নিচারের কাজ করতেন। কারো ডাকে বা অর্ডার পেলে কাজ করতে যান। এখনও এভাবে কাজ করেন। রবীন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের কাছ থেকে কাজ শিখেছেন বংশ পরম্পরায় তিনি সূত্রধর। ছোটবেলা থেকেই রাখাল চন্দ্র সূত্রধরের কাছেই কাজ শিখেছে। তার বাবা রাখাল চন্দ্র সূত্রধর টানিং এর কাজ করতেন বেশি। অন্য কাজও করতেন। তিনি দেখেছেন তার মা দড়ি দিয়ে চাকা ঘুরাতেন বাবা টানিং এর কাজ করতেন।

আলগোছি, গাছা, সিংহাসন। সিংহাসন বলার সাথে সাথে বললেন সিংহের আসন। হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে। সিংহের আসন, সিংহের পা অবশ্যই থাকতে হবে। তার তৈরিকৃত আসনে সিংহের পা সম্বলিত। এমনি আসন তিনি অনেক বানিয়েছেন। তিনি আরও বললেন অনেকে জানেনা তাই আসনে পা দেয় না। তিনি আরও বললেন সিংহের পা ছাড়া সিংহাসন হয় না। কুমিরের মাথা সম্বলিত চুলের কাটা বানিয়েছেন। রেহাল, রুটি বানানো পিড়ি, বেলনা, লাটিম, চুরির আলনা, কাঠের ধর্মীয় মূর্তি বা বিগ্রহ, খড়ম, কাঠের স্যান্ডেল, ঝুটিওয়ালা পাখি সর্পসহ সিংহাসনেও খোদিত করেছেন। হরিণ, সিংহ বিভিন্ন প্রাণীর মাথা তৈরি করেছেন কাঠ দিয়ে। বাঘ, কাঠের ঘোড়া, ময়ূর এমনি ধরনের জিনিস তৈরি করেছেন। ছোটবেলায় বিমান, গরুরগাড়ি ইত্যাদি খেলনা তৈরি করেছেন। সবচেয়ে কাঠের বিগ্রহ কাজ করতে ভাল লাগে, আনন্দ লাগে। বর্তমানে নকশা করা তার প্রধান কাজ। বিভিন্ন ধরনের নকশা করেন, নিজেই নকশা খাতায় আঁকেন, এবং নকশা তোলেন। পরে বাটালী দ্বারা কেটে কোটে কাঠে করেন। কাঠের পরিও তৈরি করেন এবং তা খাটে লাগিয়ে দেন। আরও কিছু ঝুমকা, কেরা, পাশা, পাশা বলতেই জিজ্ঞাসা করলাম পাশা আসলে কি? তিনি বললেন পাশা নকশাটা হলো কানের গহনা থেকে নেয়া, গোলাপ নকশা। এমনি নানা ধরনের নকশা করে থাকেন।

অর্ডারী কাজ বেশি করে থাকেন। কখনও অর্ডারকারী কাঠ কিনে দেন। কখন তিনি নিজেই কাঠ ক্রয় করেন। 'সিজন' করা কাঠ ছাড়া কাজ করেন না। 'সিজন' করার জন্য আলো বাতাসে রেখে দেন। এতে ভাল সিজন হয়। কাঠের মোটা চিকন বুঝে সিজনের সময় নেয়। কখনও কখনও ছয় মাসের বেশি সময় নেয়। যখন কাঠ পুরু বা মোটা হয় তখন বেশি সময় লাগে। কাঠের চাড়ি বানিয়েছেন আজ থেকে প্রায় পয়ত্রিশ বছর আগে। আমকাঠ দিয়ে বানিয়েছেন। খোশকান্দি অঞ্চলে এক সময় প্রচুর তাঁতশিল্প থাকার কারণে কাঠের চাড়ির ব্যবহার ছিল। তখন কাঠের চাড়িতে সূতা রং করত। ধোয়ার কাজেও ব্যবহার হত। কাঠের চারিতে সূতা নষ্ট হত না। ছোট ছোট কাঠের চাড়িতে ভাতের মার গালত। বড় থালা যেটাকে খঞ্চা বলে, এটা মিষ্টির দোকানে মিষ্টি বানানোর কাজে ব্যবহার করে। সাতানি, কুমিল্লা জেলার একটা এলাকার সেখানে খঞ্চা তৈরি করতে। তারাও হিন্দু সূত্রধর ছিল। তারা ছিল তার আত্মীয় স্বজন। এখন আর বানায় না। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া থানার ফুলদি গ্রামেও খঞ্চা বানাতো। এখন বানায় কিনা তিনি বলতে পারছেন না। তিনি নিজেও খঞ্চা বানিয়েছেন। অর্ডার দিত এবং নিজেরা বানিয়ে লাঙ্গল বন্দের মেলায় বিক্রি করেছেন। ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর আগেও ২০০ থেকে ৩০০ টাকা বিক্রি করতেন। খঞ্চা বানানোর জন্য বড় বড় ৭/৮ ফুট দড়ির বেরের গাছ ফালি করে কম্পাস দিয়ে গোল করতেন। আগে কুড়াল দিয়ে কেটে তারপর বাইশ দিয়ে সমান করতেন। এতে কোন রিলিফ করে নকশা করত না। প্লেন বা সমান থাকত

যাতে ময়লা না জমে। সেদিকে খেয়াল রেখে। এছাড়া লাঙ্গল, জোয়াল, মই ও বানিয়েছে। কোষা নৌকার কাজও করেছেন।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ৩১
তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৬
সময় ঃ ১০.১০
নাম ঃ অজীত
বাবার নাম ঃ মতিলাল সূত্রধর
মাতার নাম ঃ সুশীলা রাণী সূত্রধর
ঠিকানা ঃ গ্রাম+পোস্ট ঃ নৌকা ঘাটা, থানা ঃ শিবপুর, নরসিংদী।
বয়স ঃ ৪৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ সংসার চলে যায়।
পেশা ঃ সূত্রধর
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

"আমার পৈত্রিক পেশা। বাব-দাদারা এই সূত্রধর পেশার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আমিও এই পেশা ভক্তি সহকারে করছি। ছাড়তে পারিনা, অনেক বার ছাড়তে চেয়েছি। রক্তে মিশে আছে তো তাই একাজ করি।" এমনি অনেকগুলো কথা বলে শুরু করলেন। তখন তার হাতে বাটালি আরেক হাতে রেহেল। কাঠের তৈরি রেহেল। কতদিন ধরে এই রেহেল তৈরি করছেন? ২০ বছর তো হবেই। রেহেল অনেক চলে। মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, তারাইতো এগুলো ব্যবহার করেন। এখন এর ব্যবহারটাও বেরেছে। রেহেল দেখতে অনেক কঠিন হলেও তৈরি করতে বেশ সহজ। কাউরি কাটার পর 'স' মিলে এনে ভার্টিক্যালি ফালি করলেই রেহেল তৈরি হয়ে যায়। দুটি আয়তাকার কাঠের পাল্লার সমন্বয়ে গঠিত এই রেহেল। কাউরি কাটার পর ফালির পরে দুটুকরো হয়ে পাল্লার তৈরি করে কবজার মত কাজ করে। কোন জোড়া লাগে না। এজন্য দক্ষতা এবং সূক্ষ্ম হিসাব দরকার। এই হিসাবটা করতে হয় না এত করেছেন এখন অতি সহজেই হয়ে যায়। পাল্লার গায়ে কোন নকশা হয় ? রেকি বাটালি দিয়ে কেটে কেটে চন্দ্রের মত কিছু ফর্ম। যা হাল্কা নকশার মধ্যে পরে। পাল্লার নিচের দিকে ইসলামী স্থাপত্যের প্যাটার্নে নকশা করেন। তা শুধুমাত্র বাটালি দিয়ে করেন।

এছাড়াও তিনি আরেকটি অতিপ্রয়োজনীয় কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী কাঠের তৈরি কারুশিল্প করেন। এর নাম বললেন, এটার নাম হলো 'ইরি ক্ষেতের ঠেলা কোদাল।' এক টুকরা কাঠের সঙ্গে লোহার রডকে বাকা করে স্ক্রু দিয়ে আটকান। মাঝামাঝি অবস্থানে এক মাথা চোখা আরেকমাথা চ্যাপ্ট তাতে স্ক্রু দিয়ে

কাঠে লাগান। এই রডের চোখা দিকে কাঠের কট লাগান ঠেলার জন্য। মিশ্র মাধ্যমের ছোট কাঠের সামগ্রিটি ধানের ক্ষেতের লাইন ঠিক রাখার এবং জঙ্গল বাছাইয়ের কাজে ব্যবহার হয়। অর্ডার দিলে তৈরি করেন। মেলায় যাওয়া হয় না। পূর্বে কাঠের নানা জিনিস তৈরি করতেন, গাছা, লাটিম, পিড়ি, জলচৌকি, হুক্কা, লাঠি ইত্যাদি তৈরি করতেন। নামের সাথে সূত্রধর আছে তো তাই দুচোখে যা দেখেন কাঠ দিয়ে তাই বানাতে পারেন।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ৩২
তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৬
সময় ঃ ১১.০০
নাম ঃ মো ঃ রফিকউদ্দিন
বাবার নাম ঃ মৃত আসমত আলী
মাতার নাম ঃ ফুলেছা বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ বেতাগিয়া, পোস্ট ঃ কামরাব, থানা ঃ শিবপুর, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৬০ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ ১০,০০০-১২,০০০ টাকা
পেশা ঃ কুটিরশিল্পী
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

মূল পেশা কৃষি। কৃষি কাজের পাশাপাশি অবসরে এই কাজ করেন। দাদার তার দাদার আমল থেকে এই কাজ করছেন। স্বচ্ছল জীবন যাপনের জন্য এই কাজ করছেন। "এই কাজ আমাদেরকে অনেক আর্থিক স্বচ্ছল করেছেন।" খড়ম, হুক্কা, লাঙ্গল, রুটি বানানো পিড়ি, জলচৌকি, চামচ, বগুনা (গাছা), লাটিম, খুন্দরী (ডুগডুগী), লবণ দানী, বেলনা, নানা ধরনের আছারী তৈরি করেন। শ্লেট-এর চাকা (ফ্রেম) বানাতেন। হুক্কা পুরা কাঠ দিয়ে তৈরি করতেন। প্রথমে কুন্দানো মেশিন দিয়ে ডাব্বা অংশটা করতেন। পরে ঐ ডাব্বার মধ্যে দিয়ে করাত দিয়ে কেটে ভিতর থেকে বাটালি দিয়ে কেটে গর্ত করতেন। তারপর ঘাত কেটে একটা আরেকটার মধ্যে বসিয়ে দিতেন। এমনভাবে জোড়া দিতেন পানি তা থেকে পড়ত না। কাঠের তৈরি হুক্কা তৈরি করত শুধু মাটির কলকা থাকত। এখন তো নারকেলের ডাব্বা হয়। নলচ্যাটা শুধু কাঠের থাকে। চান মিঞা এই অঞ্চলে গ্যালারির উদ্ভাবন করেন। তিনিই প্রথম এটা তৈরি করেন। পরে "আমিই এই এলাকার গ্যালারি তৈরি করি। এখন শুধুমাত্র আমিই কাঠের গ্যালারি তৈরি করি।" গ্যালারি সিগারেট, পান ইত্যাদি বিক্রির জন্য ব্যবহার করেন। কাঠাল, জলপাই, রেন্ট্রি এগুলো দিয়ে বানায়। পাতলা কাঠ $\frac{১}{২}$" পুরু হবে এমন কাঠ দিয়ে বানায়। একেকটা অনেক দিন যায় ৫০-৬০ বছর টেকসই হয়। কিন্তু তৈরি করার সময় খেয়াল রাখতে হবে দামটা কমের মধ্যে রাখতে হবে। ২০০-২৫০ টাকা প্রতিটা

গ্যালারী বিক্রি করেন। বেপারিরা ৪০০-৫০০ টাকায় বিক্রি করেন। বেতাগিয়া অঞ্চলে একমাত্র তিনিই রেহেল তৈরি করেন। এখন কেউ অর্ডার দিলে বড় বড় চামচ বানান কখনও ছোট ছোট চামচ বানান। এবং অন্যান্য কাজ করেন। রেহেল বিক্রি করে ৬০-৭০ টাকা তৈরি আপনার কি মনে হয় এই অঞ্চলে কাঠের এত ধরনের কাজ কাদের থেকে শুরু হল এবং কোথা থেকে এল ? "তাতো জানি না। তবে আমরা ছোঠ বেলা থেকেই দেখি আমাদের বংশের লোকেরা এগুলো তৈরি করছে। এখনও নানা ধরনের কাজ আমরা করছি। আপনার কথা অনুযায়ী হিন্দুদের বসবাস এই অঞ্চলে ছিল।" কারণ হিন্দুদের নাম দেখা যায়। তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সূত্রধর দেয় বসবাস ছিল তা হয়ত তাদের মাধ্যমেই একাজ এই অঞ্চলে আসে। জীবন জীবিকার জন্যই তারা (রফিকউদ্দিন) এ কাজ করে থাকেন। বাড়তি একটা ইনকাম হয়। আশে পাশে কলকারখানা না থাকায় তাই হাতের কাজগুলি এখানে বেশি হয়। সবাই কিছু না কিছু কর্ম করে খেতে চায়। দরীদ্র মানুষরা বেশি করে থাকে। এই কাজ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ত করবে না। সন্তানাদি সবাই শিক্ষা গ্রহণ করছে। তারা কেউ কেউ বিদেশ যেতে চায় না হলে চাকরি করতে চায়। তবে এই কাজ সন্তানরা শিখেছে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ৩৩
তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৬
সময় ঃ ১.০০
নাম ঃ মো ঃ চান মিঞা
বাবার নাম ঃ মৃত বন্দে আলী
মাতার নাম ঃ তাহেরা বেগম
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ বেতাগিয়া, পোস্ট ঃ কামরাব, থানা ঃ শিবপুর, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৫২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ ৪০,০০০ টাকা
পেশা ঃ কারুশিল্প
ধর্ম ঃ ইসলাম
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

'মস্কা' নামটা কিভাবে এলো ? তিনি বললেন পূর্বে থেকে এই নাম প্রচলিত। সবার মুখে মুখে। এখনও এই নামের কোন পরিবর্তন হয় নাই। বাবা-দাদারা এই কাজ করেছেন। দাদারা সেই ব্রিটিশদের সময় থেকে এ কাজ করছেন। অনেক আগে থেকে তারা মস্কা বানাচ্ছেন। আগে রান্দা দিয়ে ঘষে তৈরি করত এখন বাইশ দিয়ে কেটে কেটে তৈরি করেন। "যুগ যুগ ধরে আমরাই তৈরি করে আসছি এখন কারা কোথা থেকে শিখেছে, কার কাছ থেকে তারা শিখেছে, তা বলতে পারছি না। আমি স্বরণ করে দেওয়ার জন্য বললাম এই অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায় বসবাস করত। তাদের মধ্যে সূত্রধর সম্প্রদায় ছিল তাঁরা হয়ত এই

কাজ করতে পারে।" হয়ত সূত্রধরদের হাতেই এই কাজ এখানে আসতে পারে কারণ তারা কাঠের নানা ধরনের কাজ জানত এবং করত। তবে সঠিক জানি না। ছোটবেলা থেকেই এই কাজ করছেন। তিনি কাঠের কাজের নানা জিনিস তৈরি করতে পারেন। যা দেখেন চেষ্টা করলে তাই তৈরি করতে পারেন। মস্কার কাজে ইনকাম বেশি, দ্রুত করা হয়, অল্প সময়ে টাকা বেশি তাই অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে এখন শুধু এই কাজ করছেন। কি ধরনের কাঠ দিয়ে করেন ? উত্তরে বললেন দাতই কাঠ দিয়ে। পাহড়ী অঞ্চলে এই কাঠ হয়। জঙ্গলে এ গাছ এমনি এমনিই জন্মে। এই গাছের কোন চাষ হয় না। এজন্য পাহাড়ী জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা হয়। এর বিকল্প হিসেবে ছাইতান গাছ ব্যবহার হয়। কিন্তু তা ব্যবহারের সময় দ্রুত ভেঙ্গে যায়। ১০" দৈর্ঘ্যে ছাও দিয়ে ফালি করেন তারপর বাইশ দিয়ে কেটে কেটে সাইজ করেন এবং পুরুত্ব ৪ সুত রাখেন। যে বাটালি দিয়ে করে তার নাম 'বাংলা বাটাল'। মাথাটা সাধারণ বাটালির চেয়ে খুব চওড়া থাকে। তক্তায় হবে না। 'স' মিলে কাঠের চেরা তক্তা দিয়ে হবে না। এই কাজের জন্য কাঠে আশ বুঝে চিড়তে হবে। দিনে পূর্ণ পরিশ্রম দিলে ১০০টা 'মস্কা' বানানো যায়। একটা মস্কা তৈরির পিছে ১৪ বার হাত দিলে শেষ করা সম্ভব হয়। নিজের তৈরি করা বিশেষ করাত দিয়ে মস্কার 'হলা' কাটেন। চিরুনির মত চিকন চিকন যে অংশ থাকে তাকে 'হলা' বা 'শলা' বলে। পরে বাটালি দিয়ে হলার উপর থেকে অমসৃণ অংশ পরিষ্কার করেন। তারপরে বাটালি দিয়ে 'হলা' শেষ মাথায় চোখা করেন। সব শেষে বাটালি দিয়েই মস্কার উপরের অংশে নকশা করেন। কোন শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষা হয় না। বাইশ, বাটালি, কুড়াল আর করাত দিয়ে কাজটি শেষ করেন। কাঁচা কাঠে কাজ করতে হয়। তাছাড়া হবে না। কাঠ রেখে দিলে শুকিয়ে যায় মটকা হয়ে যায় ফলে করা সম্ভব হয় না। মস্কার কাজ চুলের উকুন আনা। উকুন আনার কাজে ব্যবহারে খুব সুফল পাওয়া যায়। তার তৈরি মস্কার সুনাম আছে। সুন্দর করে তৈরি করেন। ইন্ডিয়া "শারফিন মাজারের" মেলায় তার মস্কা যায়। দেশের সব মেলাতে তার মস্কা দ্রব্য বিক্রি হয়। কিন্তু নিজে মেলাতে বিক্রি করে না। বেপারিরা কিনে নিয়ে যায়। ফলে নিজের কাছে তৈরিকৃত কাজ বা মস্কা জমে না। তাই মেলাতে যেতে পারেন না। এছাড়াও চামচ, চামচ্যা, গ্যালারি ইত্যাদি তৈরি করেন। এই এলাকায় সর্ব প্রথম তিনিই গ্যালারি তৈরি করে ছিলেন। এটা তার নিজের উদ্ভাবন। এখন আর করেন না। তার আরেক ভাই এটা তার কাছে শিখে এখনও করছেন। অর্ডারি মস্কা তৈরি করেন বেশি। চাহিদা প্রচুর। ১০০ হিসেবে বিক্রি করেন। ১০০ কত টাকা হবে ? ১৫০০ টাকা বিক্রি করেন। মাঝে মাঝে এর কমেও বিক্রি করতে হয়। পাইকাররা একেকটা ৩০-৪০ টাকা বিক্রি করে। এতে সিজন করার কোন বিষয় নেই। কারণ কাঁচা কাঠেই কাজ করতে হয়। এতে ঘুন পোকামাকড় ধরে না। যতদিন বেচে থাকবে এই কাজ করবেন। এটা করতেও তার আনন্দ লাগে যতক্ষণ করি সুন্দর সময় পার করি।

ছেলে ইংলিশে অনার্স পড়ছে নরসিংদী কলেজে কামরাবো হাইস্কুল থেকে মেয়ে এবার এস.এস.সি পরীক্ষা দিচ্ছে। তারা কাজ করতে পারে। কিন্তু পরে করবে কিনা সন্দেহ। যদি অন্য পেশা গ্রহণ করেন তাহলে এই কাজের সমাপ্তি ঘটবে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ৩৪
তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৬
সময় ঃ ৩.০০
নাম ঃ কৃষ্ণপদ সূত্রধর
বাবার নাম ঃ বীরেন্দ্র সূত্রধর
মাতার নাম ঃ প্রতিমা সূত্রধর
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ নারায়ণপুর, থানা ঃ বেলবো, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৭২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অষ্টম শ্রেণী
মাসিক আয় ঃ ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা
পেশা ঃ সূত্রধর
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

এই কাজ করেছেন। বাবা-দাদা সূত্রধরদের যাবতিয় কাজগুলো করতেন। বাইরে করতেন। নিজের বাড়িতে ফার্নিচার ক্রাফটের কাজ করতেন। বাংলাদেশে আর কোথাও আলনা হয়? টুকটুক সব জায়গাতে সবকিছুই অল্প অল্প তৈরি হয়। তবে বাংলাদেশের মধ্যে আলনা নারায়ণপুরেই শুরু হয়। এখানেই এর জন্ম যা এখনও তৈরি করেন। তিনি বললেন আমার বাব-দাদারা প্রথমে এই অঞ্চলে আলনা করেন। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আলনা যায়। এখন বেশি করেন না। কারণ লাভ কম হয় বলে। "এটা করতে ডিজাইনের বাধা ধরা কোন নিয়ম নাই। যেমন ধরেন স্বর্ণকাররা ডিজাইন করে সেই ডিজাইন সব সময় এক থাকে না। কিন্তু পরিবর্তন হয়। এই জিনিসের অর্থাৎ কাঠের আলনার ডিজাইনও পরিবর্তন হয়। একেকটায় একেক ডিজাইন করি কিন্তু কাঠামোটা প্রায় একই থাকে।" বাজারের চাহিদার উপর ডিজাইন পরিবর্তন হয়। আগের আলনার ডিজাইনে কাঠের রোলার দিয়ে করত। পরে কুন্দানো মেশিন দিয়ে নকশা কুন্দিয়ে সেগুলো সংযোজন করতেন। এখন চলছে ঝার আলনা। আধুনিক ডিজাইনের এই আলনা দেখতে খুব সুন্দর। কয়েক ধরনের ডিজাইনের আলনা তৈরি হয়। গ্রামের মধ্যে তারাই এসব ডিজাইনের আলনা সৃষ্টি করেছেন। আগে একটা ডাসার আলনা হত, ডাবল পার্টও হত। এখনও এসব আলনার চাহিদা আছে। কাঠাল কাঠ দিযে বেশি আলনা তৈরি করেন। অন্য কাঠ দিয়েও হয়। কিন্তু কাঠাল কাঠে আলনা ভাল হয়। সব কিছু তৈরি ঠিক ভাবে শেষ করে শিরিষ পেপার দিয়ে ঘষে স্পিরিট বার্নিশ করেন। কাস্টমার চাইলে অন্য রঙ দেন। একেকটা আলনা সেটা ১৫০০-২০০০ টাকা বিক্রি হয়। ঝাড় আলনা বিক্রি হয়

৭,০০০-৮,০০০ টাকা। মেলাতে তার এসব আলনা তোলেন না। বেপারিরা কিনে নিয়ে যান মেলাতে বিক্রি করার জন্য অন্যান্য ফার্নিচারের সাথে তারা আলনা বিক্রি করেন। তবে বললেন আলনার চাহিদা কম, এখানে সূত্রধর সম্পৃদায় বেশি হওয়ার কারণে কাঠের নানা ধরনের কাজ হচ্ছে। সূত্রধররা এক সময় কাঠের ফার্নিচার সহ নানা ধরণের কাঠের কারুশিল্পের কাজ করতেন। কোন কোন সূত্রধর এক সময় ফার্নিচার নানা ধরণের কাঠের তৈরি পণ্যের দোকান মালিক ছিলেন। এখন মুসলমানরা এইসব ফার্নিচার দোকানের মালিক। সেই সূত্রদররা সেখানেই কর্মচারী হিসেব কাজ করছে। সাম্প্রদায়িক চেতনার কারণে একজন মুসলিম মুসলমানের দোকান থেকে মাল ক্রয় করে থাকেন। এখন হিন্দুদের দোকান থেকে অনেকেই কিনতে চান না। তার এরকম একটি হতাশা কাজ করছে। এই নারায়ণপুরে তাদের মধ্যে ১০টি ফ্যামিলি আলনা তৈরি করে থাকেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন ভবিষ্যতেও এই আলনা থাকবে। কিন্তু চিন্তার বিষয় কাঠ পাওয়া গেলে এগুলো থাকবে বা তৈরি করতে পারবে।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ৩৫
তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৬
সময় ঃ ৫.০০
নাম ঃ প্রদীপ সূত্রধর
বাবার নাম ঃ জতীন্দ্র সূত্রধর
মাতার নাম ঃ মালতি রাণী সূত্রধর
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ নারায়ণপুর, থানা ঃ বেলবো, জেলা ঃ নরসিংদী।
বয়স ঃ ৪৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাই
পারিবারিক আয় (বার্ষিক টাকায়) ঃ মোটামুটি চলে যায়।
পেশা ঃ সূত্রধর
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

আলনাই বানিয়ে আসছে বংশগত ভাবে। সেই ছোট বেলা থেকে আলনা বানানো দেখে আসছি। আমার বাবাও তাই বলত। বাংলাদেশে একটা কথা চালু আছে রায়পুরার চেয়ার, শিমুলকান্দির খাট, শাল্লার আলমারি, নারায়ণপুরের আলনা খুব বিখ্যাত। যুগ যুগ ধরে এই ঐতিহ্য এখনও টিকে আছে। শিমুল কান্দি হলো কিশোরগঞ্জের একটা অঞ্চল। আর বাকিটা নরসিংদী আঞ্চলে অবস্থিত। এখানে আলনা কোথা থেকে বা কারা আনল ? এমন প্রশ্নের উত্তরে পাশে বসা ৮০ বৎসর বয়সের মালতি রাণী সূত্রধর তিনি বললেন আলনার জন্মই এই অঞ্চলে। এখানে আলনা প্রথম দিকে তৈরি হয়, পরে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। রোলারের এবং সেফটি বা ডাসা দুই ধরণের আলনা আগে থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এখনও এরকম আলনাই বেশি চোখে পড়ে অর্থাৎ তৈরি করেন। কাঁঠাল এবং জলপাই কাঠ দিযে বেশি

তৈরি করেন। নিয়মবদ্ধ কোন সিজন করেন না। তবে অনেকটা শুকিয়ে নেন। অনেক আগে কাঠ কিনে রেখে দেন। একদিনে একটা বানানো সম্ভব নয়। একটা আলনা ১০০০-১৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেন। বর্তমানে এর ব্যবহার কম। তাই বিক্রিও কম। গাছের কাঠের মধ্যে খরচ পরে ৫০০ টাকা। তারপর মিস্ত্রী খরচ নিজের শ্রম, আসলে পোশায় না। কি করব বাব-দাদার পেশা তাই না করেও পারি না। অবশ্য অনেকে ছেড়েও দিচ্ছে। তিনি ভবিষ্যতে এই কাজই করবেন। আচ্ছা কয়েক ধরনের আলনা দেখা যায়, এদের কি আলাদা আলাদা নাম আছে ? প্রশ্নের উত্তরে গোল মাথা, কান মাথা, টাওয়ার আলনা, চিটাগাংয়্যা আলনা (হেলানো থাকে) কয়েকটি নাম বললেন। বাজারে 'ঝার' আলনা নামে একটা আলনা আছে। কথাটা শুনেই বললেন " আমরা এ্যাগলা বানাইনা, ওগল্যা অনেকটা নকল করে, অন্যা ডিজাইন দ্যাখ্যা তৈরি করেন। আমরা আমাদের নিজের মত কর্য্যা বানাই।" অর্ডার অনুযায়ী তৈরি করেন। মেলার জন্য জমাতে পারেন না। তাই মেলাতে যাওয়া হয় না। অর্ডারি কাজ করে শেষ করতে পারে না। আসলে এগুলো তৈরি করতে সময় লাগে। রঙ-এর বিষয়টা শুধু কাঠের রঙ প্রধান থাকে। এইজন্য শুধু স্পিরিট বার্নিশ করে থাকেন। এরকম রংয়ের দেখে আসছেন সেই ছোটবেলা থেকে। এটাই ঐতিহ্য।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ৩৬
তারিখ ঃ ০৪/০২/২০১৬
সময় ঃ ১২.০০
নাম ঃ সম্ভু দাস
বাবার নাম ঃ লঙ্কেশসর দাস
মাতার নাম ঃ বিনোদীনি দাস
ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ সহবত পুর, পোস্ট ঃ সহবত পুর, থানা ঃ নাগরপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
বর্তমান ঠিকানা ঃ ১০২ নং শাখারী বাজার, ঢাকা।
বয়স ঃ ৫২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
মাসিক আয় ঃ ২৫,০০০ টাকা
পেশা ঃ বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

তার স্থায়ী ঠিকানা সহবতপুর, টাংগাইলে। কিন্তু কাজ করেন ঢাকাতে। ১০২ নং শাখারী বাজার, ঢাকা। বসবাসও করেন এখানে। আগে কাজ করতেন অন্য জায়গায় কর্মচারী হিসাবে। এই বছর খানিক হলো নিজেই দোকান ভারা নিয়ে কাজ করেন। মাসিক আয় খারাপ না ভালভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে। তিনি মনে করেন একাজের শুরু এবং সূচনা এই বাংলাদেশেই। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী একেকটার শেপ একেক রকম হয়। কিন্তু মূল বিষয়টা একই থাকবে। তাছাড়া সুরের শব্দ ভালো হবে না। তবলার সাইজ প্রায় ৩

রকমের হয়। রঙটাও ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী করা হয়। কোনটা কালো, কোনটা কাঠ কালার, কোনটা মেহগনি কালার। অঞ্চলভেদে এর নকশার তেমন পার্থক্য নেই। যারা ঢাকার সাথে যোগাযোগ রেখে এগুলো তৈরী করেন তাদের ডিজাইন প্রায় একই রকম। রংপুরে এবং দিনাজপুরের নকশা খানিকটা পার্থক্য করা যায়, তবু তা ১৯ অথবা ২০ এর মত। সারা বাংলাদেশের ভিতরে মানিকগঞ্জে ১৪ আনা বাদ্যযন্ত্রের কাঠের অংশটুকু তৈরী করেন। ছাউনিটা অন্যরা বেশি করেন। অর্থাৎ মানিকগঞ্জের বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারকদের কাছে থেকে কাঠের অংশটা কিনে নিয়ে আছে। তারা শুধু চামড়ার কাজটা সুচারু রূপে করেন। তিনি বললেন এ কাজটাই তারা ভাল করেন। এছাড়া মেরামতের কাজটা করে থাকেন।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ৩৭
তারিখ ঃ ০৮/০২/২০১৬
সময় ঃ ১২.০০
নাম ঃ অভিনয় সরকার
বাবার নাম ঃ মৃত সতিশচন্দ্র সরকার
মাতার নাম ঃ ইন্দ্রবালা সরকার
ঠিকানা ঃ শিল্প নিকেতন ৭৭, শাখারী বাজার, ঢাকা।
বয়স ঃ ৪৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এইস.এস.সি
মাসিক আয় ঃ ২৫,০০০ টাকা
পেশা ঃ হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

তার বাবা কেরানীগঞ্জের অধিবাসী। এটাই তার পৈতৃক নিবাস। যতিন কোং তে কাজ শিখেছে। শিখতে ৩/৪ বছর সময় লাগে। তারপরে চাকরি করেন আরও কিছুদিন। পরে ওখান থেকে এসে নিজেই দোকান দেন। তখন থেকে এই ব্যবসার শুরু হয়েছে। অভিনয় সরকার ৩৫ বছর আগে তিনি ব্যবসার সাথে জড়িত হন। কাজে এসে হারমোনিয়াম বাজানো শিখেছিলেন। অভিনয় সরকার বলেন ইনকাম কম হলেও সামাজিক মর্যদার দিকে কমতি নেই। ফরাসগঞ্জ থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন। কাঠের দামও বেশি। বার্মা সেগুন, চিটাগং সেগুন, টেকসই এর জন্য সেগুন কাঠ ব্যবহার করেন। সাথে কেরোসিন কাঠ লাগে। ২ জন কারিগর কাজ করেন। দুজনেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষই বেশি কাজ করেন। তিনি জানালেন হারমোনিয়াম যারা তৈরি করেন তারা হলেন নমশুদ্র সম্প্রদায়ভূক্ত। কাজের সন্ধানে এসে এই কাজ করা। একজনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এই কাজে আসা। পাশে বসা দুই জন কারিগরের মধ্যে একজন বিনোদ বিশ্বাস বললেন এভাবে।

হারমোনিয়াম দুই সাইজের হয়

১. ৩৭ গার্ড বা ৩ অবটিভ (ছোটটা ১৪" পাশ x ২৩" দৈর্ঘ্য)

২. ৪২ গার্ড বা ৩ ½ অবটিভ (বড়টা ১৪" পাশ x ২৫" দৈর্ঘ্য)

উপরের ঢাকনার নকশা একই রকম হয় না, আলাদা আলাদা নকশা হয়। অভিনয় সরকার কথা বলতে বলতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে ক্রেতাকে দেখিয়ে দিলেন। তাতে বোঝা গেল হারমোনিয়াম বানাতে গেলে বা ব্যবসা করতে গেলে একটু আধটু বাজাতে জানতে হয়। দোকানে অনেক ভিড়। এটা নিয়ে তেমন কোন স্বপ্ন নেই। ভবিষ্যতে এটা করতে চায় কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই পেশায় আনতে চান না। মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ায় গানের প্রতি মনোযোগ একটু কম এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরাই মূলত গান শেখেন। সেখানে গান শিখতে এত বেশি টাকা লাগে। হারমোনিয়াম কিনে শেখার খরচ যোগাতে কঠিন বলে এর ভাটা দেখা দিয়েছে। এটা একটা চিন্তারও বিষয়। ১টি হারমোনিয়ামের মূল্য সর্বনিম্ন ৭,০০০ টাকা সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা। মাসে ৪-৬ টা হারমোনিয়াম বানাতে পারে প্রতিটি হারমোনিয়ামের উপর কারিগরদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়।

সাক্ষাৎকার নং ঃ ৩৮
তারিখ ঃ ০৮/০২/২০১৬
সময় ঃ ৫.০০
নাম ঃ সুনিল কুমার মন্ডল
বাবার নাম ঃ যতীন্দ্র মোহন মন্ডল
মাতার নাম ঃ রাইমালা মন্ডল
ঠিকানা ঃ ১৪, শাখারী বাজার, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ বাঘৈর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
বয়স ঃ ৭১ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি.কম
মাসিক আয় ঃ ৬০,০০০ টাকা
পেশা ঃ দেশীয় বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক
ধর্ম ঃ হিন্দু
বিবাহিত/অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

প্রথম দিকে চরে বাড়ি ছিল। পরে নদীর ভাঙ্গনে চর ভাঙ্গার পরে বাঘৈর গ্রামে চলে আসে। সুনিল কুমার মন্ডলের বাবা যতীন্দ্রনমোহন মন্ডল জীবন অনেক সংগ্রাম করেছেন। তার বাবা ছোট থেকেই গানের প্রতি দূর্বল ছিলেন। ভালো গান বাজনা জানতেন তার চেয়ে বড় কথা গানের সমজদার হিসেবে সুনাম ছিল। বিভিন্ন জমিদার মহলে থেকে যতীন্দ্রমোহনকে নিমন্ত্রণ করত। ১৯০০ সালের আগের ঘটনা আমপট্টিতে দাস সম্প্রদায়ের একজন হারমোনিয়ামের মত বাদ্যযন্ত্র বানাতেন। সেখান থেকে দেখে বা কানে মিষ্টি সুর বাজার কারণে তার ভালো লেগে যায়। তবে দেখার সুযোগ না থাকার এই বাদ্যযন্ত্র বানাতে তার অনেক

কষ্ট বা বেগ পেতে হয়েছে। কারণটা প্রতিটা ব্যবসার একটা ধরণ থাকে, যেহেতু এটা তৈরি করার বিষয় তাই সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া কাউকে তৈরি করা দেখতে দেয় না। বাবা শুধু কানে সুর শুনেই এটা বানানোর চেষ্টা করেন এবং সফল হন। তিনি একটা হারমোনিয়াম তৈরি করেন। পরে সেটা তিনি বিক্রি করেন। পরে আরো দু' একটা তৈরি করে বিক্রি করেন তা থেকেই ব্যবসার চিন্তা হয়। প্রথম দিকে গ্রামের বাড়িতে তৈরি করতেন। তারপর অশোক জমাদার লেনে দোকান ছিল এখন আওলাদ হোসেন লেন নামকরণ করা হয়েছে। অশোক জমাদার লেনে বাড়ি দোকান একসাথে ছিল। ঐ যে ব্যবসা শুরু হলো আর থামাথামি নেই চলছে। কবি মুকুন্দ দাস হারমোনিয়ামে সন্তুষ্ট হয়ে গোল্ড মেডেল দেন। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সাথে ঘনিষ্ট ছিলেন। ড. কাজী মোতাহের হোসেন চৌধুরী বাবার সাথে বন্ধুত্ব ছিলেন। গুনীজনদের সাথে অনেক সখ্যতা ছিল। রূপলাল মহলে যেতেন। নবাব বাড়ীর সাথে ঘনিষ্টতা ছিল। বিভিন্ন জমিদারদের সাথে বন্ধুত্ব ছিল এবং বিভিন্ন দরবার বা মহলে যাওয়া আসা ছিল। বেদেশী ভায়োলেন এনে বিক্রি করতেন। এটা এক সময় দেশীয় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে চলেছে। তার বাবা ১৯৭০ সালে মারা যান। সুনিল কুমার মন্ডলের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাবার নামটা টিকিয়ে রাখা। ব্রিটিশ আমলে যতিন এন্ড কোং এর ১৭ টা এজেন্সি আসামে ছিল। বার্মা ও শ্রীলঙ্কায় হারমোনিয়াম রপ্তানি করেছেন। হারমোনিয়াম তৈরি করতে সেগুন, গামারি, পোয়া কাঠ প্রয়োজন হয়। এখন ভাল পোয়া কাঠ পাওয়া যায় না। কেরোসিন বা পাইন কাঠ অবশ্যই লাগে। ১৯৫০ সালে রায়ট হয়, তখনও দেশ ছেড়ে চলে যায় নাই। সুরশ্রীর মালিক এখানেই কাজ শিখেছেন। এমনি কত মানুষ এখান থেকে কাজ শিখেছেন। তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন তারা অনেক টাকার মালিক, খ্যাতিও আছে তাদের। হারমোনিয়াম তৈরির ফলে বাংলাদেশে গান বাজনার প্রসার ঘটেছে। তিনি বলেন গান হলো শান্তির জিনিস। আর এ দেশের যে সুর তা হারমোনিয়াম ছাড়া করা সম্ভব না। তার বাবা এই "যতিন এ্যান্ড কোং" ১৯০০ সালে শুরু করেন, ১৯১০ সালে রেজিস্ট্রেশন করেন। সে অনুযায়ী এই কোম্পানির বয়স ১০৬ বছরের বেশি, ১৯৫০ সালে বুলবুল লোলিত কলা একাডেমি শুরু হয় ঐ একাডেমীর প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক আসেন। সেখানে গান গাওয়া জন্য সব বাদ্যযন্ত্র তার বাবার কোং থেকে নেন। যন্ত্রের সুরে সবাই তার প্রশংসা করেন। তার বাবা ১৯২২ সালে কলের গান জার্মান থেকে আনেন। শুধু কলের গানের মেশিন এনে পরে এখানে অ্যাসেম্বল করা হত বা সংযোজন করা হত। যতীন গ্রামো ফোন নামে সেগুলো (কলের গান) বিক্রি হত। কলের গানের নিচে বাক্সের অংশটা সেগুন কাঠ দিয়ে বানাতে হতো। এটা তার বাবার ধারণায় তৈরি করা হতো। এটাকে রঙ পলিশ করে সুন্দর করা হত। হারমোনিয়ামে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী রঙ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. নীহাররঞ্জন রায়, ev0vjxi BwZnvm Aw‘ce, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২০ বাংলা, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬. বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিপণন

কারুশিল্পীদের কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিপণন ব্যবস্থার সুনির্দিষ্টতা নেই। প্রাচীন বিপণন ব্যবস্থার সাথে আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট। অর্থনীতির সেই আদি অবস্থায় কোন মুদ্রা নয় বরং এক জিনিসের সাথে অন্য জিনিসের সরাসরি বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সেই ব্যবস্থায়ও কিছু ব্যতিক্রম ছিল। যেমন– সমাজের কিছু কিছু উচ্চতর শ্রেণী ছিল যারা বাস্তবিকভাবে কোন উৎপাদনশীলতার সাথে জড়িত ছিল না। অর্থাৎ আজকের সামাজিক বৈষম্য প্রাচীনকালেও বিদ্যমান ছিল। যেহেতু বিভিন্ন বৃত্তিনির্ভর শ্রেণী উচ্চশ্রেণীর বিচারে ছোট করে দেখা হত, সেজন্যই তাদের সামাজিক সুবিধাদিও ছিল সীমিত আকারে। নির্ধারিত বাজার সৃষ্টি না হওয়ায় কাঠের তৈরি কারুশিল্প সামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কারুশিল্পীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের দেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিপণনের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিক্রির বাজার তৈরি না হওয়ার পেছনে এর চাহিদার ক্রমাবনতি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত। উল্লেখ্য, কাঠের কারুশিল্পের চাহিদা আশানুরূপ নয়। এমন পরিস্থিতিতেও চেয়ার, টেবিল, খাট, সোফা ইত্যাদির বাজার চাহিদা এখনও আছে। কারুশিল্পের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিপণনের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

আজকে যা বিশ্বে অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনা, নিয়ম-পদ্ধতি, কলা-কৌশলের উদ্ভাবন ঘটছে এবং যথারীতি আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সেগুলোর প্রয়োগেও হচ্ছে। আমাদের গ্রামীণ কারুশিল্পীরা টাকা-পয়সা লেনদেনের পাশাপাশি প্রাচীন বিনিময় প্রথাকে একবারে ত্যাগ করেনি। যার কিছু বাস্তবতা লক্ষ করা যায়। কারুশিল্পের অনেক কারিগর আছে তারা তাদের পসরা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে আর তাদের বিক্রি জিনিসের বিনিময়ে টাকা-পয়সা না নিয়ে ধান অথবা চাল নেয়। ধান-চালের পরিমাণ সের হিসেবে অথবা তাদের কোন পাত্র দিয়ে মেপে নির্ধারণ করে। এ পদ্ধতির পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, নাকি বংশানুক্রমিক বৃত্তির মতোই বিপণন পদ্ধতিও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে তাও একটি গবেষণার বিষয়।

গ্রাম-বাংলায় কোন না কোন ভাবে দ্রব্যে-দ্রব্যে বিনিময়, শ্রম-দ্রব্যে বিনিময় ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কৃষকদের, লাঙ্গল, জোয়াল, মই, কাঠের সেচযন্ত্র ইত্যাদি কাঠের কৃষি সামগ্রী সারা বছর ধরে সূত্রধর শ্রেণী তৈরি করে কৃষকদেরকে সরবরাহ করেন। উপর্যুক্ত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের কাজের জন্য তাদের অগ্রহায়ন এবং বৈশাখ মাসে কৃষক ফসলের মাধ্যমে মজুরী প্রদান করে থাকেন। এখানে একটি বিষয়

স্পষ্ট, কৃষি উপাদান তৈরি করে দেয়ার পর সূত্রধর কৃষকের কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পান না। এ পারিশ্রমিক পেতে গরীব অভাবগ্রস্থ সূত্রধরকে অপেক্ষা করতে হয় অনাগত ফসলের জন্যে। বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে এ বিনিময় ব্যবস্থাটি এক সময় বহুল প্রচলিত ছিল।

বিপণন ব্যবস্থায় শহর এবং গ্রাম ভিন্নতর কৌশলের দাবি রাখে। শহরকেন্দ্রিক কারুশিল্পীরা সারা বছরই কিছু না কিছু বিক্রির সুযোগ পেয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে গ্রামীণ কারুশিল্পীরা গ্রামের হাট বাজারে খুব সামান্য পরিমাণেই জিনিস বিক্রি করে থাকেন। বরং তাদের তৈরি পণ্যের একটা অংশ পাইকারীভাবে বিক্রি করেন। আর একটা অংশ সঞ্চিত করে রাখেন পালা পার্বণ বা মেলা অনুষ্ঠানের জন্য।

কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা সপ্তাহের দু'দিন স্থানীয় হাটে তাদের তৈরি কারুপন্য বিক্রি করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাটে তাদের নির্দিষ্ট স্থায়ী দোকান থাকে না। হাটের ইজারদার কর্তৃক নির্দিষ্ট খোলা স্থানে তারা পসরা সাজিয়ে বসেন। এতে স্থানিক পর্যায়ে কারুপন্য বিক্রি আশানুরূপ হয় না।

গ্রামাঞ্চলের কারুশিল্পীরা এখনও পর্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে বিভিন্ন পার্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলার জন্য। শুধু কারুশিল্প কেন, বলতে গেলে কৃষি প্রধান গ্রামগুলোর সহজ-সরল, একঘেঁয়েমি, ঘাত-প্রতিঘাতহীন জীবনে বিভিন্ন মেলা ক্ষণিকের জন্য হলেও নিয়ে আসে এক ঝলক মুক্তির পরশ। ছেলে-বুড়ো, শিশু-কিশোর সব বয়সের, সব মানুষই মেলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। হয়ত একজন থেকে অন্যজনের এর প্রেক্ষিত থাকে ভিন্নতর। শিশু-কিশোর অপেক্ষা করে বিচিত্র সব খেলনা কারুশিল্প, বাঁশি আর রকমারী মিষ্টান্নের আস্বাদ পেতে, কাঠের তৈরি নানান কারুশিল্প যেমন গৃহিনী অপেক্ষা করে, হাতা, খুন্তি, পিঁড়ি-বেলনা, ছোট বড় বাক্স, চামচ জাতীয় নানা গার্হস্থ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য।

একটি বিষয় স্বীকার্য, কাঠের কারুশিল্প প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে কারুশিল্পীরা যেমন অধিক হারে কারুপন্য তৈরি করেন, অন্য দিকে এগুলো বিক্রি করে আর্থিক সুবিধা অর্জন করেন। বাংলাদেশে পূজা, পার্বণ, পৌষসংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, জন্মাষ্টমী, বারণী, রথযাত্রা, চড়ক পূজা, সাধক পুরুষদের আবির্ভাব তাদের তিরোধান দিবস কেন্দ্রিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ সনে প্রকাশিত evsjv‡`‡ki †gjv বইতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত মেলার স্থান, সময়, উপলক্ষে সম্যক পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বছরে ঢাকা বিভাগে ৬২০টি, রাজশাহী বিভাগে ৪৯৫টি, চট্রগ্রাম বিভাগে ২৫৩টি, খুলনা বিভাগে ২৩৭টি, সিলেট

বিভাগে ৯৫টি, বরিশাল বিভাগে ৯৫টি মেলা অনুষ্ঠানের পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে।[১] গ্রাম ও শহরে সর্বত্রই এসব মেলা অনুষ্ঠিত হয়, মেলাকে কেন্দ্র করে কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা কাঠের কারুশিল্প তৈরি করে নির্ধারিত সময় মেলায় অংশ গ্রহণ করেন। স্থান ছাড়াও সময়ের ভিত্তিতে যেমন বাংলা মাসের তারিখ অনুযায়ী মেলার সংখ্যা ১৫১৪টি, ইংরেজি মাসের তারিখ অনুযায়ী মেলার সংখ্যা ২৬৬টি এবং আরবি মাসের তারিখ অনুযায়ী মেলার সংখ্যা ১৫টি। সর্বমোট মেলার সংখ্যা ১৭৯৫টি উল্লেখ রয়েছে। যা ৬টি বিভাগের জেলাওয়ারী মেলার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।[২]

কাল অনুপাতে সবচেয়ে বেশি মেলা হয় চৈত্রের পরে বৈশাখ মাসে। চৈত্র মাসের মেলা প্রধানত চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এবং বৈশাখ মাসের মেলা প্রধানত বর্ষবরণ বা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এসব ছাড়াও হিন্দু বা মুসলমান বিভিন্ন সাধক পুরুষদের আবির্ভাব এবং তিরোধান উপলক্ষেও অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও হিন্দুদের প্রধান উৎসব দূর্গাপূজা এবং মুসলমানদের দুটি ঈদ ও মহররমেও অনেক জায়গায় জমজমাট মেলা বসে। ২০১৪-২০১৫ সালে বিসিক কর্তৃক 'বাংলাদেশের মেলা' নামক ডাইরেক্টরীতে উল্লেখ আছে দেশেরে মেলার সংখ্যা মোট ১৭৯৫টি।[৩]

কারণ মেলায় তুলনামূলকভাবে জিনিসের দাম একটু বেশি পাওয়া যায়। পাশাপাশি বিক্রির পরিমাণও বেশি হয়। "একেবারে, প্রাচীনকালে মেলা বা ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানাদির তেমন কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে সম্পূর্ণ গ্রাম সমবায় ব্যবস্থার পতন এবং সামন্তরাজদের উত্থানপর্ব থেকে পালা পার্বণ বা মেলার ক্রমশ প্রসার শুরু হয়, এ ব্যাপারটা প্রায় নিশ্চিত। হিন্দু ধর্মের পূজা পার্বণের আনুষ্ঠানিকতা এই সামন্তরাজদেরই দান। সামন্তব্যবস্থায় অর্থনীতি এক কেন্দ্রিক হলেও উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক এবং উচ্চমার্গীয় উভয় শিল্পকলাই এসব ছোট-খাট সামন্তরাজদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করে।[৪] এদিক থেকে বলা যায় স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সমবায় ব্যবস্থার চেয়ে সমান্ত ব্যবস্থায় কারুশিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতার মুখ দেখে। এক্ষেত্রে শিল্পীকে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে সংশ্লিষ্ট পেশার দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারটা অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। সন্দেহ নেই এই প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ হয়তবা পিছিয়ে পড়ছে। সার্বিকভাবে এই অবস্থা আজকের মতো হতাশাব্যঞ্জক ছিল না। বর্তমানে কাঠের কারুশিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা যে সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌছেছে এর পেছনে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব অন্য যে কোন প্রতিকূলতার চাইতে অধিকতর প্রকট। তবে এক থেকে একাধিক দিন, সপ্তাহ, এমন কি মাস ব্যাপী মেলারও আয়োজন হয়ে থাকে। বেশি দিন ব্যাপী মেলাতে কাঠের কারুশিল্পীরা বেশি করে কারুপণ্য বিক্রি করতে পারেন। মেলার সুবাদে কারুশিল্পী, পাইকার ও ফেরিওয়ালাদের সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র ধরণের মানুষের পরিচয় হয়। এর সূত্র ধরে

মেলাস্থলে বসেই কিছু সৌখিন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কারুশিল্পীদের কাছে তাদের মনমত কারুপণ্যের অর্ডার দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কারুশিল্পীদেরকে অগ্রিম বায়নাও প্রদান করে থাকেন। এভাবে মেলার পরেও বাড়ীতে বসে কারুশিল্পীরা অর্ডার মত বছর ব্যাপী কাঠের কারুশিল্প তৈরি করে থাকেন। মেলা থেকে কাঠের তৈরি কারুশিল্প কেনার প্রধান গ্রাহক মহিলারা। পুরুষেরাও কেনেন। কাঠের বিচিত্র খোদিত কারুপণ্য সঙ্গত কারণেই সবাইকে আকৃষ্ট করে। কাঠের তৈরি কারুশিল্প পছন্দের ব্যাপারে মহিলাদের আকর্ষণ ভিন্নতর। মহিলারা ঘর সাজানোর প্রয়োজনে মেলা থেকে এ শিল্প সংগ্রহ করে থাকেন। শুধু গ্রামের মহিলাদের ক্ষেত্রেই নয়, মেলা থেকে শহরের মহিলারাও ঘর সাজানো ও ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য বাঙ্গালী ঐতিহ্য সমৃদ্ধ কাঠের তৈরি কারুশিল্প সংগ্রহ করে থাকেন।

দারুশিল্পীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাইকারি ভাবে তাদের তৈরি কাঠের কারুপণ্য ফেরিওয়ালাদের কাছে বিক্রয় করেন। ফেরিওয়ালারা এসব কারুপণ্য নগদ মূল্যে কারুশিল্পীদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন। আবার কখনো বাকীতে সংগ্রহ করেন। এপর্যায়ে দাম নির্ধারণ করে ফেরিওয়ালারা কারুপণ্যাদি বিক্রয় করে কারুশিল্পীদের পাওনা মেটান। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের প্রধান বিপণন মেলা ভিত্তিক হলেও কোন কোন শহরে নিয়মিত কিছু কারুশিল্প বিক্রি হয়। এসব পণ্য বিক্রির কোন স্থায়ী দোকান নেই। কোন মাঠের ধারে কিংবা রাস্তার ধারে কারু সামগ্রী নিয়ে অধিকাংশ সময় শিল্পী নিজেই বসে। এ ক্ষেত্রে ফেরিওয়ালা ও পাইকারদের সাথে শিল্পীদের পূর্ব পরিচিতি থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাইকারী ভাবে পণ্য কিনে ফেরিওয়ালারা ডালায় করে ঢাকায় নিউমার্কেট, গাউসিয়া মার্কেট, হাইকোর্ট মাজারের সম্মুখ, গুলশান মার্কেট, ফার্মগেট, শিশুপার্ক, শিশু একাডেমী, ধানমন্ডি খেলার মাঠ সংলগ্নস্থান, সংসদ ভবনের সামনে, খিলগাঁ তালতলা মার্কেটের ফুটপাত, ইত্যাদি স্থানে অল্প লাভ করে এসব কাঠের কারুপণ্য বিক্রয় করেন।

আড়ং, গ্রামীণ, কারিকা, গ্রামীণ উদ্যোগ, গ্রামীণ বাজার, প্রভৃতি আধুনিক বিপণন কেন্দ্র সমূহে কাঠের তৈরি কারুশিল্প উচ্চ দামে বিক্রি হয়। ফলে আধুনিক এসব প্রতিষ্ঠানের মাধমে কাঠের কারুশিল্প বিক্রি করা কারুশিল্পীদের জন্যে অধিক লাভজনক। কিন্তু এ সব প্রতিষ্ঠানের জন্য শিল্পীদের উন্নতমানের কারুশিল্প তৈরি করতে হয়। আধুনিক বিপণন প্রতিষ্ঠানগুলোতে চড়া দামে কাঠের কারুশিল্প বিক্রি হলেও এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অর্ডার মাফিক পণ্য সরবরাহ করা কারুশিল্পীদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ধরা যাক, কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একজন কারুশিল্পীর ১০০ কাঠের কার্ডহোল্ডার সরবরারে চুক্তি হলো। প্রতিষ্ঠান চাইবে প্রতিটি কার্ড হোল্ডারের মাপ, গড়ন, রং অভিন্ন হোক। কিন্তু কাঠের কারুশিল্প যেহেতু ছাঁচে তৈরি হয় না, একক ভাবে এক একটি কার্ড হোল্ডার তৈরি করতে হয়, তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটির সঙ্গে অন্যটির কোন না কোন দিক দিয়ে অমিল থাকবেই। উপর্যুক্ত আধুনিক বিপণন কেন্দ্র থেকে এই কিঞ্চিৎ অমিল কার্ড

হোল্ডার গুলোকে বাতিল করা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ১০০ লটের মধ্যে ৭/৮টি কার্ড হোল্ডার অমিল দেখা দিলে সম্পূর্ণ লটটি বাতিল করা হয়। এ ব্যবস্থার ফলে কারুশিল্পীরা ক্ষতির সম্মুখীন হন। এছাড়াও রয়েছে সময়ের প্রসঙ্গ। উপর্যুক্ত বিপণন কেন্দ্রগুলো কারুপণ্য সরবরাহের জন্য কারুশিল্পীদের একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেন, যা নিতান্তই অল্প। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ শিল্পীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পণ্য আধুনিক পদ্ধতিতে মনোরম প্যাকেট করে সরবরাহ করতে হয়। কারুশিল্পীরা তা না পেরে মান্ধাতা যুগের পদ্ধতিতে প্যাকেট করে পণ্য সরবরাহ করেন। ঢাকার আধুনিক বিপণন কেন্দ্রগুলো, প্রতিটি বিভাগীয় শহরে তাদের শাখা কেন্দ্র, তাছাড়া কোন কোন জেলা শহরের এই ধরনের কারুশিল্প বিপণন কেন্দ্রগুলো স্থানীয় কারুশিল্পীদের কাছ থেকে চুক্তির মাধ্যমে কারুপণ্য করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো চাহিদা মত চমকপ্রদ কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানী করে, ফলে আধুনিক বিপণন কেন্দ্রে কাঠের তৈরি সুন্দর কারুশিল্প সরবরাহ করলে কারুশিল্পীরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থার বেড়াজালে তারা এ পদ্ধতিকে নিরংকুশ ভাবে গ্রহণ করতে অনেক সময় ব্যার্থ হন।

অন্যান্য দেশে কারুশিল্পের ঐতিহ্যিক পণ্যকে বিশ্ববাজারের উপযোগী করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পুনর্বিন্যস্ত করেছে। ফলে সেসব দেশে কারুশিল্প যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে তেমনি জাতীয় ঐহিত্য, গৌরব ও মর্যাদার প্রতীকও বটে। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে এসব দেশের গৃহীত পদক্ষেপ ও সাফল্যের অভিজ্ঞতা কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সার্থকতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐতিহ্যের কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে জার্মান কারুশিল্প বিশেষজ্ঞের মতামত উল্লেখের দাবী রাখে। "In the course of thousand years the exponents of fine craftsmanship in Germany have continually adapted themselves to economic, technological and social change without abandoning the essential ingredients of their tradition : artistic conception and masterly execution of works of craftsmanship."

"The craftsmen were not content merely to perpetuate traditional folk art or to copy exemplary products of bygone ages. They continued to assess critically what had been handed down to them and to set their own creative stamp on it."[৫]

এখানে উল্লিখিত দেশসমূহের সাফল্যের অভিজ্ঞতা গত তিন দশকে এশিয়া ইউরোপের আরো বহুদেশকে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে আমেরিকা, থাইল্যান্ড, ভারত, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া অনুরূপভাবে কারুশিল্পের চাহিদাকে বিশ্ববাজারে প্রসারিত করতে রূপান্তরের মাধ্যমে কারুশিল্পের

পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। লোক ও কারুশিল্পের সনাতন , ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষক গ্রামীণ লোক সমাজ তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে বিজ্ঞান, আধুনিকতা, প্রযুক্তির কল্যাণে স্বাদেশিকতার সংকীর্ণতামুক্ত বিশ্বায়নের ফলে মানুষের চাহিদাকেন্দ্রিক বিশ্ববাজার যুক্ত হয়েছে।

ঐতিহ্যের কারুশিল্পের ধারা ও কৌশল আধুনিক শিল্প পণ্য উৎপাদনের ভিত্তি। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইনের ভিত্তিই হচ্ছে ঐতিহ্যের লোক ও কারুশিল্পের। একথা বললে কোন অতুক্তি হবে না যে, "আধুনিক শিল্প ২৩ পণ্যের পূর্বধারা হচ্ছে লোক কারুশিল্প।"[৬] ঐতিহ্যের স্থানটি ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর আধুনিক শিল্প উৎপাদন-পণ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে থাকে।

বাংলাদেশের কারুশিল্পও এদেশের প্রকৃতি পরিবেশ ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। সংস্কৃতির গতিময়তা, চলমান গতিধারার মত এদেশের কারুশিল্প। কারুশিল্প সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় লোকমনের চাহিদা, রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। আধুনিক বিশ্ববাজারের চাহিদার নিরীখে সময়, কালের ব্যবধানে ক্রমাগত সূক্ষ্ম রূপান্তর প্রক্রিয়ায়, চলমান, সক্রিয় থাকার জন্য প্রাণপণ লড়ছে। বিচিত্র ধারায় সার্বক্ষণিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়ে চলেছে। কারুশিল্প সংগ্রহ ও সংরক্ষনের জন্য প্রতিষ্ঠিত লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরে মূল্যবান নিদর্শনাদি সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে বেশি সংখ্যক কারুশিল্প সামগ্রী দর্শকদের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কারুশিল্পের নিদর্শন তৈরি করছে এবং উৎপাদিত লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন ফাউন্ডেশনের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ফাউন্ডেশনে আগত দর্শকদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন কারুশিল্পীদের কাছ থেকে কাঠের তৈরি কারুশিল্প সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রির জন্য ক্রয় করা হয়।

আধুনিক জীবনায়নে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের একটা নির্দিষ্ট অবস্থান থাকলেও বিদেশী এবং কলকারখানাজাত পণ্যের চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারত, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আধুনিকতার স্পর্শে জীবনযাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে প্লাষ্টিক, সিরামিক, কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমে যে ভাবে কারুপণ্য তৈরি হয়ে আমাদের দেশের প্রতিটি বাজারে এসেছে, সেভাবে আমাদের দেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের আধুনিকতার আরোপ সম্ভব নয়। তাই আমাদের দেশের আধুনিক নাগরিকদের কাছে এবং আন্তর্জাতিক বিপণন ব্যবস্থায় কাঠের তৈরি কারুশিল্পের প্রকৃত ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না।

বাংলাদেশের কারুশিল্পে সময়ের ব্যবধানে, আধুনিক প্রযুক্তির আবির্ভাব ও সূত্রপাত্রের ফলে, নগরায়ণের প্রভাবে আর একটি অপ্রধান ধারার কারুশিল্পের উৎপাদন শুরু হয়েছে। বাণিজ্যিক প্রসারও লাভ করছে

নগরে। এই কারুশিল্পকে আধুনিক কারুশিল্প, বানিজ্যিক কারুশিল্প, পর্যটন কেন্দ্রিক কারুশিল্প বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই আধুনিক কারুশিল্পের উৎপাদনের সামান্য অংশ বাদ দিয়ে বিরাট অংশের সঙ্গে সংস্কৃতি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের, তার প্রকৃতি, পরিবেশ ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অতি সামান্য সম্পৃক্ততা খুজে পাওয়া যায়। কখনো খন্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম। আধুনিক কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত কারুশিল্প যেমন বাণিজ্যের জন্য, রপ্তানির জন্য উৎপাদন করা হয়। তেমনি ভাবে বাংলাদেশের কারুশিল্পও বাণিজ্য, আভ্যন্তরীন চাহিদা মেটানো ও রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে। বাংলাদেশে মোট কারুশিল্পের উৎপাদনের সামান্য অংশই আধুনিক কারুশিল্পের আওতায় পড়ে। কারুশিল্পের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির ও উৎসাহের ফলে কারুশিল্প কিছুটা পুনরুজ্জীবন লাভ করছে যেমন হয়েছে আমাদের জামদানী সহ অন্যান্য শাড়ী, কাঠের ও মাটির এবং বাঁশ বেতের কারুশিল্প। রপ্তানি যোগ্য কারুশিল্পের অধিকাংশই বাংলাদেশের লোক কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত। এসব কারুশিল্প আমাদের ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। উৎপাদনের কৌশলে, মান নিয়ন্ত্রণে, গ্রামীণ নকশা, মোটিফ ব্যবহারে দক্ষতার ছাপ উল্লেখের দাবি রাখে। তদুপরি উল্লিখিত লোক কারুশিল্পের মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের ফলে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিক যন্ত্রজীবনের ও মেশিনে উৎপাদিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দীতায় টিকে আছে। এ দেশের কারুশিল্পের অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য অংশ আধুনিক কারুশিল্প। এই আধুনিক কারুশিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের সম্পর্ক ক্ষীণ। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক কারুশিল্প বাণিজ্যিক ভাবে সফল হচ্ছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও নগরায়ণ আধুনিক জীবন ধারা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারায় পরিবর্তন এসেছে। ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ লোক সমাজের পরিধি ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফলে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। কাঁচামালের দুস্প্রাপতা ও অধিক মূল্য কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উৎপাদন হ্রাসকে তরান্বিত করছে। এছাড়াও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নানা সমস্যা। কারণ এই শিল্প একটি সামাজিক শিল্প। গ্রামীণ সামাজিক শিল্প। আর সেই গ্রামীণ সমাজে, নগরায়ণ ও আধুনিক জীবনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে এই অবস্থার সূত্র পাত হচ্ছে। ফলে গ্রামের লোক সমাজ, কারিগর সমাজের বেহাল অবস্থা সংকুচিত, দুর্বল হয়ে পড়েছে। এতে ঐতিহ্যের কাঠের তৈরি কারুশিল্প সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক পৃষ্ঠাপোষকাতার ক্রমাগত অবনতি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। শহরের নগরের নাগরিক জীবনের আধুনিক সুবিধা বৃদ্ধি ঘটেছে। গ্রামীণ লোকজ উৎসব, অনুষ্ঠান সমূহকে গুরুত্ব না দিয়ে অসারে পরিণত করেছে। লোক ও কারুশিল্পের বেচাকেনার স্বাভাবিক

ক্ষেত্র গ্রামীণ মেলায় প্লাষ্টিকের, শিশুতোষ দ্রব্যাদির ভীড়ে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উৎপাদন হ্রাস ও হারিয়ে যেতে বসেছে। শ্রীহীন হয়ে পড়ছে এই শিল্পের শিল্পী ও কারিগর নানা সমস্যায় জর্জরিত অবহেলিত হয়ে তার বংশের পরবর্তী প্রজন্মকে ধীরে ধীরে অন্য পেশার মাধ্যমে অন্য জীবনে সরিয়ে নিচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দেশ। দেশের সংস্কৃতি কারুশিল্পের মত সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এতদসত্ত্বেও গ্রামীণ ধারার এই শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে নানা প্রতিকূলতার মাঝে। এদিকে ঐতিহ্যের এই শিল্পের পাশাপাশি যে আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্প তৈরি হচ্ছে, তার বেশিরভাগ অংশের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের সম্পর্ক খন্ডিত ও কৃত্রিম কোন কোন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এই অবিন্যস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বহু নকশা, গড়ন, মোটিফ আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে বসেছে। অন্যদিকে আধুনিক কারুশিল্পের বিদেশী গড়ণ, নকশা ও মোটিফের যান্ত্রিক ও মিশ্র ব্যবহার প্রাধান্য পাচ্ছে। বাণিজ্যিক চাহিদার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে, অজ্ঞতা হেতু এই শিল্পের নামে কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক কারুশিল্প তৈরি হচ্ছে। বিদেশী নকশা মোটিফের যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে। এতে এ দেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পীর উদ্ভাবনী শক্তি, কৌশল ও দক্ষতা যোগ হচ্ছে না।

নগরায়ণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি ও আধুনিক জীবন যাপন গ্রামের সমাজে প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ লোক সমাজের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রবহমান ধারায় একটা পরিবর্তন এসেছে। এতে গ্রামের সকল বৈশিষ্ট্যই গুরুত্বহীন, কোন কোন ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য বিলীন হয়েছে। এই অবস্থার শিকার হয়েছে কাঠের তৈরি কারুশিল্প। ফলে এই শিল্পের উৎপাদন,হ্রাস পাচ্ছে, কাঁচামালের অভাব, পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিক্রির ক্ষেত্র মেলার পুরানো ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের এই শিল্পের স্থান মেশিনে তৈরি জিনিস দখল করে চলেছে। এতে গ্রামে এই শিল্পের চাহিদা প্রতিনিয়ত হ্রাস হচ্ছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা এ অবস্থায় ক্রমান্বয়ে তাদের পূর্বপুরুষের পেশা ত্যাগ করছে। এ অবস্থা নেতিবাচক। এর ফলে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প স্বাভাবিক পৃষ্ঠাপোষকতা ও পৃষ্ঠপোষকতার পরিবেশ হারাচ্ছে। বাজার হারাচ্ছে। এই অবস্থা সত্তেও বাংলাদেশের এই শিল্প নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে টিকে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন লাভে সক্ষম হচ্ছে। তবে তা ধীরে ধীরে। দেশে ও বিদেশে জনপ্রিয়তা, বাজার পুনরুদ্ধারে কিছু কাঠের তৈরি কারুশিল্প সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু এই বিরুদ্ধ ও নেতিবাচক পরিবেশের অবসান না হলে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্যেকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কি পরিমাণ কাঠের তৈরি কারুশিল্প সামগ্রী তৈরি হয়েছে তার বিষদ বিবরণ জানা যায়নি। এ শিল্পের বিপুল পরিমান কাঁচামালের কোন বিষদ তালিকাও নেই। বিশেষ বিশেষ কারুশিল্প এবং তার বিপরীতে যে সমস্ত মালামাল প্রয়োজন, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া যেতে পারে।

সারণি- ৬.১

৬.১ বিশেষ বিশেষ কারুশিল্প ও কাঁচামাল

ক্রমিক	উৎপাদিত	কাঁচামাল
১	হাতে বোনা কার্পেট, ডুরীম, মাদুর, পাপোশ	পাট এবং অন্যান্য আঁশ
২	বাঁশ, বেত ও রিড জাতীয় সামগ্রী, বাস্কেট ফার্নিচার	বাঁশ, বেত ও সব রকমের রিডস
৩	ছোবড়জাত পাপোশ, ম্যাট, কার্পেট	ছোবড়া
৪	কাঠের তৈরি কারুশিল্প	কাঠ
৫	তামা কাঁসা ও পিতল সামগ্রী	তামা, কাঁসা
৭	হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল সামগ্রী, নকশীকাঁথা বাটিক সতরঞ্জি খাদি, মনিপুরী	সূতা, রঙ, ডিজাইন টেক্সটাইল
৮	মৃৎ শিল্পজাত সামগ্রী, চায়ের কাপ ইত্যাদি	মাটি
৯	ঘাস এবং খড়ের তৈরি সামগ্রী, ম্যাট ব্যাগ, বাস্কেট মাদুর	ঘাস এবং খড়

তথ্য ৭ বাংলা ক্র্যাফ্‌ট

উপরেল্লিখিত তালিকায় কাঠের তৈরি কারুশিল্পের কাঁচামাল ‘কাঠ’। কাঠের তৈরি কারুশিল্প সামগ্রী প্রস্তুতের বেশিরভাগ কাঁচামাল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে উৎপাদিত। এগুলোর ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে চাষ খুবই কম। ঘনবসতি গড়ে উঠার সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশে উৎপাদিত এ সমস্ত কাঁচামাল জন্মানোর পরিবেশ ক্রমাগত সংকীর্ণ হচ্ছে। সে সাথে লোপ পাচ্ছে গুনাগুণ। উন্নত মানের কাঁচা মালের অভাব গুণগতমান কমে যাওয়ার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। অথচ অতি স্বল্প বিনিয়োগে দেশের সস্তা শ্রম কাজে লাগিয়ে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশ সম্ভব, প্রত্যেকটি গ্রামীণ পরিবার কাঠের তৈরি কারুশিল্প তৈরির মাধ্যমে একটি অতিরিক্ত আয়ের উৎস খুঁজে পেতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কাঠের তৈরি কারুশিল্প প্রস্তুতকারক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী তৈরি সামগ্রীর অতিরিক্ত জোগান ধরে রাখতে পারে না। প্রচুর কাঁচামালও সংগ্রহ করে রাখা

রপ্তানিকারকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে গুণগত মান এবং অর্ডার মাফিক রপ্তানি পণ্য সরবরাহে অনেক সময় বিলম্ব ঘটে।

কাঠের তৈরি কারুশিল্প সামগ্রী রপ্তানি পণ্যের মধ্যে আর একটি। তবে এক্ষেত্রে রপ্তানি অবদানের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। এগুলো তৈরিতে কারুশিল্পের বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা সৃষ্টিতে সক্ষম এ ধরনের দক্ষতা বাংলাদেশের পক্ষে এখনই পুরোপুরি অর্জন সম্ভব হয়নি। স্বল্প সম্পদে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাঠের তৈরি কারুশিল্প সামগ্রী বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের কৃষ্টি এবং সভ্যতাকে বিশ্বের বাজারে পরিচিত করতে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বিপুল পরিমাণে সস্তা শ্রমকে কাজে লাগাতে এ খাতের সুষ্ঠু উন্নয়ন ও বিকাশ অত্যন্ত প্রয়োজন। সরকারী নীতির সুষম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা সম্ভব।

বিদেশে বিপণন ভ্রমণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। তবে খুব কম সংখ্যক রপ্তানিকারক এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। কারণ আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধা যেমন ঋণ, চলতি মূলধন ইত্যাদি অপ্রতুলতার কারণে হস্তশিল্পজাত রপ্তানিকারকদের মধ্যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিপণন-এর ক্ষেত্রে বৈদেশিক ভ্রমনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।[৮]

বিদেশী রপ্তানিকারকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পণ্যের গুণগতমান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু বাংলাদেশে সে ধরনের কারিগর এবং লাগসই প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম এখানে কার্যকর করা হয়নি। বিসিকে একটি নকশা কেন্দ্র রয়েছে কিন্তু উন্নত মানের নকশা সরবরাহের অভাব এখনো পূরণ হয়নি। ফলে হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রপ্তানী আয় ক্রমাগত স্থির অবস্থায় রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বরং বাজার হারিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বাঁশের এবং বেতের তৈরি বাস্কেট ওয়্যার-এর কথা বলা যায়। একসময় ইইসির বাজারে এই বাস্কেট ওয়্যারের চাহিদা ছিল। কিন্তু ডিজাইন এবং বৈচিত্র্যের অভাব এ বাজার ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। বাংলাদেশী কাঠের তৈরি কারুশিল্পের চাহিদা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মান উন্নত করতে পারলে এবং বিশ্ব বাজারের চাহিদানুযায়ী প্রস্তুত করা হলে এখাত থেকে বিপুল পরিমাণ রপ্তানী আয় সম্ভব।

হস্তশিল্প রফতানি এবং ইইসি

"বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটি বা ইইসি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র হস্ত শিল্প জাত দ্রব্যের প্রায় ৬০ ভাগ ইইসি দেশগুলোতে রপ্তানি হয়। প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ইইসি জনগোষ্ঠীর এই বাজার আকারে বেশ বড়। তবে জীবনধারণ পদ্ধতি এবং চাহিদার ক্ষেত্রে ইইসি দেশসমূহে রকমফের রয়েছে। ইউরোপীয়দের প্রাকৃতিক পণ্য পছন্দনীয়তা অত্যন্ত প্রবল।" বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প পণ্য এখানে চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে। ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিশেষ সচেতনতার মাধ্যমে এ সুযোগ গ্রহণ করা যায়। রপ্তানিকৃত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ডিজাইন, রং ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্যের অভাব বাংলাদেশের পণ্যের প্রধান দূর্বলতা। এ ব্যাপারে তেমন প্রচেষ্টা, গবেষণা এবং বিশেষ যত্ন নেয়া হয়নি।[৯]

কাজেই এগুলো বিদেশের বাজারে মোটামুটি চাহিদা সৃষ্টি করতে পারলেও তা ধরে রাখতে পারেনি। রপ্তানি আয়ের গতিধারায় লক্ষণীয় যে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের রপ্তানি পরিমান তেমন উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বাড়েনি। আর ইইসির বাজারে বরং তার পরিমাণ কিছুটা নিম্নমুখী। রফতানি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল খাত। ক্রেতার চাহিদা এবং পছন্দ এখানে একটি বিশেষ স্থান দখল করে থাকে। আর কাঠের তৈরি কারুশিল্প পণ্য এমনি একটি আইটেম যার উপযোগিতা (Utility) সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। অর্থাৎ এটি এমন একটি খাত যা দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখলে বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় হতে পারে। অন্যথায় মূল্যহীন দ্রব্যে পরিণত হতে পারে ।

বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ প্রতিটি সচেতন মানুষের মধ্যেই রয়েছে। এদিক থেকেই এক দেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প অন্য দেশে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে সক্ষম বলেই এগুলো বিদেশে ক্রেতাদের কাছে সমাদৃত হয়েছে তবে একই ক্রেতা কখনই একই ধরনের পণ্য সংগ্রহে আগ্রহী হবে না।

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের রং এবং বৈচিত্র্যে এবং উপস্থাপনায় বিভিন্নমুখী গতিময়তা লাভে সক্ষম হলেই তা রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগতিায় টিকে থাকতে পারে।

সাম্প্রতিককালে ইইসি (ইউরোপীয় ইকোনোমিক কমিউনিটি) বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় হস্তশিল্পের বিভিন্ন সমস্যা গুলো হয়েছে। সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে

(১) বাংলাদেশের হস্তশিল্পের মধ্যে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ডিজাইন, রং এবং মানে বিগত কয়েকদশক থেকে একই ধরনের রয়েছে। এখানে বেশির ভাগ রফতানিকারক নিজস্ব

উদ্ভাবনের পরিবর্তে অন্যান্য রপ্তানিকারকদের অনুকরণ করতেই বেশি পছন্দ করেন। ফলে ক্রমাগত একই ধরনের পণ্য রপ্তানি বাজারে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ একবার যে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছুটা সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে পরবর্তীকালে ক্রমাগতভাবে একই পণ্য একই বাজারে রপ্তানি করা হচ্ছে। এর কারণে রফতানি পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং বিদেশে চাহিদাও ধরে রাখতে পারছে না।

(২) কাঠের তৈরি কারুশিল্প সামগ্রীর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ রপ্তানি পণ্য সরবরাহ আসে ক্ষুদ্র গ্রাম-গঞ্জের হস্তশিল্পজাত পণ্য প্রস্তুকারকদের কাছে থেকে।[১০]

বাংলাদেশে মোট কাঠের তৈরি কারুশিল্প খাতে ৮০৬৮টি কারখানা আছে। তাহাদের ব্যাপক উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে দেওয়া হ'ল

সারণি- ৬.২

৬.২ বাংলাদেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উৎপাদন

সন	খাটের সংখ্যা	চেয়ার টেবিল এর সংখ্যা	সোফার সংখ্যা	অন্যান্য কারু সামগ্রীর সংখ্যা
১৯৮০	২,২০,০০০	৫,৫০,০০০	৬৭,০০০	৮,৭০,০০০
১৯৮১	২,৩৫,০০০	৬,১৫,০০০	৭২,০০০	৯,১১,০০০
১৯৮৩	২,৪২,০০০	৭,৩১,০০০	৮১,০০০	১১,০০,০০০
১৯৮৪	২,৫৯,৫০০	৭,৬০,৫০০	১,০৫,০০০	১১,৪০,০০০
১৯৮৫	২,৭২,৩০০	৭,৮২,১০০	১,৩২,০০০	১২,০০,০১২

সন	খাটের সংখ্যা	চেয়ার টেবিল এর সংখ্যা	সোফার সংখ্যা	অন্যান্য কারু সামগ্রীর সংখ্যা
১৯৮৬	২,৮৫,১০০	৭,৯৫,৩০০	১,৪৫,০০০	১২,৫০,০০০
১৯৮৭	২,৯৮,৫০০	৮,১০,১০০	১,৫৩,০০০	১৩,০০,০০০
১৯৮৮	৩,১০,২০০	৮,০৫,০০০	১,৭১,০০০	১৩,৫০,০০

১৯৮৯	৩,১৫,৫০০	৮,১৫,০০০	১,৭৫,৩০০	১৪,০০,০০০

সূত্র ঃ নুরউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), ‍ecYb ‍e‡køIY, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ১৯৮৮-৮৯, পৃ. ২৯

উপরে উল্লেখিত টেবিল **১৯৯৮৮-৮৯** ইংরেজি সালে প্রণয়ন করা হয়েছে, তখন কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ব্যাবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বুঝা যায়। তবে কাঁচামাল হিসাবে ভাল জাতের কাঠের দুস্প্রাপ্যতা এই শিল্পের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া লোহা, স্টিল, কৃত্রিম কাঠ এমনকি প্লাস্টিকের তৈরি সামগ্রী ব্যাপকভাবে প্রাপ্তির ফলে বর্তমানে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উৎপাদন অনেক কমে গেছে। ব্যবহারও কমেছে। শহর অঞ্চলের-প্রতিটি পরিবারে কাঠের তৈরি কারুশিল্প ব্যাপক ব্যাবহার লক্ষ্য করা যায়। কাঠের তৈরি খাট, পালংক, টেবিল চেয়ার, আলমারী, সোফা প্রায় প্রতিটি পরিবারেই আছে। গ্রাম অঞ্চলে উল্লেখিত দ্রব্যের ব্যবহার না থাকলেও কাঠের তৈরি চৌকি, অধিকাংশ বাড়িতেই আছে তবে অনেক বাড়িতে টেবিল চেয়ারও দেখা যায়। নিম্নে উল্লেখিত দ্রব্যের প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যবহার দেখান হ'ল

সারণি- ৬.৩

৬.৩ গ্রাম অঞ্চলে কাঠের তৈরি সামগ্রী ব্যবহার

সন	খাট/চৌকি	চেয়ার টেবিল	সোফা	অন্যান্য সামগ্রী
১৯৮৮	৯,৩৫,৮২০	১৭,১৮,৩৮০	১,৫৭,৫২৫	১,৭০,০০০
১৯৯০	১০,১১,৩২২	২২,৫২,৮৮০	১,৭৫,৩২২	১৭,২২,০০০
১৯৯১	১১,১৯,৪২৫	২৫,৮৮,৫৫২	২,১০,৮৮০	২০,০০,২০০
১৯৯২	১২,১৮,২৭২	২৮,৯০,৯৭২	২,৫১,৪৭২	২৩,০০,০০০

সন	খাট/চৌকি	চেয়ার টেবিল	সোফা	অন্যান্য সামগ্রী
১৯৯৩	১৩,১৭,৯৭৮	৩২,১০,৪৮৪	২,৮৮,৮২২	২২,৮০,০০০
১৯৯৪	১৫,১৫,৩২২	৩৫,১৮,৪৩০	৩,১৪,৫২৫	২৫,০০,০০০

সূত্র ঃ নুরউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), ‍ecYb ‍e‡køIY, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ১৯৮৮-৮৯, পৃ. ৩০

বাঙালিদের জীবনের সাথে মেলা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রাচীনকাল থেকে গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে মেলা একটি সুপরিচিত ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মেলার সূচনার মূলে হলো স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্য। মেলা বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পালা-পার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেলায় নানা ধরনের নিত্যব্যবহার্য পণ্য বিক্রয়ের পাশাপাশি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদিও হয়ে থাকে। তাই মেলার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমকালীন সামাজিক অবস্থার তুলানামূলক বিচার ও ভাববিনিময়ও হয়ে থাকে। মেলা হলো মানুষের সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকান্ডের মিলন কেন্দ্র।

মেলা কাঠের তৈরি কারুপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনকি মেলার মাধ্যমে ক্রেতাদের রুচির পরিবর্তনের সুযোগ ঘটে। বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণই মেলার মাধ্যমে হয়ে আসছে। আর এ কাজের অনেকাংশ নির্ভর করে পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ওপর।

একেবারে প্রাচীনকালে মেলা বা ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানাদির তেমন কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে সম্পূর্ণ গ্রাম সমবায় ব্যবস্থার পতন এবং সামন্তরাজদের উত্থান পর্ব থেকে পালা পার্বণ বা মেলার ক্রমশ প্রসার শুরু হয়, এ ব্যাপারটা প্রায় নিশ্চিত। হিন্দু ধর্মের পূজা পার্বণের আনুষ্ঠানিকতা এই সামন্তরাজদেরই দান। সামন্ত ব্যবস্থায় অর্থনীতি এক কেন্দ্রিক হলেও উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প এবং মার্জিত উভয় শিল্পকলাই এসব ছোট-খাট সামন্তরাজদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। এদিক থেকে বলা যায় স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সমবায় ব্যবস্থার চেয়ে সামন্ত ব্যবস্থায় কারুশিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতার মুখ দেখে।[১১] এজন্য শিল্পীকে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। সন্দেহ নেই এই প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ হয়তবা পিছিয়ে পড়ছে। যার ফলে সংশ্লিষ্ট পেশার দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টা অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। সার্বিকভাবে এই অবস্থা আজকের মতো হতাশাব্যঞ্জক ছিল না। বর্তমান কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা যে সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে এর পেছনে প্রষ্ঠপোষকতার অভাব। তবে গ্রামাঞ্চলের কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা এখনও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে বিভিন্ন পর্বিণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলার জন্য। শুধু কারুশিল্প কেন, বলতে গেলে কৃষি প্রধান গ্রামগুলোর একঘেঁয়েমি, সহজ-সরল, ঘাত-প্রতিঘাতহীন জীবনে বিভিন্ন মেলা ক্ষণিকের জন্য হলেও নিয়ে আসে এক ঝলক মুক্তির পরশ। ছেলে-বুড়ো, শিশু-কিশোর সব বয়সের, সব মানুষই মেলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। হয়ত একজন থেকে অন্যজনের এর প্রেক্ষিত

থাকে ভিন্নতর। শিশু-কিশোর অপেক্ষা করে বিচিত্র সব খেলনা পুতুল, বাঁশি আর রকমারী মিষ্টান্নের আস্বাদ পেতে। গৃহিনী অপেক্ষা করে, হাতা, খুন্তি, পিড়ি-বেলনা, কাহাইল, চামচ জাতীয় নানা গার্হস্থ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য। বাঙ্গালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হলো মেলা। মেলায় একদিকে যেমন কৃষাণ-কৃষাণী, কাঠের তৈরি কারুশিল্পী

কামার-কুমার, তাঁতীসহ বিভিন্ন মাধ্যমের কারুশিল্পীরা অন্যান্য অনেকেই তাদের পণ্য বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। অন্যদিকে তেমনি গৃহকর্তা, গৃহবধূ তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিসটি ক্রয় করতে আসে। এমনকি মেলায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও তাদের পছন্দের খেলনা ক্রয় করে থাকে। মেলায় শুধু পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ই হয় না, বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়ে থাকে।

আমাদের গ্রামীণ সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক। মেলার সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সবকিছুই আবর্তিত হয় গ্রামীণ পটভূমিকে কেন্দ্র করে। এতে শুধু উৎপাদিত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ই হয় না, নতুন নতুন নকশা, নমুনা, উৎস, দর ইত্যাদির সাথে ক্রেতা-বিক্রেতা ও উৎপাদকের পরিচয় ঘটে। তাই পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অন্যতম মাধ্যম হলো মেলা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব মেলা বসে তাদের পণ্যের সম্ভারে বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মধ্যে এমন কিছু আসে যা কেবল তাদেরই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। অন্য কোথাও তা তৈরি হয় না। তাই বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো বিভিন্ন পালা-পার্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা। আর মেলা হলো ক্ষুদ্র, কুটির ও হস্তশিল্পজাত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, প্রদর্শন এবং বিভিন্ন প্রকার বিনোদনের সমাহার। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনা, নিয়ম-পদ্ধতি, কলা-কৌশলের উদ্ভাবন ঘটছে এবং যথারীতি আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সেগুলোর প্রয়োগও হচ্ছে। আমাদের গ্রামীণ কারুশিল্পীরা টাকা-পয়সা লেনদেনের পাশাপাশি প্রাচীন বিনিময় প্রথাকে একেবারে ত্যাগ করে নি। যার কিছু বাস্তবতা লক্ষ করা যায় । কারুশিল্পের অনেক কারিগর আছে তারা তাদের পসরা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে আর তাদের বিক্রিত জিনিসের বিনিময়ে টাকা-পয়সা না নিয়ে ধান অথবা চাল নেয়। ধান-চালে পরিমাণ সের হিসেবে অথবা তাদের কোন পাত্র দিয়ে মেপে নির্ধারণ করে। এ পদ্ধতির পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে নাকি বংশানুক্রমিক বৃত্তির মতোই বিপণন পদ্ধতিও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে তাও একটি গবেষণার বিষয়।

বিপণন ব্যবস্থায় শহর এবং গ্রাম ভিন্নতর কৌশলের দাবি রাখে। শহরকেন্দ্রিক কারুশিল্পীরা সারা বছরই কিছু না কিছু বিক্রির সুযোগ পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে গ্রামীণ কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা গ্রামের হাট বাজারে

খুব সামান্য পরিমাণেই জিনিস বিক্রি করে থাকে। বরং তাদের তৈরি পণ্যের একটা অংশ পাইকারীভাবে বিক্রি করে। আর একটা অংশ সঞ্চিত করে রাখে পালা পার্বণ বা মেলা অনুষ্ঠানের জন্য। কারণ মেলায় তুলনামূলকভাবে জিনিসের দাম একটু বেশি পাওয়া যায়। পাশাপাশি বিক্রির পরিমাণও বেশি হয়।

বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ হিসেবে মেলা দীর্ঘকাল যাবত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মেলার সঙ্গে রয়েছে বাংলা এবং বাঙালির নিবিড় সম্পর্ক। মেলা কবে কোথায় কখন শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও মেলা সম্পর্কিত গবেষকরা অনুমান করে থাকেন প্রায় তিনশত থেকে চারশত বছর আগে থেকে মেলার শুরু। ইউরোপে প্রথম আধুনিক শিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হয ১৮৫১ সালে লন্ডনের হাইড পার্কের ক্রিস্টাল প্যালেসে। সবচেয়ে বড় শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয় ইতালির মিলান আর ফ্রান্সের প্যারিসে। এগুলোতে দর্শক সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ লাখের মতো। মেলা কখনো উৎসব হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। এর প্রমাণ ১৯৫১ সালে ব্রিটেন উৎসব।[১২]

যখন থেকে মানুষ চিন্তা করল যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান প্রয়োজন, মূলত তখন থেকেই বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্রের উৎপত্তি। সাধারণ হাট-বাজারগুলোই মানুষকে মেলাকেন্দ্রিক ব্যবসার প্রেরণা যোগায়। মেলা শব্দের সাদাসিধে অর্থ দাঁড়ায় ক্রয়-বিক্রয়ের সমাবেশ। হাট-বাজার যেমন লৌকিক কর্মকাণ্ডের হাত ধরে কিংবা নিজ থেকেই গড়ে ওঠে, অনেকটা সেভাবেই মেলার সূত্রপাত বলে মনে করা হয়। কাল অনুপাতে সবচেয়ে বেশি মেলা হয় চৈত্রের পরে বৈশাখ মাসে। চৈত্র মাসের মেলা প্রধাণত চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এবং বৈশাখ মাসের মেলা প্রধানত বর্ষবরণ বা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এসব ছাড়াও হিন্দু বা মুসলমান বিভিন্ন সাধক পুরুষদের আবির্ভাব এবং তিরোধান উপলক্ষেও অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও হিন্দুদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা এবং মুসলমানদের দুটি ঈদ ও মহররমেও অনেক জায়গায় জমজমাট মেলা বসে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাগ ও জেলাওয়ারী মেলার সংক্ষিপ্ত তালিকা

সারণি- ৬.৪

৬.৪ বাংলাদেশে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলাওয়ারী মেলার বিবরণ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	মেলার সংখ্যা	মোট মেলার সংখ্যা

০১	ঢাকা	ঢাকা	৬০ টি	৬২০টি
		নারায়ণগঞ্জ	৩১ টি	
		নরসিংদী	৪৩ টি	
		গাজীপুর	৩১ টি	
		মুন্সীগঞ্জ	৩০ টি	
		মানিকগঞ্জ	৩৯ টি	
		ময়মনসিংহ	৪০ টি	
ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	মেলার সংখ্যা	মোট মেলার সংখ্যা
		কিশোরগঞ্জ	৪৬ টি	
		নেত্রকোনা	৪৮ টি	
		টাঙ্গাইল	৩৬ টি	
		জামালপুর	০৮ টি	
		শেরপুর	২৭ টি	
		ফরিদপুর	২৩ টি	
		মাদারিপুর	২১ টি	
		রাজবাড়ী	৫৪ টি	
		গোপালগঞ্জ	৬৩ টি	
		শরীয়তপুর	২০ টি	

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	মেলার সংখ্যা	মোট মেলার সংখ্যা
০২	চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম	৫২ টি	২৫৩ টি
		কক্সবাজার	০৬ টি	
		নোয়াখালী	৩২ টি	

		ফেনী	০৯ টি	
		লক্ষীপুর	১৪ টি	
		কুমিল্লা	৫২ টি	
		বি-বাড়িয়া	৪৪ টি	
		চাঁদপুর	২২ টি	
		রাঙ্গামাটি	১০ টি	
		খাগড়াছড়ি	০৮ টি	
		বান্দরবান	০৪ টি	
০৩	সিলেট	সিলেট	২৭ টি	৯৫ টি
		হবিগঞ্জ	৪৬ টি	
		মৌলভীবাজার	১৬ টি	
		সুনামগঞ্জ	০৬ টি	
০৪	রাজশাহী	রাজশাহী	২৯ টি	৪৯৫ টি
		চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২০ টি	
		নওগাঁ	১৯ টি	
		নাটোর	১৯ টি	
		পাবনা	১৯ টি	
		সিরাজগঞ্জ	৪৫ টি	
		বগুড়া	৪৪ টি	
		জয়পুরহাট	০৮ টি	

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	মেলার সংখ্যা	মোট মেলার সংখ্যা
		রংপুর	৬৭ টি	
		গাইবান্ধা	১০৪ টি	

		কুড়িগ্রাম	২৪ টি	
		লালমনিরহাট	৩০ টি	
		নীলফামারী	০৭ টি	
		দিনাজপুর	৫৪ টি	
		ঠাকুরগাঁও	০৪ টি	
		পঞ্চগড়	০২ টি	
০৫	খুলনা	খুলনা	৪১ টি	২৩৭ টি
		বাগেরহাট	৪০ টি	
		সাতক্ষীরা	১৯ টি	
		যশোর	৩৪ টি	
		ঝিনাইদহ	১৮ টি	
		মাগুরা	৩১ টি	
		নড়াইল	২৭ টি	
		কুষ্টিয়া	১৩ টি	
		চুয়াডাঙ্গা	০৭ টি	
		মেহেরপুর	০৭ টি	

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	মেলার সংখ্যা	মোট মেলার সংখ্যা
০৬	বরিশাল	বরিশাল	২১ টি	৯৫ টি

		ঝালকাঠি	২০ টি	
		পিরোজপুর	২৩ টি	
		ভোলা	০৫ টি	
		পটুয়াখালী	২৪ টি	
		বরগুনা	০২ টি	

সূত্র ঃ মঞ্জু আরা বেগম, e৷sjv‡'‡ki †gjv, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ২০১৪-২০১৫, পৃ. VII-X

সারণি- ৬.৫

৬.৫ বাংলা, ইংরেজী ও আরবি তারিখ অনুযায়ী মেলার সংখ্যা

ক্রমিক নং	মাস	মাসের নাম	মেলার সংখ্যা	মোট মেলার সংখ্যা
০১	বাংলা মাসের তারিখ অনুযায়ী মেলার সংখ্যা	বৈশাখ	৪৪৩ টি	১৫১৪ টি
		জৈষ্ঠ্য	২৬ টি	
		আষাঢ়	৯৯ টি	
		শ্রাবণ	১৩ টি	
		ভাদ্র	২৭ টি	
		আশ্বিন	১৪২ টি	
		কার্তিক	৮৯ টি	
		অগ্রাহয়ণ	২৭ টি	
		পৌষ	৮৮ টি	

ক্রমিক নং	মাস	মাসের নাম	মেলার সংখ্যা	মোট মেলার সংখ্যা
		মাঘ	১০০ টি	

		ফাল্গুন	৯০ টি	
		চৈত্র	৩৭০ টি	
০২	ইংরেজী মাসের তারিখ অনুযায়ী মেলার সংখ্যা	জানুয়ারি	২৭ টি	২৬৬ টি
		ফেব্রুয়ারি	৩৭ টি	
		মার্চ	২৩ টি	
		এপ্রিল	২৯ টি	
		মে	১৪ টি	
		জুন	৩০ টি	
		জুলাই	২২ টি	
		আগস্ট	০৪ টি	
		সেপ্টেম্বর	০৪ টি	
		অক্টোবর	১৭ টি	
		নভেম্বর	১১ টি	
		ডিসেম্বর	৪৮ টি	
০৩	আরবি মাসের তারিখ অনুযায়ী মেলার সংখ্যা	মহরম	১১ টি	১৫ টি
		রবিউল আউয়াল	০১ টি	
		জমাদি-উস-সানি	০১ টি	
		রজব	০২ টি	

সূত্র ঃ মঞ্জু আরা বেগম, evsj¨‡`‡ki †gjv, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ২০১৪-২০১৫, পৃ. VII-X

সর্বমোট - **১৫১৪+২৬৬+১৫ = ১৭৯৫** টি।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাগ ও জেলাওয়ারী মেলার সংখ্যা এক হাজার সাত শত পঁচানব্বইটি।

তথ্যসূত্র

১. মঞ্জু আরা বেগম (সম্পাদিত), evsj¨‡`‡ki †gjv, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ২০১৪-২০১৫, পৃ. VII-IX

২. প্রাগুক্ত, পৃ. IX-X

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. X

৪. শাহরিয়ার হোসেন শাবিন, ‡jvKwk‡í †jvKR ‡Ljbv : bIMv, ঢাকা ঃ মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ৫৫

৫. সৈয়দ মাহবুব আলম, Kviægq †dg: evsjv‡‘‡ki HwZn¨gq Kviæwk‡íi GK bZb D™weZ ms‡hvRb, কারুময় ফ্রেম প্রদর্শনী ও সেমিনার, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৬, পৃ. ২৩

৬. Subrata Banerjee, Bangldesh, New Delhi ঃ National Book Trust, 1981,P P. 41

৭. তথ্য বাংলা ক্রাফট

৮. জাবীন মাহবুব (সম্পাদিত), Kviæwkí, ঢাকা ঃ কারুশিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৮

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

১১. শাহরিয়ার হোসেন শাবিন, †jvKwk‡í †jvKR †Ljbv t bIMv, ঢাকা ঃ মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ৫৫

১২. মঞ্জু আরা বেগম (সম্পাদিত), evsjv‡‘‡ki †gjv, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ২০১৪-২০১৫, পৃ. XIII

উপসংহার

গ্রামের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক ফসল কাঠের তৈরি কারুশিল্প। এই শিল্প একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি যা তার নিজস্ব পরিচয় বহন করে। কাঠের তৈরি কারুশিল্প একান্তভাবেই জাতির পরিচয় বহন করে। যা আনন্দের, গর্বের। দীর্ঘ দিনের ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবে দেশের মানুষদের কাছে এতদিন পর্যন্ত কারুশিল্পকে অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের নিম্নস্তরের কারুকর্ম বলে বিবেচনা করা হতো। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের একটি আন্তর্জাতিক আবেদন আছে। এই সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে এমন শিল্পের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ রয়েছে। এসবের মূলে রয়েছে সহজ-সরল ও আসল ভাবটুকু কখনও সূক্ষ্মভাবে সরাসরি উপস্থাপন করা। সরাসরি খুব দ্রুত দর্শকের মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং স্থায়ী ছাপ ফেলে । এক মানুষ থেকে আর এক মানুষের ক্ষেত্রে শিল্পের আবেদনগত পার্থক্য আছে। যে কোন শিল্পকলার শৈল্পিকমান কিংবা নান্দনিক বৈশিষ্ট্য একটি আপেক্ষিক বিষয়। অর্থাৎ কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। তবে তাদের কাছে যে কোন কাঠের তৈরি কারুশিল্পের মূল্য অপরিসীম।

এই গবেষণাকর্মের বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশের কারুশিল্পের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একটা ক্রান্তিকাল যাচ্ছে। সব মিলে কারুশিল্পী বা কারিগর-শ্রেণী ক্রমাগত অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছে। বিদেশী এবং সস্তা দেশীয় প্লাস্টিকের খেলনার সাথে ক্রমাগত অসম প্রতিযোগিতায়, ক্রেতা শ্রেণীর রুচির আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটেছে। অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেকেই পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। এরপরও যে সব শিল্পী কাঠের কারুশিল্প তৈরির চর্চাকে কোন রকমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। দেশের সরকার তথা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচিত দেশীয় এই শিল্পের প্রতি সতর্ক বিবেচনা এবং এর আশু সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া।

কারুশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এ বিষয়ের সত্যিকার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করতে হলে প্রয়োজন একেবারে কাছ থেকে তাদের জীবন-জীবিকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অর্জন করা। তাদের সবার কর্মযজ্ঞকে পর্যালোচনা করা, তাদের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে মেশা যা করতে গেলে প্রয়োজন ব্যাপক স্বদিচ্ছা। স্বল্প পরিসরে আলোচনায় স্বভাবতই বিষয়টির অভ্যন্তরে প্রবেশ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা ও গবেষণা করার প্রয়াস আছে। বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারা এদেশের সংস্কৃতির প্রাণ। অবহেলিত গ্রামের কারুশিল্পীর কারুশিল্পকলার এক বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে এবং এর পেছনে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বংশপরম্পরায় কারুশিল্পীদের পূর্ব ঐতিহ্য

বজায় রাখা আর সম্ভব হয়নি। তাই পরবর্তীতে দক্ষতার অবনতি ঘটেছে। ফলে কারুশিল্পীদের অসামান্য নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব আজ শেষ হতে চলেছে। সমাজ রূপান্তরের সাথে সাথে বাংলাদেশের সংস্কৃতির এই মূল্যবান কারুশিল্প নির্মাণের প্রয়োজন অনেকটা ফুরিয়েছে।

বর্তমান অধ্যায়ে এ পর্যন্ত বিশ্লেষণকৃত বিষয় পর্যালোচনায় নির্বাচিত "বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্প ঃ ঐতিহ্য সন্ধান" কার্যক্রমে সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে স্বল্প পরিমাণ ইতিবাচক অবস্থার পাশাপাশি নেতিবাচক দিকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গবেষণার আলোকে কারুশিল্পীরা নানা পারিপার্শ্বিক কারণে তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে তেমন সফলতা দেখাতে পারেনি। কিন্তু গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, কারুশিল্পকে টার্গেট করা হলেও উন্নয়নের সুশৃঙ্খল পথ ও বেকারত্ব দূর করার পরিকল্পনা এখনও গড়ে উঠেনি। তাছাড়া উন্নয়নের নামে ও ঐতিহ্য রক্ষার নামে নানা ধরনের পরিকল্পনা কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের কতটুকু উপকারে আসছে এ বিষয়ে ইতিপূর্বে তেমন গবেষণা হয়নি। তবে আলোচ্য গবেষণায় একটি জিনিস প্রমাণিত হল যে কারুশিল্পীদের উন্নয়নের নামে নেয়া যৎসামান্য অর্থ তাদের আদৌ কোন কল্যাণ করতে পারছেনা। বড় বড় কলকারখানায় উৎপাদিত নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসারের ফলশ্রুতিতে কারুশিল্পী ও তাদের পণ্যের উন্নয়নের ব্যাপারটি পুরাই ভুলুণ্ঠিত। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে ঠিক রেখে এবং সরকারী প্রজেক্টের সহযোগী হবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মূল বিষয়টিই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। আসলে এনজিও গুলো কারুশিল্প পণ্য তৈরিতে নারীদেরকে বেছে নেয় তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে, শোষণ এবং অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। জনৈক গবেষকের মতে, "Poverty is powerlessness that reduces peoples capacity to earn sustainable livelihoods."[১]

তাদের উন্নয়ন ও ভাগ্যের পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে সরকার কর্তৃক দেয় সীমিত ঋণকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এই সীমিত ঋণই যে কারুশিল্পীদের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়, তা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। তাই ঋণদান কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণকে মুখ্য হিসেবে না রেখে এটাকে ভিত্তি করে কারুশিল্পীদের সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের বর্তমান অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে হবে। কাঠের কারুশিল্প তৈরিতে এবং এর যে বিশাল ঐতিহ্য আছে এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই অবদান আছে। তাইতো "সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি" এ লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজন বাস্তব কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচী। এজন্য প্রয়োজন নারী পুরুষ সমতায়নের দ্বারা সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করা, নারীর

শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন, চাই গৃহকর্মের শ্রম বিভাজন রোধ করে সমাজ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন। কারণ বর্তমান বিশ্বের কাঠের তৈরি কারুশিল্পকে তাল মিলিয়ে চলতে এবং দেশের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায়

পৌঁছাতে এর অবদানে নারী-পুরুষ সমদর্শিতার আলোকেই পথ চলতে হবে। সেক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা, এনজিও গুলোকে পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে সম্মিলিত উদ্যোগ দ্বারা কারুশিল্পীদের দূরবস্থা দূরীকরণসহ সমতা ভিত্তিক সমাজ গঠনের মাধ্যমেই লক্ষ্য পুরণে অগ্রসর হতে হবে।

শিল্পী বলে নয়, সমাজের প্রত্যেকটি সচেতন মানুষ মাত্রই প্রয়োজন তার দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় পরিচয় ধরে রাখতে হলে তুলে ধরতে হবে জাতীয় ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকর্মকে। আমাদের দেশ লোক ও কারুশিল্পের লীলাভূমি। সাধারণত গ্রামে গ্রামে কারুশিল্পী, লোকশিল্পী ও দারুর কারিগর বা সূতার, তাঁতী, কুমার, পটুয়া, মালাকার সবাই বাংলার সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে মিশে আছে। এদের মধ্যে কাঠের তৈরি কারুশিল্পীগণ বংশানুক্রমে তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পীগণ ও দক্ষতার ছাপ রেখে গেছে। তাদের সৃষ্ট এই সকল কাঠের কারুশিল্প বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য বিশেষ উপাদান।

নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে কাঠের তৈরি কারুশিল্পও একটি অধ্যায়। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় এবং মনোরঞ্জনের বা বিনোদনের এই কাঠের তৈরি কারুশিল্প দিন দিন পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে তার রূপ গড়ন পাল্টাচ্ছে। অনেক সময় কিছু কিছু কারুশিল্প সামগ্রীতার গ্রহণযোগ্যতাও হারাচ্ছে। পৃথিবী পরিবর্তনশীল। এই পৃথিবীতে কাঠের তৈরি কারুশিল্প সহ সবকিছুই ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। বিবর্তনের মাধ্যমে অনেক কিছুর বিলুপ্তিও হচ্ছে। পুরাতন সভ্যতার পরিবর্তন হয়ে উত্থান ঘটেছে নতুন সভ্যতার। আর্য, মৌর্য, গুপ্ত, পাল, মুসলিম, বৃটিশ এদের মেজাজ, মর্জি, রুচি এক কথায় সংস্কৃতি ছিল আলাদা আলাদা। বাংলায়ও শুরু থেকে আজ অবধি নানা শাসককূলের আগমন ঘটেছে। এখানে দিনের পর দিন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে নিজস্ব সংস্কৃতির পরিবর্তন, বিবর্তন ও বিলুপ্তি ঘটেছে বা ঘটে যাচ্ছে।

কারুশিল্পীদের অনেক পরিবারের ছেলে-মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভিন্নতর পেশাকে জীবিকার জন্য বেছে নিচ্ছে। ফলে বংশানুক্রমিক পেশার ব্যাপারটা এখানে ভেঙ্গে যাচ্ছে। এখন এরা অনেকে কৃষি কাজ করে, কেউ রিক্সা চালায়, কেউবা চাকরি করে কেউবা ব্যবসা। পূর্বে এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই অশিক্ষিত ছিল। কিন্তু আজ কেউ কেউ তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী বা বংশগত কাজ থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যারা কাঠের তৈরি কারুশিল্পের আধুনিক করণকৌশল আয়ত্ব করতে পারছে অথবা অর্থনীতিকভাবে যারা একটু স্বচ্ছল অবস্থার মুখ দেখেছে তারা তাদের সাবেকি কর্মধারার পরিবর্তে কারুশিল্পের আধুনিক উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করছে। প্রথাগত হাঁড়ি-পাতিল, সরা, পুতুল, টি-সেট, চামচ, ফুলদানি, এ্যাসট্রে, বিভিন্ন আকারের পণ্য জনমানসের

চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগান দিচ্ছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে আধুনিকতার ছাপ তাদের মতে প্লাস্টিকের পণ্য বেশি টেকশই, বেশি চকচকে হওয়ার কারণে চাহিদাও বেশি এবং মূল্যও বেশি পাওয়া যায়।

বর্তমানে আর আগের মতো কাঠ পাওয়া যায় না। তাই কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা কাঠের সংকট লক্ষ্য করছে। প্লাস্টিক পণ্যের জন্য ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প উৎপাদন অনেক কমে গেছে। এর ফলে প্রয়োজনের তাগিদে কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের জীবন-জীবিকাও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রকৃতির নিয়মে পুরাতনের বিলুপ্তি আর নতুনদের উদয় হয়েই চলেছে। বর্তমান কারুশিল্পীরা এ সব জেনেও কোন প্রতিকার করতে পারছে না। এক্ষেত্রে তারা এখনও সেই প্রাচীন স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থার নিগড়েই যেন বাঁধা, যেখানে তারা একান্তই অন্ত্যজ শ্রেণী হিসেবে পরিচিত। শত পুণ্য বা শুভ কর্মের ফলেও নির্দিষ্ট শ্রেণী থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। কারণ বৃত্তিই তার শ্রেণী নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবন নিশ্চিত হলে এদেশের ঐতিহ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে নতুন আধুনিক কাঠের কারুশিল্পের উদ্ভাবনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তখন আধুনিক কাঠের কারুশিল্পকে অচেনা মনে হবে না, আমাদের ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে জাতীয় কারুশিল্প নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। জাতীয় কারুশিল্প নীতি প্রণয়ন না হলে আধুনিক বিদেশী মোটিফ, নকশা গড়নযুক্ত প্রাণহীন কৃত্রিম বাণিজ্যিক কারুশিল্পের প্রভাবে বাংলাদেশে সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবহমান বাংলার লোক কারুশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ অবস্থা দেশের কারুশিল্পের ঐতিহ্যের উপর আঘাতস্বরূপ। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। আমাদের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত গড়ন নকশা ও মোটিফের যথাযথ দলিলিকরণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে বাংলাদেশের কাঠের কারুশিল্পের গড়ন, নকশা ও মোটিফ ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা যেতে পারে। তা হলে আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পের পাশাপাশি আমাদের ঐতিহ্যবাহী কাঠের তৈরি কারুশিল্পের অস্তিত্ব রক্ষার প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

কাঠের কারুশিল্পের শিল্পী ও কারিগরদের সমস্যা সমাধানে তাদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করতে প্রয়োজনীয় কার্যকরী

ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এবং চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। ফলে আধুনিক এবং ঐতিহ্যবাহী কাঠের

তৈরি কারুশিল্প এগিয়ে যাওয়ার পথ পাবে। উৎপাদনে গতি ফিরে আসবে আধুনিক কাঠের কারুশিল্প সম্পূর্ণ অচেনা হবে না। শেকড়ের কাছাকাছি অবস্থান করবে, এ সবই করছেন আমাদের ঐতিহ্যের লোক কারুশিল্পের লালন ও পুনরুজ্জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের উপর।

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের মধ্যে আসবাপত্রের উপযোগী কাঠ তুলনামূলকভাবে কম হলেও এটি একটি সম্ভাবনাময় কারুশিল্প। আধুনিক বিশ্বে নরম কাঠকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আসবাবপত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দেশে উল্লেখিত প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজ শুরু হলেও তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় নাই, ফলে আসবাবপত্র তৈরি উপযোগী শক্ত কাঠ ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। তাই আসবাবপত্র তৈরির প্রাচীন ধারা পরিহার করে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় যারা আসবাবপত্র তৈরি করতেন তারা ভারতে চলে যান, ফলে এই শিল্পে ভাটা পড়ে। অধুনা সেই ভাটা থেকে দেশ কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। নতুন কারুশিল্পী "সূতার" সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে।

এই শিল্পকে রপ্তনিমুখী করতে হলে এর আধুনিকায়ন আবশ্যক। বিদেশী ফরমায়েস এক সঙ্গে সাধারণতঃ এত বেশি পরিমাণ থাকে যে মেকানাইজড আসবাবপত্র তৈরি কারখানা দেশে না থাকার কারণে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ফরমায়েস অনুযায়ী যোগান দেওয়া হচ্ছে না। এমতাবস্থায় বি,এফ,আই, ডি,সি এবং বেসরকারী উদ্যোক্তাদিগের সমন্বয় সাধন পূর্বক এ ধরনের রপ্তানিমুখী কয়েকটি শিল্প কারখানা স্থাপন করা যায়।

১. বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

১.১ ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের উপযোগী অবকাঠামো অনুপস্থিত বিধায় দেশের এই শিল্পটি দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারুশিল্পী ও কারুশিল্প বিক্রেতা অত্যন্ত দুর্বল

১.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী বিবেচনা করে ঐ শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ভিত্তিতে কোন কৌশল পর্যন্ত প্রণীত হয়নি

১.৩ জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় কাঠের তৈরি কারুশিল্পের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কারুশিল্প সরবরাহে বেসরকারি খাতকে সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ধুদ্ধকরণের পরিবর্তে সরকার স্বয়ং বিভিন্ন এজেন্সীর মাধ্যমে কাঠের তৈরি কারুশিল্প তৈরিতে লিপ্ত

১.৪ দেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল হওয়ার কারণে একদিকে যেমন এই শিল্পের দক্ষ পেশাজীবি সৃষ্টি, নিয়োগ ও প্রতিপালনের ক্ষমতা নেই তেমনি অপরদিকে দক্ষ পেশাজীবির চরম অভাব থাকায় কাঠের কারুশিল্পের খুচরা বিক্রির উপর প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে ক্রেতাকে দেয় ছাড় এ শিল্পের খুচরা বিক্রেতার আয় অত্যন্ত সংকুচিত করেছে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিক্রেতারা আর্থিক দিক থেকে ক্রমশ: দুর্বল হয়ে পড়েছে

১.৫ আমদানীকৃত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ঢালাও ব্যবসা, দেশের এ শিল্পের বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করেছে

১.৬ আভ্যন্তরীণ সীমিত বাজার থাকায় ও পরোক্ষভাবে কোন প্রকার বাজার সমর্থন না থাকায় দেশে রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সংখ্যায় অত্যন্ত স্বল্প। বিদেশে বাংলাভাষী অঞ্চলে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগের অভাব রয়েছে

১.৭ জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে কারুশিল্পের ব্যবহার অভ্যাস পূনরায় সৃষ্টি করে কাঠের তৈরি কারুশিল্প চাহিদার ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে এ শিল্পের বুনিয়াদ দৃঢ় করা ও এই শিল্পকে পূনরায় দ্রুত বিকাশশীল করে তোলার জন্য এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের দায়িত্বের সুষ্ঠু বন্টন ও গৃহীত কর্মসূচীসমূহের সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ ক্ষমতা উক্ত সমন্বয় কাজের জন্য যথেষ্ট উপযোগী নয়

১.৮ বাংলাদেশে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই শিল্পের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য কতকগুলো বিষয়ে সাময়িকভাবে বিহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কতকগুলো বিষয়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি সামনে রেখে দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক

২. বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উন্নয়নে সুপারিশমালা

২.১ কাঠের তৈরি কারুশিল্প প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদের সহজ শর্ত অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা যাতে তাদের মূলধন বিনিময় উৎসাহিত হয় এবং এই শিল্পের বিক্রেতা ব্যাপকভাবে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের মজুদ বৃদ্ধি করতে পারেন।

২.২ ক্রমান্বয়ে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ব্যবসাকে বেসরকারি খাতে স্থানান্তরকরণ যাতে এর শিল্পীগণ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের পণ্যকে বাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং পুঁজির বিকাশ ঘটাতে পারেন।

২.৩ কাঠের তৈরি কারুশিল্পে জড়িত পেশাজীবিদের জন্য নিয়মিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২.৪ কাঠের তৈরি কারুশিল্প স্থল, জল, বিমানে পরিবহণের যুক্তিসঙ্গত হ্রাসকৃত ভাড়া প্রবর্তন করা।

২.৫ উপরোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সাময়িক উন্নয়ন ঘটানো গেলেও এ শিল্পের ক্রমবিকাশ একটি জাতীয় নীতির আলোকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ব্যতীত সম্ভব নয়। এ শিল্পের পরিধি এতই বিশাল ও ব্যাপক যে, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবির সম্পর্ক ও স্বার্থ জড়িত রয়েছে। অপরদিকে জনগণের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাও এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

২.৬ কাঠের তৈরি কারুশিল্প বিষয়ে জাতীয় ভিত্তিক উপকরণ ও কৌশল ও বাস্তবায়ন কার্যসাধনের বন্দোবস্ত করার উপযোগী একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যা সরকারের নিয়মিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে। এই দায়িত্বসমূহের মধ্যে থাকবে এ শিল্পে নিয়োজিত অপরাপর কর্তৃপক্ষসমূহকে এ বিষয়ে করণ কৌশল সম্পর্কে ধারনা ও বাস্তবায়নে পরামর্শ দেওয়া এ শিল্পে নিয়োজিত পক্ষসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কর্মপন্থা নির্ণয় করা এ শিল্প বিষয়ে জাতির স্বার্থ সংরক্ষণ করা শিল্পীর তৈরিকৃত পণ্য সবার হাতে পৌছানোর সময় পর্যন্ত এ শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা করা।

২.৭ কাঠের তৈরি কারুশিল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক চাহিদা নির্ণয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ফলাফল প্রকাশ করা। যথা ক্রেতা, সংগ্রাহকের প্রয়োজন মূল্যায়ন করা, বর্তমান অবকাঠামোর বিশ্লেষণ করা, দক্ষ কর্মী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

২.৮ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের পরিচয় সভ্যতা সম্পর্কে সরকারি স্বীকৃতি এ শিল্পকে দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি, কোন দেশের নিজস্ব সুষ্ঠু ও শিল্প কমবেশি উক্ত দেশের সরকারের ঐ নীতি ও এ শিল্প উন্নয়নে সহযোগিতা করার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। জাতীয় উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় কাঠের তৈরি কারুশিল্পের স্থান সুনির্দিষ্ট করে এ শিল্প যাতে জাতীয় ভিত্তিতে প্রণীত নীতি ও কৌশল অনুযায়ী পরিচালিত হয় সেই লক্ষ্যে সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

সমর্থনে এর জন্য ব্যাপক অবকাঠামো তৈরি করা আবশ্যক। যাতে এ শিল্প শুধু দেশেরই প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবে।

৩. প্রস্তাবসমূহ

৩.১ বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত সরকারি নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবি গ্রুপসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতা ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্বলিত একটি স্বায়ত্তশাসিত কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন।

৩.২ সংস্থাটির নাম হতে পারে "বাংলাদেশ জাতীয় কাঠের তৈরি কারুশিল্প উন্নয়ন পরিষদ।" National Wooden Craft Development Council of Bangladesh.

৩.৩ তথাকথিত জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ বর্তমান মর্যাদা ও প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের গুরুত্ব বাড়ানো উচিত। এছাড়া শুধুমাত্র কাঠের তৈরি কারুশিল্পের জন্য প্রস্তাবিত বাংলাদেশ জাতীয় কাঠের তৈরি কারুশিল্প উন্নয়ন পরিষদ নতুনভাবে গঠন।

৩.৪ এই পরিষদ পরিচালনার জন্য একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি থাকবেন। একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত ডিজাইনার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব / বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্য বা সমমর্যাদার অত্যন্ত সম্মানিত সংশ্লিষ্ট বিষয় অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবি অথবা দেশের কারুশিল্প বিভাগে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। দেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের অভিজ্ঞ ও এ বিষয়ে সভাপতি করে এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে পদাধিকার বলে সহ-সভাপতি করে প্রান্তিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পীদের মধ্যে চারজনকে সদস্য করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন।

৩.৫ বাংলাদেশ কাঠের তৈরি কারুশিল্প উন্নয়ন পরিষদের উদ্দেশ্য হবে বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশ সাধন।

৩.৬ বাংলাদেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের স্বরূপ উদঘাটন, সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় অন্বেষণ ও ঐ লক্ষ্যে সরকার, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও পেশাজীবি গ্রুপের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ দান করা।

আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সঙ্গে ঐতিহ্যগত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের একটা সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। এই সম্পর্কের অভাব আমাদের আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পে লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে যে নতুন আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করার কথা তা যথাযথ ভাবে হয়নি বা হচ্ছে না। আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সঙ্গে ঐতিহ্যগত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের যে সুসম সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন ছিল এ অবস্থায় তা হচ্ছে না। মিশ্র আধুনিক ও বিদেশী কাঠের তৈরি কারুশিল্পের নেতিবাচক প্রভাব এই দেশের কাঠের তৈরি কারুশিল্পের জন্য অতি প্রয়োজনীয় নতুন উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটছে না। ফলে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের শেকড়ের সঙ্গে আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। এর ফলে বাংলার ঐতিহ্যগত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ভিত্তির উপর সুস্থ আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ভিত গড়ে উঠছে না। অপরদিকে কাঠের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্যের উপাদানগুলো আমাদের জীবন ও সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কাঠের তৈরি কারুশিল্প এবং আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করা যাচ্ছে না। অনেক বিদেশী নকশা মোটিফ ও গড়ণের অবিকল নমুনার আধুনিক কাঠের তৈরি কারুশিল্পকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত কাঠের তৈরি কারুশিল্প বলে নতুন প্রজন্ম জানতে পারছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সচেতনতার নিরিখে বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এর বিকাশের ধারাকে উজ্জীবীত করতে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের আলোকে এদেশের সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের বহুমাত্রিক দিক ও কাঠের তৈরি কারুশিল্পের বিকাশের কথা বিচেনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এদেশের কারুশিল্পের গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আধুনিক তথ্য ব্যবস্থা ও এর প্রচারের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কাঠের তৈরি কারুশিল্পের উদ্ভাবন ও বিকাশ যেন এদেশের ঐতিহ্যগত কাঠের তৈরি কারুশিল্পের প্রেক্ষিতেই হয় সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. Khaleda Salahuddin and others, Women and Poverty, Dhaka: Women for Women, 1997, P-58

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহমদ, ওয়াকিল, e¨vsjvi †jvK ms¯‹…wZ, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪

২. আল্লামী, আবুল ফজল, AvBb-B-AvKei×, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮

৩. আহমেদ, নুরউদ্দিন, (সম্পাদিত), wecYb we‡kølY, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ১৯৮৮-৮৯

৪. ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল, evsjvi wgDwRqvg t evsjvi †jvKwkí, ঢাকা ঃ বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০০১

৫. উল্লাহ্, কে.এম. হাবিব, (সম্পাদিত), নারায়ণগঞ্জ ঃ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৯২

৬. ওসমান, বুলবন, PvižKjv cwi fvlv, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৬

৭. ঘোষ, নির্মলকুমার, fviZwkí, কলিকাতা ঃ ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫

৮. চৌধুরী, তহমিনা ও চট্টোপাধ্যায়, অসীম (সম্পাদিত), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, wkíwPšÍv, কলকাতা ঃ দীপায়ন, ২০১২

৯. চন্দ্র, অরূপ, wk‡íi e¨vKiY, পশ্চিমবঙ্গ ঃ সুজয় প্রকাশণী, ১৯৯০

১০. চক্রবর্তী, সুধীর, (সম্পাদিত), ew×Rxexi †bvUeB, কলকাতা ঃ পুস্তক বিপণি, ২০০৫

১১. তালুকদার, খগেশকিরণ, evsjv‡`‡ki †jvKvqZ wkíKjv, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

১২. দেবী, মৈত্রেয়ী, F‡M‡`i †`eZv I gvbl, কলকাতা ঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৯

১৩. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, cvPxb wkí-cwiPq, কলিকাতা ঃ সুবর্ণরেখা, ১৩৭৯ বাং

১৪. evsjv wbD †U÷v‡g›U (bZb wbqg), ঢাকা ঃ দি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, পৃ. ৪৩৭

১৫. বেগম, মঞ্জু আরা (সম্পাদিত), evsjv‡`‡ki †gjv, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ২০১৪-২০১৫

১৬. বসু, রাজশেখর, Kò‰Øcvqb e¨vm KZ gnvfviZ, কলকাতা ঃ এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

১৭. বানু, জিনাত মাহরুখ, evsjv‡`‡ki `vižwkí, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩

১৮. বসু, নন্দলাল, wkíPPv, কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১৪ বাং

১৯. বসু, নন্দলাল, `wó I mwó, শ্রী অম্লান দত্ত সম্পাদিত, কোলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১৯০৭

২০. ভট্টাচার্য, মিহির-ঘোষ, দীপঙ্কর (সম্পাদিত), e½xq wkí cwiPq, কলকাতা ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৪

২১. ভূইয়া, বজলুর রহমান, (সম্পাদিত), কারুময় ফ্রেম প্রদর্শনী ও সেমিনার, নারায়ণগঞ্জ ঃ বাংলাদেশে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬

২২. মুখোপাধ্যায়, আলোক, wekwk‡íi i|c‡iLv, কলকাতা ঃ বাকুলিয়া হাউস, ১৩৮৫ বাং, পৃ. ১১

২৩. মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী, wPÎKjv, কলকাতা ঃ কাঞ্চন চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৮৪

২৪. রহমান, মীজানুর, XvKv ciY, ঢাকা ঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩

২৫. রহমান, মুহাম্মদ মাহবুবুর, Kv‡Vi KvR, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

২৬. রায়, ভবেশ, Lbvi ePb, ঢাকা ঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৫

২৭. রায়, নীহাররঞ্জন, e½vjxi BwZnvm Aw`ce, কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪২০ বাং

২৮. রহমান, মো ঃ মোস্তাফিজুর, bKkvKjv, দিনাজপুর ঃ প্রকাশক মোঃ হাবিবুর রহমান, ২০০৮

২৯. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, M½vFw× †_‡K evsjv‡`k, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮

৩০. রিড, হারবার্ট, wk‡íi mviv_, সন্দীপন ভট্টাচার্য (ভাষান্তর), কলকাতা ঃ দীপায়ন

৩১. লাহিড়ী, অরুণ কুমার, KvV msiÿY weÁvb, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

৩২. শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ সম্পাদিত, AvÂwjK fvlvq Awfavb, ১ম খন্ড, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

৩৩. শরীফ, আহমদ, ga¨h‡Mi mvwnZ¨ mgvR I ms¯‹wZi i|c, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ২০০৬

৩৪. শাহনাওয়াজ, এ কে এম, Avgvi evsjv‡`k ga¨hM, ঢাকা ঃ চন্দ্রাবতী একাডেমী, ২০১৬

৩৫. শাবিন, শাহরিয়ার হোসেন, লোকশিল্পে লোকজ খেলনা:নওগা, ঢাকা ঃ মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০০৯

৩৬. শাহেদ, সৈয়দ মোহম্মদ, Qovq evOvjx mgvR I ms¯‹wZ, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮

৩৭. সাঁতরা, তারাপদ, evsjvi Kv‡Vi KvR, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ঃ সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ২০০৩

৩৮. সাত্তার, আব্দুস, evsjv‡`‡ki b‡ZvbZ `vi“wkí, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬

৩৯. সেন, শ্রীদীনেশচন্দ্র-বাহাদুর, রায় (সঙ্কলিত), ‰gqbwmsn-MxwZKv, ঢাকা ঃ গতিধারা, ২০০০

৪০. সেন, গিরিশিচন্দ্র (অনুবাদিত), e½vbev` †KviAvb kixd, ঢাকা ঃ সালমা বুক ডিপো, ২০১১

৪১. সেন, দীনেশচন্দ্র, enr e½, 1g LÛ, কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

৪২. সুর, ড. অতুল, evOjv I evOvjxi weeZb, কলকাতা ঃ সাহিত্যলোক, ২০০৮

৪৩. সিরাজুদ্দিন, মোহম্মদ, KwUi wkí, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬

৪৪. হক, সানাউল, evsjv‡`‡ki Kv‡Vi wkíKg, ঢাকা ঃ দিব্য প্রকাশ ২০০৩

৪৫. হাই, মুহম্মদ আব্দুল ও পাশা, আনোয়ার (সম্পাদিত), PhvMxwZKv, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ঃ বাংলাবাজার, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ

৪৬. Banerjee, Subrata, Bangldesh, New Delhi ঃ National Book Trust, 1981

৪৭. Chakravarti, Shyamalkanti (Edited), Wood Carvings of Bengal in Gurusaday Museum, Kolkata : Gurusaday Museum, 2001.

৪৮. Read, Herbert, The meaning of art, great Britain: Penguin Books Ltd, 1931

৪৯. Smith, Stain, And Holt, Professor H.F. Ten (Consultant Editors), The Artists manual Equipment, materials, Techniques, New York : An Imprint of W.H. Smith Publishers Inc. 1988, PP. 106.

৫০. Zelger, Victor, The Fine Crafts in the federal Republic of Germany

পত্রিকা

১. গোস্বামী, করুণাময়, MZkZ‡K evsjvMvb, ঢাকা ঃ ভারত বিচিত্রা, ২০০১

২. মাহবুব, জাবীন, (সম্পাদিত), Kvi“wkí, কারুশিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণামূলক পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৩

৩. আলম, সৈয়দ মাহবুব, Kvi“wk‡íi cwi‡cÖwÿZ, ÔKvi“wkíÕ, ঢাকা ঃ কারুশিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, জাবীন মাহবুব (সম্পাদিত), ১৯৯৩

ক্যাটালগ

১. আলম, সৈয়দ মাহবুব, Kvi“gq †dg: evsjv‡`‡ki HwZn¨gq Kvi“wk‡íi GK bZb D™¢veZ ms‡hvRb, কারুময় ফ্রেম প্রদর্শনী ও সেমিনার, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৬

২. বানু, জিনাত মাহরুখ, Kvi“wkíx I Kvi“wkí, কারুশিল্প মেলা, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা

ডাবা ঃ হুক্কাকে আঞ্চলিক ভাষায় ডাবা বলে।

নইচ্যা ঃ হুক্কার কাঠের নলের অংশটুকুকে নইচ্যা বলে।

পাশা ঃ পাশা এক ধরনের নকশা। নকশাটা কানের গহণা থেকে নেয়া, গোলাপ নকশা।

মস্কা ঃ মস্কা চুল আচড়ানো এবং মাথার উকুন আনার কাজে ব্যবহার হয়।

ডেউয়া ঃ কাঠের চামচ।

চামচ্যা ঃ কাঠের তৈরি চামচ।

বগুনা ঃ প্রদীপদানীকে আঞ্চলিক ভাষায় বগুনা বলে। বগুনা কোথাও কোথাও গাছা হিসেবে পরিচিত।

বার্মিজ পিঁড়ি ঃ গ্লেজের কারণে বার্মিজ নাম হয়েছে।

তারকাটা কাঠি ঃ এটি দিয়ে গোল করে চন্দ্রাকৃতির দাগ টানার জন্য হাতে তৈরি যন্ত্র বিশেষ।

খুন্দরী ঃ এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। খুন্দরীকে ডুগডুগী বলে।

হলা ঃ চিরুনির মত চিকন চিকন যে অংশ থাকে তাকে 'হলা' বা 'শলা' বলা হয়।

বাংলা বাটাল ঃ মস্কা তৈরির কাজে বাংলা বাটাল ব্যবহার হয়।

খঞ্চা ঃ খঞ্চা হলো কাঠের থালা। এগুলো ছোট বড় আকারের হয়। খঞ্চার নানা মুখি ব্যবহার ছিল মরিচ বাট, মশলা ইত্যাদি রাখতে। মিষ্টি বনানোর এখনো খঞ্চা ব্যবহার হয। এর মধ্যে পূজার ভোগ সাজিয়ে দেবীকে পূজা দিত।

সিহাইট ঃ কোথাও কোথাও আঞ্চলিক ভাষায় সিহাইট বলে। সিহাইট মূলত সিয়া। সিয়া হলো কাহাইলে ধান, ডাল, মশলা গুড়া করার লম্বা কাঠের দন্ড।

উচ্যা ঃ সিয়ার এক মাথা তুলনামুলক অন্য মাথার চেয়ে চোখা থাকে, এটাকেই 'উচ্যা' বলে। পিঠার আটা গোলানোর কাজে 'উচ্যা' ব্যবহার হয়।

গোলা ঃ সিয়ার যে প্রান্তে লোহার রিং পড়ানো থাকে সে প্রান্তকে গোলা বলে। এর সাহায্যে ধানবানা চাল, ডাল, মশলা ইত্যাদি গুড়া করা হয়।

হাউরি ঃ ধান শুকানোর সময় ধান টানার জন্য এটা ব্যবহার হয়। কাঠের তৈরি এই সামগ্রীটি কৃষকদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

গ্যালারী ঃ সিগারেট, ম্যাচ, পান ইত্যাদি সাজিয়ে বিক্রির জন্য কাঠের কারুশিল্পের নাম 'গ্যালারী'। বিক্রেতা গ্যালারী গলায় ঝুলিয়ে হেটে হেটে সিগারেট, পান ইত্যাদি বিক্রি করেন।

কাউরি কাঁটা ঃ রেহেল তৈরির সময় কবজার মত জোড়াহীন অংশটুকুকে কাঁটাকে ‘কাউরি’ কাঁটা বলে। ‘কাউরি’ দুইটি আয়তাকার কাঠের পাল্লাকে পরস্পর আবদ্ধ রাখে।

টেরি ঃ টেরি একটি গাছের নাম। পাহাড়ি অঞ্চলে এই গাছ জন্মে। এই গাছের ফল সিদ্ধ করে কাঠের তৈরি কারুশিল্পীরা তৈরিকৃত কাঠের কারুশিল্প রঙ করেন।